স্বদেশের ইতিহাস



কৌশাম্বীনাথ মল্লিক

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ কর্তৃক নবম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত
[*Vide Board's TB No. Syll/H/IX/87/81 dated 13.11.1987*]

স্বদেশের ইতিহাস

[নবম শ্রেণী]

Finished
3.9.88

কৌশাম্বীনাথ মল্লিক এম. এ. (ইতিহাস) ; এম. এ. (শিক্ষাবিজ্ঞান)
ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক, বেহালা কলেজ। ভূতপূর্ব অধ্যাপক,
হেতমপুর কলেজ ; ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ; বেলুড়
শিক্ষণ মন্দির ; দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কলেজ, গড়িয়া।

জয়দুর্গা লাইব্রেরী
৮-এ কলেজ রো : কলিকাতা-৭০০ ০০৯

নবপর্যায় প্রথম সংস্করণ ঃ মে, ১৯৮৭
সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

প্রকাশক ঃ
গৌরাঙ্গচন্দ্র সান্যাল
৮-এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর ঃ
অশোককুমার চৌধুরী
চৌধুরী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
পি-২১, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ ২৫˙০০ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রাচীন যুগ

প্রথম অধ্যায়	ভারত উপমহাদেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়	১—৮
দ্বিতীয় অধ্যায়	ভারতীয় সভ্যতার সূচনা	৯—১৫
তৃতীয় অধ্যায়	ভারতের বৈদিক সভ্যতা	১৬—২৫
চতুর্থ অধ্যায়	প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন ঃ বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম	২৫—৩৪
পঞ্চম অধ্যায়	প্রাচীন ভারতে অখণ্ড রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের যুগ	৩৫—৬৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনের সংগ্রাম	৭০—৯১
সপ্তম অধ্যায়	সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন	৯২—১০৮

মধ্যযুগ

[সুলতানী যুগে ভারত]

প্রথম অধ্যায়	মুসলমান যুগ, না মধ্যযুগ	১০৯—১১০
দ্বিতীয় অধ্যায়	সুলতানী যুগের ঐতিহাসিক উপাদান	১১০—১১১
তৃতীয় অধ্যায়	ভারতে মুসলমান আগমনের সূচনা	১১১—১১২
চতুর্থ অধ্যায়	ভারতে মুসলমান শাসনের সূচনা	১১৩ - ১১৪
পঞ্চম অধ্যায়	ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন ঃ দাস বংশ	১১৫—১১৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	খলজী বংশ	১১৯—১২৪
সপ্তম অধ্যায়	তুঘলক বংশ	১২৪—১২৮
অষ্টম অধ্যায়	সুলতানী শাসনের ক্রমাবনতি ও পতন	১২৮—১৩০
নবম অধ্যায়	প্রাদেশিক স্বাধীন রাজ্যসমূহ	১৩০—১৪১
দশম অধ্যায়	সুলতানী যুগে ভারতে ইসলামের প্রভাব	১৪১—১৫৩

[মুঘল যুগে ভারত]

প্রথম অধ্যায়	মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদান	১৫৪—১৫৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ বাবর	১৫৫—১৫৮
তৃতীয় অধ্যায়	মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ ঃ হুমায়ুন ও শের শাহ	১৫৮—১৬২
চতুর্থ অধ্যায়	মহামতি আকবর	১৬২—১৬৯

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অধ্যায় :	জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান	১৭০—১৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায় :	ঔরংজেব	১৭৪ – ১৮৬
সপ্তম অধ্যায় :	ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির কার্যকলাপ	১৮৬ – ১৯০
অষ্টম অধ্যায় :	মুঘল শাসনে ভারত	১৯০—১৯৮

আধুনিক যুগ

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় :	মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ও পতন	১৯৯– ২০৫
দ্বিতীয় অধ্যায় :	আঞ্চলিক শক্তিগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধি	২০৫—২১৫
তৃতীয় অধ্যায় :	দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ : কর্ণাটক যুদ্ধ	২১৫ ২২৩
চতুর্থ অধ্যায় :	বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি	২২৩ – ২৩১
পঞ্চম অধ্যায় :	ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার	২৩১—২৪৯
ষষ্ঠ অধ্যায় :	কোম্পানীর শাসনকালে ভারতে প্রশাসনিক অবস্থা	২৫০—২৫৭
সপ্তম অধ্যায় :	কোম্পানীর যুগে শিল্প ও বাণিজ্য	২৫৮—২৬২
অষ্টম অধ্যায় :	কোম্পানীর যুগে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি	২৬২—২৭৩
নবম অধ্যায় :	ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষ ও অভ্যুত্থান	২৭৪—২৭৯
দশম অধ্যায় :	১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ	২৭৯ – ২৮৮
	বংশপঞ্জী	২৮৯—২৯৫
	অনুশীলনী	২৯৬ – ৩১৫

SYLLABUS

Chapter I : *Geography & History :*

(a) Chief physical features of the Indian subcontinent and its main ethnic elements ;

(b) Influence of Geography on History ;

(c) The fundamental unity ;

(d) Source of ancient Indian History.

Chapter II : *Dawn of Indian Civilisation :*

(a) Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of cultures ;

(b) Harappan Civilisation (Chalcolithic)—chief features—its antiquity (with special reference to its. extent, urban character, town planning and social, economic and religious life), relations with outside world.

Chapter III : *The Vedic Age :*

(a) The "Aryans"—their original homeland ; their first literary work in Indi a—theRig-Vedas ;

(b) Vedic literature ; later *Samhitas*, *Brahmanas*, *Aranyakas*, *Upnishadas* and *Sutras* ;

(c) Life of the people as reflected in the Vedic literature :

  (i) Social, economic and religious life and political and administrative activities of the people as known from the Rig-Vedas ;

  (ii) Later developments ;

(d) Expansion of Vedic culture in the subcontinent ;

(e) Beginning of the Iron Age.

Chapter IV : *Protest Movement :*

(a) Social, economic and religious causes of the beginning of the movements protesting against the dominance of the age-old Vedic or Brahmanical culture ;

(b) Jainism and Buddhism :

(c) Lives and teachings of the Buddha and Mahavir.

Chapter V : *The age of Imperialism and Political Unification :*

(a) Reference to sixteen Mahajanapadas ;

(b) A bare outline of the history of the growth of the power of aMgadha from the days of Bimbisara to the rise of the Mauryas ;

(c) History of the Maurya empire with special reference to the period of Chandragupta (his achievements, administration of the age as known from the account of Megasthenes and the *Arthasastra* of Kautilya dated generally to the Maurya Age) and Asoke (his conquest of Kalinga, limits of his empire, propagation of Buddhism and his Dharma, his humanitarian work, his contacts with outside world and his place in world history)

(d) Invasions of India by foreigners—

(i) Reference only to the extension of the Achaemenid empire to parts of the Indian subcontinent ; Alexandar's invasion anid ts effects.

(ii) After the fall of the Mauryas—reference to the rule of the Indo-Greeks, Sakas and Pahlavas ;

(iii) Social and economic condition—with reference to agriculture, trade and industry—foreign elements in the population—contacts with the outside world—Mauryan Art.

(e) History of the Kushana empire with special reference to the reign of Kaniskha (his probable date, his conquests, limit of his empire, his patronage of Buddhism and Indian art and culture) and to India's contact with the outside world in the Kushana age ; cultural imporance of the Kushana period in Indian History.

(f) The Satavahana empire—(i) Its extent, (ii) the achievements of its greatest ruler—Gautamiputra Satakarni ;

(g) History of the Gupta empire—with special reference to

(i) the periods of Sumudragupta (his conquests and achievements, war against the Saka Kshatrapas ; his other

achievements ; Chandragupta II a legendary figure. Evidence of Fa-Hien ; Kumargupta I and Skandhagupta (his success against the Hunas).

(ii) Causes of the downfall of the Gupta Empire. Distinctive features of the Gupta culture.

Chapter VI : *Struggle for Domination :*

(a) North India—

(i) Reference to the Hunas—Yasodharman ;

(ii) Rise of Gauda under Sasanka, his relations with Bhaskarvarman of Kamarupa and Harshavardhana of Thaneswar and Kanauj :

(iii) Conquests of Harshavardhana, limits of his kingdom, account off Huan-tsang ;

(iv) Rise of the Pratihara and Pala empires—brief reference to the tripartite struggle and its outcome ;

(v) Important Pala and Sena rulers—Dharmapala, Devapala, Ramapala, Vijayasena and Lakshmansena.

(b) Deccan—

(i) the early Chalukyas of Badami ;

(ii) Achievements of Pulakesi II ;

(iii) the Rashtrakutas ;

(iv) Achievements of Govinda III and Krishna III. Later Chalukyas of Kalyans ; and achievements of Vikramaditya VI (c. 1076—1128 A. D.)

(c) South India—

(i) The Pallavas of Kanchi—some notable rulers and their achievements—the long drawn conflict between the Pallavas and Chalukyas ;

(ii) The Cholas of Tanjore ;

(iii) Achievements of Rajaraja I and Rajendra I with special reference to their overseas campaigns.

Chapter VIII

(a) Soial, economic and cultural life from the 7th century to the 12th century A. D. under the Palas, the Senas, the

Chalukyas, the Rashtrakutas, the Chandellas, the greater Gangas of Orissa and the Pallavas and the Cholas of the far South ;

(b) Commercial and cultural contacts with outside world.

MEDIEVAL INDIA till 1707

(1) Why should we call it Medieval India rather than Muslim India ?

(2) A brief note on the types of sources : the Sultanate period.

(3) Advent of Islam in India : the Arab conquest of Sind—its impact negligible.

(4) Beginning of Muslim rule : condition of Northern and Western India on the eve of Muslim invasion—Sultan Mahmud —results of his invasions—Al-Biruni on Indian culture and civilisation.

(5) From invasion to empire-building ; foundation of the Delhi Sultans by Qutbuddin, Iltutmish and Balban : nature of the external and interral threats—consolidation of the Sultanate.

(6) Khalji Imperialism : growth of the empire under Alauddin (no detailed account of his campaigns)—his attempts at consolidating the authority of the central government—his economic measures and their results.

(7) A short assessment of Muhammad bin Tughluq's rule—nature of the changes during Firuz Shah's rule : some of his beneficient measures.

(8) Invasion of Timur—effects—disintegration of the Sultanate : the Sayyids and Lodis (only a brief outline).

(9) Rise of some regional powers :

(a) Bengal under Ilias Sahi rulers : Hussain Shah and Nasarat Shah ; cultural developments.

(b) The Bahmani Kingdom (no detail)—split up into five kingdoms.

(c) The nature of the Bahamani-Vijayanagar conflict (details of the wars to be omitted).

(d) Vijaynagar ampire—Dev Rai and Krishna Rai—special emphasis on the administrative system—and the social, cultural and a economic life.

(10) Impact of Islam on India during this period—with particular stress on the impact on the cultural life—the initial orthodox reaction ; gradual synthesis of cultures—the Bhakti cult—Sufism—Religious reformers—their message. Art and architecture development of vernacular literature and regional art and culture—patronage of literature etc. by the ruling groups—growth of Urdu.

THE MUGAL AGE : 1526—1707

(1) A brief note of the types of sources.

(2) Origins of the Mughals : foundation of the Padshahi by Babar, —Panipath, Khanua and Ghogra (detail of wars to be omitted)—Babar's memoirs.

(a) Mughal-Afghan contest—its nature—a brief narrative of the building up of an empire by Sher Shah—special stress on the administrative and revenue systems. Sher Shah's contributions— a brief reference to the re-establishment of the Mughal power.

(b) Widening of the empire and its consolidation by Akbar : Stress on the methods by which Akbar achieved it : (detail of the wars to be omitted)—foundation of a new administrative system—Jagirdari system—revenue system—cultural life ; Din-i-Ilahi—Akbar's court—his building activities.

(c) Jahangir and Shahjahan : assessment as rulers : particular stress on their patronage of art and architecture—their policy towards European traders.

(d) Aurangzeb : a short note on the wars of succession—stress on two developments in the political sphere : further widening of the empire on the one hand, and the emergence on the other of certain conditions which tended to weaken the imperial authority : roots and nature of his troubles in Northern and North-western India ; the Deccan policy—Shivaji and the first phase of the Mughal-Maratha conflict—organisation of the

civil and military administration by Shivaji—assessment of Shivaji as a ruler—the far-reaching consequences of Aurangazeb's Deccan wars—organisation by Aurangazb of the civil and military administration—his religious policy—his character and personality—a brief estimate as a ruler.

(e) Activities of the European Trading Companies (a brief outline).

(3) India under the Mughals : Political unification of a large part of India—measures in connection with the assertion of the central authority—the Mughal rulers and Jagirdars—land revenue system—the ruler society of India in the eyes of foreigners—trade, industry and commerce—European traders—special emphasis on the cultural life : art, architecture, paintings, literature—history writing—music—some reference to some distinctive regional cultures.

HISTORY OF INDIA 1707—1857

(1) Decline and disintegration of the Mughal Empire—beginning of the process during Aurangzeb's time—threats to the Mughal Empire from different quarters—drain on the imperial finances due to wars—implications of the fast increasing jagirs, while the sevenue income did not increase—increased factionalism in the Mughal Court—different parties and factions—weakness of the successors of Auranzeb—power struggle—the nobles etc. further consolidated their powers—central control over the different Subas and regions gradually disappeared—effects of the invasion of Nadir Shah.

(2) *Growth of regional powers* (emphasis on those, whose encounters with the British affected the later political scene).

(i) The regions to be particularly studied Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise of the Sikhs upto Guru Govind ;

(ii) Growth and decline of the Marathas (till 1761)—Expansion of the Maratha power—third battle of Panipath (1761)—its impact.

(3) Growth of European commerce and conflict among European trading companies—Anglo-French conflict—Carnatic: the first area of conflict—effects of the Anglo-French rivalry in Europe and elsewhere—War of Austrian Succession and Seven Years' War—Reaction of Carnatic rulers to the growing conflict—result of the wars—causes of French failure.

(4) Growth of English East India Company's commerce and political power in Bengal till 1765—growth of English trade in Bengal in the first half of 18th century—Farman of 1717—frictions with the Nawabs—conflict between the English and Siraj from 1756 to Plassey—its results—conflict with Mir Qasim: Buxer (1764)—Dewani (1765).

(5) British Imperial Expansion: 1767—1857
(The war operations to be described as briefly as possible. The main stress should be given on (a) The British motives, (b) The decisive factors in the British victory)—

(a) Marathas (one long narrative)

(b) Mysore (—do—)
Subsidiary Alliance (1798) as an instrument of British political control.

(c) Other conquests, (excluding relationship with the Sikhs—Anglo-Sikh relations till the death of Ranjit Singh.

(d) Annexation of the Punjab.

(e) Dalhousie and British imperial expansion—novel features.

(6) *Administrative Foundations*

(i) Nature of the growth of British political power till 1765 (two short paragraphs)—implications of Diwani of 1765 and of Diarchy in 1772.

(ii) Growth of centralisation: (Hastings to Cornwallis)

(iii) Organisation of a new judical and police system.

(iv) Need for an increased income from land-revenue—tupes of arrangements in this connection—their broad effects.

(7) *Inudstry and Trade*

Expansion of India's foreign trade and decline of some Indian industries (to stres, cotton goods during the period, 1765—1857)

(8) *The Cultural Scene*

(i) Brief note on the old educational system : the changes English education—decline of vernacular education. Contact with western culture.

(ii) A history of social and cultural movements with special reference to Bengal and Maharashtra.

(9) *Peasant unrest and uprisings*

(a) Peasant rebellions—Farazi—Wahabi Movement :

(b) Tribal Movements—Kols—Santhals.

(10) *The Revolt of 1855*

Extent of popular participation—leadership—nature of the revolt.

প্রথম অধ্যায় | ভারত উপমহাদেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়

ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ

আয়তনের বিশালতা ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যের জন্য ভারতবর্ষকে একটি মহাদেশ বলা চলে। এই মহাদেশকে ভূ-ভাগের গঠন অনুসারে দুইটি প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করা হয়। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলকে **আর্যাবর্ত** এবং দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলকে **দাক্ষিণাত্য** বলা হয়। আর্যাবর্তকে ভূ-প্রকৃতি হিসাবে তিনটি এবং দাক্ষিণাত্যকে দুইটি—মোট এই পাঁচটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভারতবর্ষকে ভাগ করা হয়।

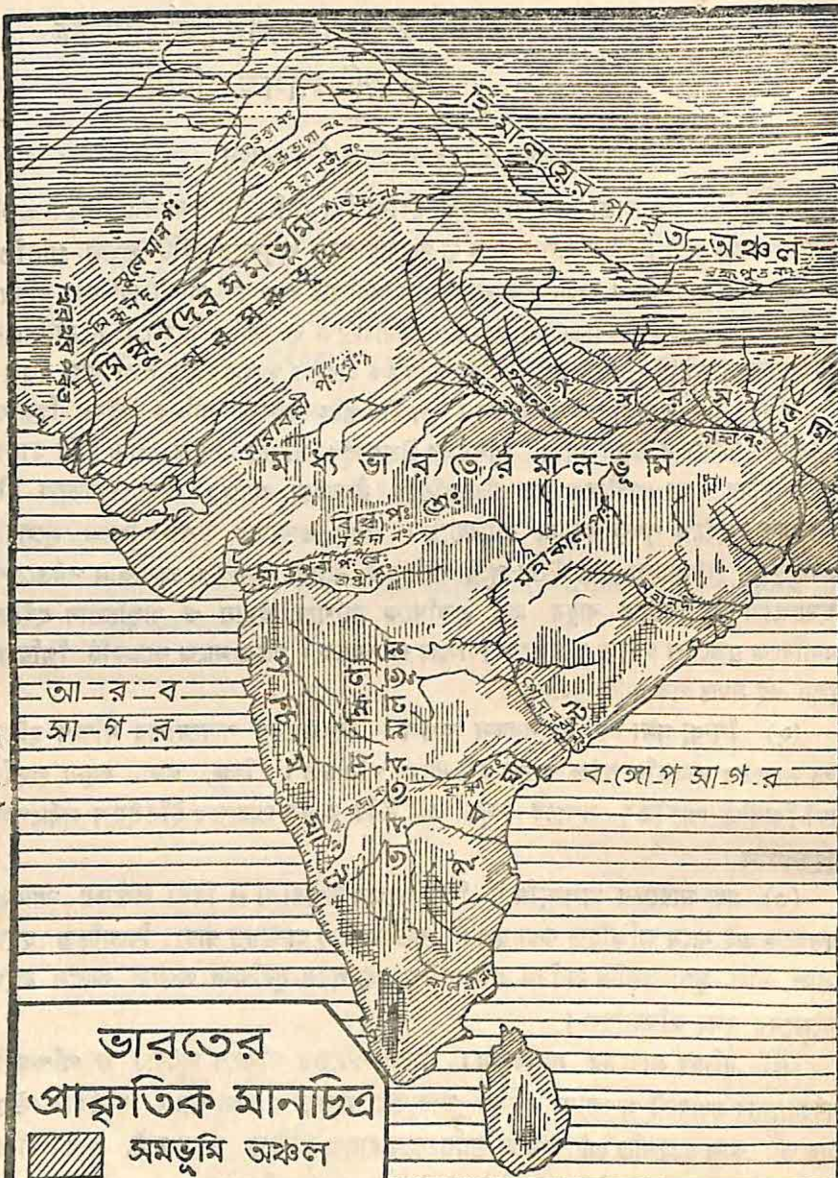
(১) **হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল।** পামীর গ্রন্থি হইতে বাহির হইয়া হিমালয় পর্বতমালা ভারতের উত্তর দিয়া আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় চারি হাজার কিলোমিটার রক্ষা-প্রাচীরের মত উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া আছে। ইহা ভারতকে চীন ও তিব্বত হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। আর ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সুলেমান ও হিন্দুকুশ পর্বতমালা এবং উত্তর-পূর্বে পাটকোই, নাগাই, লুসাই ও আরাকান পর্বতশ্রেণী হিমালয়ের দুই বিস্তৃত বাহুর মত একদিকে রাশিয়া, ইরান ও বালুচিস্তান হইতে, অন্যদিকে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে কয়েকটি গিরিপথ ছাড়া এই সমস্ত পর্বতমালা দুর্লঙ্ঘ্য।

(২) **সিন্ধু-গঙ্গা বিধৌত সমতল অঞ্চল।** হিমালয়ের পাদদেশের দক্ষিণ হইতে মধ্য ভারতের মালভূমি পর্যন্ত অঞ্চল এই নামে পরিচিত। সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদী-বিধৌত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এই উর্বর অঞ্চল ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বসম্পন্ন।

(৩) **মধ্য ভারতের মালভূমি।** সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলকে এই নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীনকালে আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া কোল, ভীল, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিম অধিবাসীরা এই পর্বত-সুরক্ষিত অঞ্চলে আশ্রয় লইয়া নিজেদের রক্ষা করিয়াছিল।

(৪) **দক্ষিণ ভারতের মালভূমি।** বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে দক্ষিণ ভারতের মালভূমি বলা হয়। দীর্ঘকাল উত্তর ভারতের কোন রাজশক্তি এই অঞ্চলে স্থায়িভাবে রাজত্ব করিতে পারে নাই, কারণ বিন্ধ্য পর্বত এইসব আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসাবে কার্য করিয়াছে।

(৫) **সুদূর দক্ষিণ।** কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে এই অঞ্চলটি দ্রাবিড় সভ্যতার পীঠস্থান। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলে চের, চোল, পাণ্ড্য ইত্যাদি শক্তিশালী রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এই অঞ্চলের মালাবার ও কোঙ্কণ উপকূলের বন্দরগুলি হইতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহিত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হইত।



ভারতের প্রাকৃতিক মানচিত্র

ভারতবর্ষের অধিবাসী

নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে ভারতীয় জনসমাজ প্রধানত ছয়টি জাতি দ্বারা বিভিন্ন যুগে গড়িয়া উঠিয়াছিল। সবচেয়ে প্রাচীন হইল নেগ্রিটো। তাহার পর আসে প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। ইহার পর মঙ্গোলয়েড ও মেডেটেরেনিয়ান। ইহার পরবর্তীরা আর্য সভ্যতার সহিত যুক্ত। হরপ্পা অঞ্চলে প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড, মেডেটেরেনিয়ান, আলপাইন ও মঙ্গোলয়েড মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। অনুমান করা হয়, এই সময়ে উল্লিখিত প্রথম পাঁচটি জাতি ভারতে স্থায়িভাবে বসবাস করিত।

ভারতের অধিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক বিভাগ

নেগ্রিটোরা বর্তমানে ভারতে বাস করে না। তবে কেরালা অঞ্চলে কোন কোন জাতির মধ্যে এই শ্রেণীর মানুষের চিহ্ন ও প্রভাব কিছুটা দেখা যায়। এই শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষ খর্বাকৃতি, প্রায় চিবুকহীন, কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহার ওষ্ঠমূল ও নাসিকাও খর্বাকার। পুরাতন প্রস্তর যুগে ইহাদের প্রাধান্য ছিল।

নেগ্রিটো

ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড শ্রেণীর লোকেদের। ইহাদের ভাষা ছিল অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত। কয়েকটি আদিম উপজাতি সাঁওতাল, ভীল, মুণ্ডা বা উহাদের বংশধরদের মধ্যে এখনও ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। মেডেটেরেনিয়ান জাতির প্রধান যোগ ছিল দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে। দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ও কানাড়ী প্রভৃতি ভাষা এই গোষ্ঠীর ভাষা হইতে উৎপন্ন। মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর লোকের প্রধান বাসভূমি ছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলগুলিতে। ইহাদের ভাষার সঙ্গে চীন-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর সাদৃশ্য আছে। নেপালী, ভুটিয়া, নাগা, অহোম প্রভৃতি জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড ও মঙ্গোলয়েড

ভারতের সবচেয়ে শেষে যে জাতিগোষ্ঠীর আগমন, আমরা তাহাদের সাধারণভাবে আর্য বলিয়া অভিহিত করি। ইহারা দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ উন্নত নাসিকাযুক্ত ছিল। ইহাদের ভাষা ছিল বৈদিক সংস্কৃত। পরবর্তীকালে সেই ভাষা হইতে আধুনিক ভারতে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। এইসব জাতিগোষ্ঠী ছাড়াও যুগে যুগে শক, হুন, গ্রীক, খ্রীস্টান, মুঘল, পাঠান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া দেশের জনসমাজে সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছে। এই কারণে ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ ভারতবর্ষকে 'জাতিসমূহের যাদুঘর' (ethnological museum) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার এই উক্তিতে ভারতীয় মানবগোষ্ঠীর পরিচিতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আর্য ও অন্যান্য জাতি

ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

হিমালয় পর্বতমালা ও সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত ভারতবর্ষ এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্ন পরিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকার ফলে নিশ্চিন্তে

ভারতবাসী ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সাধনায় মন দিতে পারিয়াছিল। ইহারই ফলে ভারতবর্ষে একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিমালয় পর্বতের ভূমিকা অসামান্য। এই তুষারমণ্ডিত পর্বতশ্রেণী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনাদিকাল হইতে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। প্রথমত, এই বিশাল সু-উচ্চ পর্বতমালা মৌসুমী বায়ুকে বাধা দিয়া বৃষ্টিধারা বর্ষণে একদিকে যেমন সাহায্য করিতেছে, অপরদিকে মধ্য এশিয়ার শুষ্ক ও শীতল বায়ুকে বাধা দিয়া প্রচণ্ড শীতের হাত হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করিতেছে।

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের প্রভাব

দ্বিতীয়ত, তুষার-বিগলিত জলধারায় উত্তর ভারতের গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু প্রভৃতি নদনদী-গুলিকে সারা বৎসর পূর্ণ রাখিয়া কেবল কৃষিভূমির উৎপাদিকা শক্তিই বৃদ্ধি করে নাই, ইহা যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথও সুগম করিয়াছে। তৃতীয়ত, অফুরন্ত বনজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদ দান করিয়া ভারতকে এক সম্পদশালী দেশে পরিণত করিয়াছে। চতুর্থত, হিমালয় পর্বতমালা ভারতবর্ষকে বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে যুগে যুগে রক্ষা করিয়াছে।

মধ্য ভারত ও দক্ষিণাপথের মালভূমি বিন্ধ্য পর্বতমালার দ্বারা অনেক পরিমাণে সুরক্ষিত। হিমালয়ের পরেই বিন্ধ্য পর্বতের প্রভাব ভারতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। আর্যাবর্তকে এই পর্বত দক্ষিণ ভারত হইতে পৃথক্ করিয়া রাখায় দীর্ঘকাল দক্ষিণ ভারতে আর্যগণ ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে নাই। উত্তরদিক হইতে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করা সহজসাধ্য নহে। এইজন্য এই অঞ্চল উত্তরের সাম্রাজ্যলিপ্সু শক্তিগুলির হাত হইতে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা কয়িতে সক্ষম হইয়াছে।

বিন্ধ্য পর্বতমালার প্রভাব

পর্বতের মত সমুদ্রও ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে। ভারতবর্ষের তিনদিকে সমুদ্র। সমুদ্রের সান্নিধ্যের ফলে প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের উপকূল অঞ্চলে নৌ-বাণিজ্য প্রসারলাভ করিয়াছিল। এই জলপথে ভারতীয় সভ্যতা সুবর্ণভূমি ও অন্যান্য দেশে প্রসারিত হইয়াছে। সমুদ্রপথ পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে যেমন ভারতের যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে সেইরূপ অন্যদিকে সমুদ্রপথ বাহিয়া ইউরোপীয় দেশের বণিকরা ভারতবর্ষে আসিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

সমুদ্রের প্রভাব

বর্ষার জলে পুষ্ট কয়েকটি বৃহৎ নদী ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডকে তৈয়ারী করিয়াছে। এগুলির মধ্যে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চল, সিন্ধু নদ সংলগ্ন সমতলভূমি, পূর্বের মধ্য-গাঙ্গেয় অববাহিকা এবং ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চল। বিভিন্ন নদনদী ভারতবর্ষকে কেবলমাত্র শস্য-শ্যামলা করে নাই, প্রকৃতি ভারতবর্ষকে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদেও সমৃদ্ধ করিয়াছে। প্রাচীনকালে নদীপথগুলিই ছিল বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম।

নদীর প্রভাব

বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বৈচিত্র্য। বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সমবায়েই ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রাকৃতিক অবস্থার বিভিন্নতা

ভারতের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যই প্রথম চোখে পড়ে। একদিকে বিশাল হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, অপরদিকে উত্তর ভারতের বিস্তৃত সমতলভূমি, আবার দক্ষিণের বন্ধুর মালভূমি ও সমুদ্র উপকূলের সংকীর্ণ সমভূমি। একদিকে নদী-উপত্যকার শস্যশ্যামল সমভূমি, অন্যদিকে বৃষ্টিপাত-হীন রাজপুতানার মরুপ্রান্তর।

জাতি ও ভাষার বিভিন্নতা

নানা জাতির অস্তিত্বই হইতেছে ভারতের জনসাধারণের বিশেষত্ব। ভারতে আজও ছয়টি বিভিন্ন প্রকারের শারীরিক গঠনবিশিষ্ট জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বভাবতই বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা বিভিন্ন ভাষায় তাহাদের মনের ভাব প্রকাশ করে। বর্তমানে ভারতে প্রায় দুইশতটি ভাষা ও ছয়শতটি উপভাষা প্রচলিত। সুতরাং এ দেশ হইতেছে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের দেশ।

ধর্মের বিভিন্নতা

ভারত হইল ধর্মের দেশ। এখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক, ইহুদী শিখ, খ্রীষ্টান ধর্ম ও উহাদের বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখা শান্তিতে বিরাজ করিতেছে। ধর্মের এই বিভিন্নতা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাহা পৃথিবীর অনেক দেশেই বিরল।

সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে ভারতের বৈচিত্র্য ও অনৈক্যই যেন ইহার বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। প্রাকৃতিক পরিবেশে, ভাষায়, ধর্মে, বর্ণে, আকৃতিতে, পোশাক-পরিচ্ছদে ভারতবাসীদের মধ্যে এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি মূলগত ঐক্যের ধারা প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় জীবনে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। এই ঐক্যবোধই এক বিশাল উপমহাদেশের অধিবাসিবৃন্দকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় জীবনের আপাত-বিভিন্নতার অন্তরালে আমরা এই ঐক্যের সন্ধান পাই।

ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐক্য

প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দু সভ্যতা ভারতবাসীকে একটি ঐক্যের সূত্রে গাঁথিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। পরবর্তীকালে রামায়ণ ও মহাভারত উত্তর ভারতে যেমন উৎসাহের সহিত পঠিত হইত, দক্ষিণ ভারতেও তাহার ব্যতিক্রম হইত না। ভারতের অহিন্দু অধিবাসীগণও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব হইতে নিজেদের মুক্ত রাখিতে পারে নাই। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির পাশাপাশি ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করে এবং এই দুইটি পরস্পরবিরোধী ধারার মধ্যে আপাত-বিরোধের লক্ষণ থাকিলেও এই বিরোধ স্থায়ী হইতে পারে নাই। ঐতিহাসিক পরিবেশ এই বিরোধকে গৌণ স্থান দিয়া তাহার স্থানে হিন্দু-মুসলমানের ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের একটি ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকেই জীবনে অধিকতর পরিস্ফুট

করিয়াছে। সেই একতার লক্ষ্যে প্রাচীনকালে ভারতীয়রা পৌঁছাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ভারতবর্ষ তখন অসংখ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের দ্বারা গঠিত ছিল সত্য, কিন্তু প্রত্যেক রাজ্যের লোকই এই উপমহাদেশকে একটি সমগ্র ভূখণ্ড বলিয়া মনে করিত।

আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষে একটি অখণ্ড সার্বভৌম রাজ্য গঠনের চিন্তা ভারতীয় শাসক, কবি ও চিন্তাবিদ্‌দের চেতনায় প্রাচীনকাল হইতে স্থান লাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞরূপ ধর্মানুষ্ঠান এবং অধিরাজ, রাজাধিরাজ, চক্রবর্তীরাজা, সম্রাট, একরাট প্রভৃতি রাজকীয় উপাধি। বিদেশী গ্রীকদের বিতাড়িত করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যকে একটি শাসনের পতাকাতলে সম্ভব করিয়া তুলিবার প্রয়াস প্রাচীন ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রচেষ্টায় দেখা যায়। পরবর্তী যুগে সমুদ্রগুপ্ত, আলাউদ্দিন খলজী, মহম্মদ বিন-তুঘলক, শের শাহ্, আকবর, ঔরংজেব প্রভৃতির নীতিতে এই প্রচেষ্টারই প্রয়াস দেখা যায়।

রাজনৈতিক ঐক্য

ভারতবর্ষ বহুবার বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। এইসব শত্রুর বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা ও জীবনকে রক্ষা করিবার মন্ত্র লইয়া ভারতবাসীকে বার বার সকল বিভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে।

ভাষার দিক্ হইতে ভারতবাসীর যে বিভিন্নতা তাহার অন্তরালেও একটি ঐক্যের সূত্র রহিয়াছে। বর্তমানের অধিকাংশ ভারতীয় ভাষাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। সে কারণে এইগুলির মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়।

ভাষাগত ঐক্য

সমাজ জীবনেও পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহারের বিভিন্নতা ভারতবাসীকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে পারে নাই। এই দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য বিশ্বের সভ্য দেশগুলির মধ্যে ইহাকে একটি বিশেষ স্থান দিয়াছে। ইহা ভারতীয় সংস্কৃতি নামে পরিচিত। এই সাংস্কৃতিক ঐক্য ভারতীয়দের মধ্যে একত্ববোধকে চির শাশ্বত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপাদান

ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্য ও আধুনিক যুগের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার পক্ষে যথেষ্ট তথ্যাশ্রয়ী লিখিত উপাদান আমাদের রহিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় তথ্যাশ্রয়ী লিখিত উপাদানের অভাব। এই কারণেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিতে হয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিনটি উৎস হইতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়ঃ (ক) ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য, (খ) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, (গ) বৈদেশিক বৃত্তান্ত।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও প্রাচীন সাহিত্য। অতি প্রাচীন যুগের সেই অস্পষ্ট কালের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থাদি এবং সমসাময়িক সাহিত্য বিশেষ সাহায্য করে।

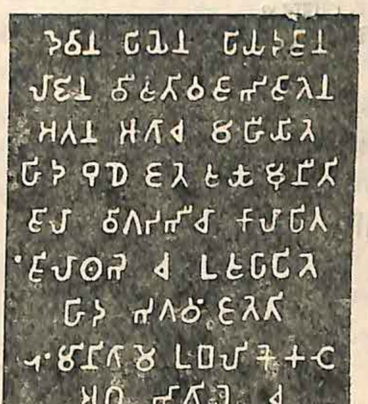
ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে বেদ এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থগুলি প্রধান। ঋক্‌বেদ হইতে ভারতে আর্যদের আগমন কাহিনী কিছুটা জানা যায় এবং অথর্ব বেদ, ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ ও তাঁহার পরবর্তীকালের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ হইতে বুদ্ধদেব ও মহাবীরের জীবনী, ধর্ম ও ইতিহাস এবং সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ধর্মগ্রন্থাদি ছাড়া অন্যান্য সাহিত্য হইতেও কিছু কিছু উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, গার্গি-সংহিতা, মনু-সংহিতা ঐতিহাসিক তথ্যে সমৃদ্ধিশালী। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে ভারতের রাজ্য ও জনসাধারণ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় সাহিত্য

প্রাচীন নৃপতিগণ তাঁহাদের কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। রাজকবিগণ প্রাচীন রাজাদের প্রশস্তি রচনা করিতে গিয়া অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কল্‌হনের লেখা 'রাজতরঙ্গিনী', বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' এইভাবে প্রাচীন ইতিহাসের অসংখ্য উপাদান জোগায় ভাস, কালিদাস, বাণভট্ট প্রভৃতি কবি ও নাট্যকারদের রচনায় সমকালীন অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তামিল সাহিত্যেও দক্ষিণ ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইতেছে প্রাচীন যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে প্রাচীন লিপি, মুদ্রা, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(১) **লিপি।** ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন যুগের অনেক লিপি পাওয়া গিয়াছে। পাথরের দেওয়ালে, স্তম্ভে, মন্দিরগাত্রে এই লিপি খোদিত রহিয়াছে। এই সকল লিপিতে প্রাচীন ভারতের রাজপ্রশস্তি, ঘটনা অথবা রাজাদের অনুশাসন লেখা আছে। কলিঙ্গরাজ খারবেলের 'হাতীগুম্ফা শিলালিপি', সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণ-লিখিত 'এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি', শকমহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের 'জুনাগড় লিপি' প্রভৃতি হইতে অনেক রাজনৈতিক তথ্য জানা যায়। সম্রাট অশোকের একাধিক শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি হইতে তাঁহার রাজ্যসীমা, শাসনব্যবস্থা, ধর্মমত এবং প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।



অশোকের স্তম্ভলিপি (লুম্বিনী)

(২) মুদ্রা। লিপিমালাগুলির পরেই প্রাচীন মুদ্রাসমূহকে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানরূপে গণ্য করা হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত মুদ্রার উপর উৎকীর্ণ সন, তারিখ হইতে ঐতিহাসিকরা তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কোন কোন মুদ্রার উপর খোদিত রাজার মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতে গ্রীক, শক ও কুষাণ এবং দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন শাসকদের ইতিহাস-রচনায় আবিষ্কৃত বহু মুদ্রা বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে।



প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা

(৩) সৌধ স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি। খননকার্যের ফলে প্রাচীন যুগের মূর্তি, স্তম্ভ, বাসনপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার এবং প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইহাদের অবদানও অসামান্য। এইসব ভগ্ন, অর্ধ-ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি, প্রাচীরগাত্রের কারুকার্য প্রভৃতি প্রাচীন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান যোগায়। মাটির নীচে প্রাপ্ত বাসনপত্র, অলঙ্কার, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন যুগের মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পরিচয় দেয়। প্রাচীন নগর ও গৃহের ধ্বংসাবশেষ সেইসব যুগের সভ্যতার রূপ এবং বিকাশ ও পতনের সময়ের হিসাব দেয়। মহেঞ্জো-দারো ও হরপ্পার খননের ফলে এক গৌরবময় যুগের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ

বৈদেশিক বৃত্তান্ত। প্রাচীনকালে বহু বৈদেশিক পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহিনীতে সেকালের ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজজীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে মৌর্যযুগের অনেক তথ্য আমরা জানিতে পারি। প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ ও বাণিজ্যের উপাদান হিসাবে দুইটি গ্রীক গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান। একটি 'দি পেরিপ্লাস অব দি ঈরিথিয়ান সি' এবং অন্যটি টলেমির 'জিওগ্রাফি'। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির 'ন্যাচারালিস হিস্টোরিয়া' নামক গ্রন্থটি প্রথম খ্রীস্টাব্দে লেখা। ইহাতে ভারত-রোম বাণিজ্যিক সম্পর্ক লিপিবদ্ধ আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন-সাঙ ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের মূল্যবান বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

গ্রীক, রোমান ও চৈনিক বিবরণ

দ্বিতীয় অধ্যায় | ভারতীয় সভ্যতার সূচনা

সর্বাপেক্ষা পুরাতন যে সময়ের কথা আমরা কতকটা জানি তাহাকে বলা হয় পুরাতন প্রস্তর যুগ (Palaeolithic Age)। ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসিগণ ছিল এই যুগের লোক। ইহারা অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য হাতিয়ার নির্মাণে প্রস্তর ব্যবহার করিত। ইহারা প্রস্তরকে ভাঙ্গিয়া প্রয়োজনীয় খণ্ডে পরিণত করিত। তবে সেগুলিকে মসৃণ করিতে পারিত না। ইহারা কৃষিকার্য জানিত না এবং ইহাদের থাকিবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পুরাতন প্রস্তর যুগের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারত, কাশ্মীর, ছোটনাগপুর অঞ্চলে। পুরাতন প্রস্তর যুগের সূচনাকাল ঠিক করিয়া বলা শক্ত। তবে কেহ কেহ মনে করেন প্রায় ৩৫ লক্ষ বৎসর পূর্বে মানুষ পাথরের দ্রব্যাদি ব্যবহার শুরু করে।

মধ্য প্রস্তর যুগ। পুরাতন প্রস্তর যুগের অবসান ঘটে প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ৮০০০ অব্দে। এই সময় আবহাওয়ার পরিবর্তন সূচিত হয়। ইহার ফলে মানুষ বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এই যুগকে মধ্য প্রস্তর যুগ (Mesolithic Age) বলা হয়। ভারতবর্ষে এই যুগ খ্রীস্টপূর্ব চার হাজার অব্দ পর্যন্ত টিকিয়া ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

মধ্য প্রস্তর যুগের ব্যবহৃত প্রস্তরগুলি ছিল আকারে ছোট এবং এইগুলির দ্বারাই প্রাচীন প্রস্তর যুগের সঙ্গে এই যুগের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। মধ্য ভারতে কৃষ্ণা নদীর তীরবর্তী স্থানে এই যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

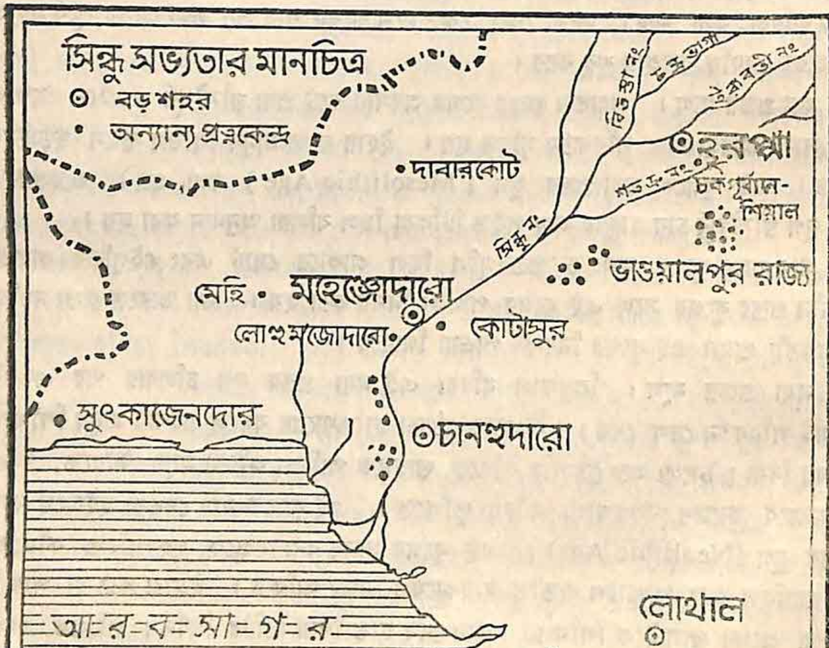
নব্য প্রস্তর যুগ। কিছুকাল ধরিয়া এই মধ্য প্রস্তর যুগ চলিবার পর একটি বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। পাথরের ভোঁতা হাতিয়ারের বদলে এইবার মানুষ শিখিল পাথর দিয়া ছুঁচালো অস্ত্র তৈয়ারি করিতে, তাহাকে পালিশ করিয়া মসৃণ করিতে, আর নানাভাবে কাজের উপযোগী করিয়া তুলিতে। এই যুগকে নাম দেওয়া হইয়াছে নব্য প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। এই যুগের মানুষ বন্য জন্তুকে গৃহপালিত করিতে শিখিয়াছিল এবং পশুচারণ ব্যতীত কৃষিকার্যেও নিযুক্ত থাকিত। ইহারা কাঠ বা পাথর ঠুকিয়া আগুন জ্বালাইতে শিখিল। ক্রমে ক্রমে হাত দিয়া মাটির জিনিস গড়িতে এবং কুমোরের চাকা আবিষ্কার করিল। ইহারা মৃতের সমাধি রচনা করিত। মৃতদেহের সঙ্গে যে মাটির পাত্র রাখিয়া দেওয়া হইত তাহার কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে এই নব্য প্রস্তর যুগের বহু নিদর্শনের সন্ধান মিলিয়াছে। উত্তর ভারতেও কিছু পাওয়া গিয়াছে।

ধাতুর যুগ। নব্য প্রস্তর যুগের পর বিভিন্ন ধাতু ব্যবহারের যুগ শুরু হইয়াছিল। সকল দেশেই মানুষ যতই সভ্য হইয়াছে ততই প্রস্তরের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম

হয় নাই। প্রথম যে ধাতু মানুষ ব্যবহার করে তাহা ছিল তামা। তামা ও পাথরের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করিয়া কয়েকটি সভ্যতা গড়িয়া উঠে। ঐতিহাসিকরা ইহার নাম দিয়াছেন তাম্র-প্রস্তর (Chalcolithic) সংস্কৃতি। সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা অবশ্য একমাত্র তামা ও পাথরের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা টিনের সঙ্গে তামা মিশাইয়া ব্রোঞ্জ নামক ধাতু তৈয়ারী করিবার কৌশল জানিত।

হরপ্পা সভ্যতা

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসে নূতন অধ্যায় শুরু হয়। বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদারো এবং পাঞ্জাবের হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ভারতের তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার এক প্রামাণিক নিদর্শন উন্মোচিত



হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দয়ারাম সাহনী স্যার জন মার্শালের সহযোগিতায় মহেঞ্জোদারোতে প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।

হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও অন্যান্য স্থানের আবিষ্কারের ফলে এই তথ্যই প্রমাণিত হয় সিন্ধু উপত্যকায় এমন এক উচ্চশ্রেণীর সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল যাহা মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। পূর্বে ধারণা ছিল বৈদিক সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন, কিন্তু এই আবিষ্কারের ফলে এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান, গুজরাট, রাজস্থান এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কিছু অংশ ছিল এই সভ্যতার অন্তর্গত। উত্তরে জম্মু হইতে দক্ষিণে নর্মদা, পশ্চিমে বেলুচিস্তান হইতে উত্তর-পূর্বে মীরাট পর্যন্ত এই সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। খননকার্যের ফলে এখন পর্যন্ত ২৫০টি হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে এই সভ্যতার সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়। এই সভ্যতার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির নাম হইল যথাক্রমে চানহুদারো, লোথাল, উত্তর রাজস্থানের কালিবাঙ্গান ও হরিয়ানার বনওয়ালি। কাথিয়াওয়াড়-এর রংপুরে এবং সুৎকাজেন-দোরের মত উপকূলবর্তী শহরেও হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই বিরাট অঞ্চলটি আয়তনে প্রায় ১৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। তৎকালীন পৃথিবীর কোন সভ্যতাই এত বৃহৎ ও ব্যাপক ছিল না। বর্তমান পাকিস্তানের চেয়ে এই অঞ্চল আয়তনে বড়।

সিন্ধু সভ্যতার কাল নির্ণয়

সিন্ধু সভ্যতার এলাকা

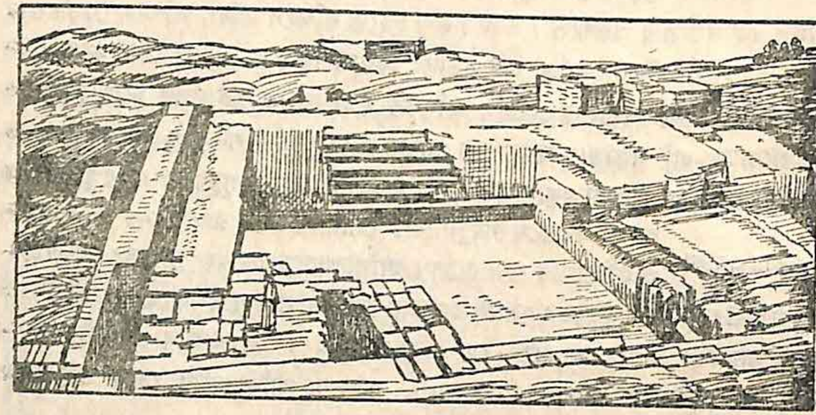
হরপ্পা সভ্যতার ও মেসোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করিলে হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া হরপ্পা সভ্যতার মৃৎপাত্রগুলির গাত্রের রঙ বিশ্লেষণ এবং তেজস্ক্রিয় পরীক্ষণ এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত হইল হরপ্পা সভ্যতার নগর-বসতিগুলির উন্নতি ঘটে খ্রীস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে এবং এই সভ্যতার চরম উন্নতি ঘটে খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ ও ২০০০ অব্দের মধ্যে। খ্রীস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতা স্থায়ী হইয়াছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসের পর হরপ্পা সভ্যতার অংশবিশেষ গুজরাট, রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে বেশ কিছুদিন টিকিয়া ছিল।

সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনত্ব

নগর পরিকল্পনা ও নাগরিক জীবন। হরপ্পা সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নগর পরিকল্পনা। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোয় যে নগর সভ্যতার পরিচয় আমরা পাই তাহা উন্নত মানের নগর সভ্যতার পরিচয় বহন করে। হরপ্পা সভ্যতায় নগরগুলির সাধারণতঃ দুইটি অঞ্চল ছিল—একটি অঞ্চল ছিল উঁচু, এখানে দুর্গ থাকিত এবং অপর অংশ ছিল নিম্ন অঞ্চল। দুর্গ অঞ্চলে সমাজের শাসক শ্রেণীরা বসবাস করিত, আর নিম্ন অঞ্চলে সমাজের সাধারণ মানুষেরা বসবাস করিত। দুর্গ অঞ্চল প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। বিভিন্ন আকারের বাদামী ও টুকটুকে লাল রঙের ইটই ছিল সে সময়ে গৃহ, কূপ, প্রাচীর প্রভৃতি নির্মাণের উপাদান। রাস্তাঘাট তৈয়ারী করা হইত সোজাসুজি। প্রতিটি শহর কয়েকটি অংশে বা পাড়ায় বিভক্ত

পরিকল্পিত নগর

ছিল। জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর ছিল। বাড়ির উপরতলা হইতে প্রাচীরের মধ্যে গাঁথা অথবা ইট দিয়া ঢাকা পোড়া মৃত্তিকার নল বাহিয়া জল নীচে পড়িত। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই পাকা কূপ ও স্নানাগার ছিল। সেখান হইতে ময়লা জল পথের ধারে ঢাকা নর্দমায় পড়িত। জল নিষ্কাশনের এরূপ সুব্যবস্থা ঐ যুগের পক্ষে অচিন্ত্যনীয়।



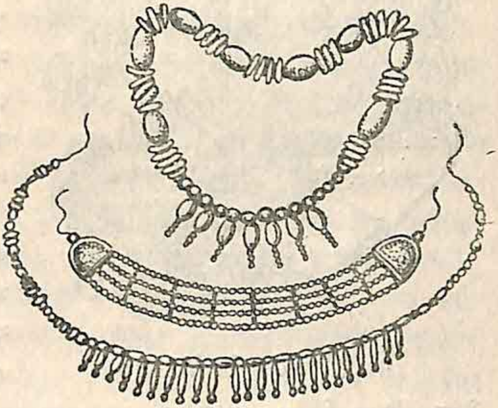
মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার

মহেঞ্জোদারো শহর উপর্যুপরি সাতবার নির্মিত হয় ও হরপ্পা আটবার। রাস্তার দুই পার্শ্বে অট্টালিকাগুলি ছিল সুবিন্যস্ত ও সারিবদ্ধ। অট্টালিকাগুলি এমনভাবে সুপরিকল্পিত ছিল যে কোথাও রাজপথের প্রশস্ততা এই সমস্ত অট্টালিকার জন্য সংকীর্ণ হয় নাই। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি বৃহৎ স্নানাগার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার আয়তন ১১৪·৮৮ × ৭০·১ মিটার এবং গভীরতা ২·৪৩ মিটার। ইহাতে নীচে নামিবার সিঁড়ি ও জল প্রবেশ ও বাহির হইবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার প্রাচীর জিপসাম দিয়া গাঁথা ছিল, যাহাতে জল নিঃশেষ হইয়া না যায়। ইহার চতুর্দিকে ছোট ছোট জামা-কাপড় ছাড়িবার ঘর ছিল। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও অন্যান্য স্থানে বড় বড় শস্যগোলার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সর্ববৃহৎ শস্যগোলাটি ছিল দৈর্ঘ্যে ৪৫·৭০ মিটার এবং প্রস্থে ১৫·২৩ মিটার। শস্য গোলাগুলি হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

সামাজিক অবস্থা। হরপ্পা সভ্যতার সমাজ ছিল শ্রেণীভিত্তিক। তবে এই সমাজে জাতিভেদপ্রথা ছিল কিনা বলা যায় না। এই সমাজের বিশেষ অধিকারভোগীরা নগরের সবচেয়ে ভাল জায়গায় বসবাস করিত। ধনীদের বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ যেমন পাওয়া গিয়াছে তেমনি দরিদ্রদের ছোট ছোট ঘরেরও নিদর্শন রহিয়াছে। হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলিতে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধাতুশিল্পী, বস্ত্রশিল্পী, ইট তৈরীর কারিগর প্রভৃতি সমাজে বিশেষ স্থান পাইয়াছিল।

খাদ্য ও পোষাক। গম ও যবের দানা খননকার্যের সময় পাওয়া গিয়াছে। আমিষের মধ্যে গরু, ছাগ, মেষ, শূকর, মৎস্য ও বিশেষ পাখি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত। গৃহপালিত পশু ছিল কুকুর, গরু, বিড়াল ও ষাঁড়। বাঘ, ভালুক, হাতী, হরিণ, উট ও গণ্ডার পরিচিত ছিল। রান্নার জন্য তৈয়ারী মাটির এবং ধাতুর পাত্রও পাওয়া গিয়াছে।

সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা সূতীবস্ত্র পোষাক হিসাবে ব্যবহার করিত। এই যুগে ভারতের বাহিরে সভ্য জগতে তূলার প্রচলন ছিল না। সে যুগে পুরুষেরাও লম্বা চুল রাখিত এবং স্ত্রী-পুরুষ অলঙ্কার ব্যবহার করিত। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং নানারূপ মূল্যবান পাথর অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইত। বিভিন্ন পাথরের উপর বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা সাদা নক্সা খোদিত হইত। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে কাঁসার তৈয়ারী কুঠার, ছুরি, করাত, কাস্তে, ক্ষুর ও মৎস্য ধরিবার বড়শি ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। আক্রমণাত্মক অস্ত্রের সংখ্যা কম পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, প্রতিবেশীদের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পৃহা বেশী ছিল না।



সিন্ধু সভ্যতার ব্যবহৃত অলঙ্কার

শিল্পকলা। সিন্ধু সভ্যতার ভাস্কর্যের মধ্যে মাটির কাজ অভিনব। ব্রোঞ্জ-নির্মিত যে মূর্তিগুলি পাওয়া গিয়াছে সেইগুলি হইতে শিল্পীদের উচ্চ শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পীরা বাস্তবধর্মী ছিলেন, কারণ তাঁহাদের তৈয়ারী জিনিসপত্র দেখিয়া ঐরূপ মনে করিবার যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। মহেঞ্জো-দারোতে দাড়িযুক্ত গোঁফ-কামানো যে মনুষ্য-মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছে তাহার সহিত তৎকালীন পুরুষের গোঁফ-কামানো চেহারার সুস্পষ্ট মিল দেখা যায়। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য প্রস্তুত মাটির খেলনাগুলিতেও শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা ছাড়া অসংখ্য শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির উপর অংকিত মানুষ ও পশুর প্রতিমূর্তিগুলি শিল্প-জ্ঞানের পরিচয় দেয়। জন্তুগুলির বিশেষ করিয়া কুঁজওয়ালা বৃষের মূর্তিতে শিল্পীর নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়।



মহেঞ্জোদারোয় প্রাপ্ত মনুষ্যমূর্তি

ধর্মীয় জীবন। সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ হইতে যে সব মূর্তি ও অন্যান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, সে যুগের মানুষ ধর্মের ক্ষেত্রে শিব, জগন্মাতা, সর্প, পশু ও বৃক্ষ পূজা করিত। একটি সীলমোহরে যোগাসীন বিবিধ পশু পরিবৃত একটি দেবমূর্তি আছে। অনেকে মনে করেন যে উহা পরবর্তী যুগের শিবেরই আদিম প্রতিমূর্তি। ইহা ছাড়া তাম্রমুদ্রায় অগ্নিদেবতার বেদীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বর্তমান হিন্দুধর্মে হরপ্পা যুগের ধর্মের অনেক উপাদান দেখা যায়।



পশু-পরিবৃত দেবমূর্তির শীলমোহর

ভাষা। সিন্ধু সভ্যতার মানুষ লিপি ব্যবহার করিত। লিপি চিত্রধর্মী বলিয়া মনে হয়। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে সিন্ধুবাসীরা লিপি সম্পর্কে একটি স্থায়ী ভাব আনয়ন করিয়াছিল। সিন্ধুবাসীদের লিপি এখনও পড়িতে পারা যায় নাই, তবে মনে হয় উহা ডানদিক হইতে বামদিকে লিখিত হইত।

অর্থনৈতিক অবস্থা। কৃষিকার্যই হরপ্পা সভ্যতার মানুষদের প্রধান জীবিকা ছিল। ফসলের মধ্যে প্রধান ছিল গম এবং বার্লি। কাঠের তৈয়ারী লাঙ্গলের ফলা তাহারা ব্যবহার করিত। তাহারা তুলার চাষও করিত। কৃষিকার্য ছাড়া পশুপালনও হরপ্পা সভ্যতার মানুষের অন্যতম জীবিকা ছিল। বলদ, ছাগল, ভেড়া ও শূকর ছিল গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে প্রধান।

কৃষিকাজ ও পশুপালন

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা দুইটিই ছিল বাণিজ্য-প্রধান নগর। বাণিজ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট ওজন প্রণালী ব্যবহার অপরিহার্য। সিন্ধু সভ্যতার মানুষ ওজনের জন্য নানাবিধ প্রস্তরের ঘনক ব্যবহার করিত। আমদানি ও রপ্তানির বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্ভবতঃ স্থল এবং জল এই উভয় পথেই চলিত। সিন্ধু সভ্যতার মানুষ যে-সব ধাতু ব্যবহার করিত সেগুলি ঐ অঞ্চলে বিশেষ পাওয়া যাইত না, এই কারণে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত।

বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য

সমসাময়িক সভ্যতার সহিত সম্পর্ক। হরপ্পা সভ্যতার সহিত সমসাময়িক সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার নিবিড় সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। হরপ্পা সভ্যতার অনেক শীলমোহর মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া গিয়াছে। হরপ্পা সভ্যতায় কেশচর্চার রীতি সুমেরীয় সভ্যতার নারীদের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া অট্টালিকার খিলান, দেয়াল, কুলঙ্গি, নারী দেবতার পূজা, বিভিন্ন শীলমোহরে একই প্রকার

পশুর চিত্র, কুমোরের চাক, তামা ও ব্রোঞ্জের পাত্র হরপ্পা সভ্যতা ও সুমের সভ্যতার নিবিড় সম্পর্কের সন্ধান পাওয়া যায়।

মিশরীয় সভ্যতার সহিতও এই সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জো-দারোতে এমন কতকগুলি জিনিস পাওয়া গিয়াছে যেগুলি মিশর হইতে আমদানি করা হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। যেমন শিশুসহ মাতৃমূর্তি, দীপাধার ও আসবাবপত্র। তাহা ছাড়া প্রাচীন মিশরবাসীরা যেমন দেবীর আরাধনা করিত, ষাঁড়কে শ্রদ্ধা করিত হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরাও মাতৃদেবীকে পূজা করিত এবং ষাঁড় ছিল তাহাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ। হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ হিসাবে বলা হয় যে আর্যজাতির আক্রমণেই এই সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে আর্যজাতির আগমনের পূর্বেই অভ্যন্তরীণ নানা বিপর্যয়ের জন্য এই সভ্যতা হীনবল হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে চাষের জমিতে লবণতা বৃদ্ধি, বন্যা, রাজপুতানার মরুভূমির সম্প্রসারণ ও সিন্ধুনদের গতিপথ পরিবর্তন এই অভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের কয়েকটি কারণ।

অভ্যন্তরীণ কারণ

কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে আর্যগণের আক্রমণে সিন্ধু সভ্যতার পতন ঘটে। ঋক্ বেদে উল্লেখ আছে সৃঞ্জয় নামক আর্যগোষ্ঠী ইন্দ্রের সহায়তায় হরিয়ুপীয়ার পূর্বভাগে অবস্থিত বরসিখ বংশীয় বৃচীবৎগণকে নিধন করিয়াছিল। তাঁহাদের মতে হরিয়ুপীয়া হইল হরপ্পা। এই মত ঠিক বা বেঠিক হউক ইহা সত্য যে, সিন্ধু সভ্যতার অবলুপ্তি ও আর্যগণের ভারতে আগমনের সময়কাল প্রায় মিলিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে হরপ্পা শহরটিকে আক্রমণকারীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শহরের দুর্গগুলিকে মজবুত করা হইয়াছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন এবং রাস্তায় পড়িয়া থাকা মানুষের কঙ্কাল ইঙ্গিত দেয় যে একদা শহরবাসী ও বিদেশী শত্রুদের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

আর্যদের আক্রমণ

তৃতীয় অধ্যায় | ভারতের বৈদিক সভ্যতা

আর্যদের আদি বাসস্থান। আর্য বলিতে সাধারণতঃ আমরা একটি জাতির নাম বুঝিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত অর্থে আর্য কোন জাতির নাম নয়। ইহা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর নাম। সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক, কেল্‌টিক এবং পারসিক এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। স্বভাবতই যাহারা এই ভাষায় কথা বলিত তাহাদের আর্য বলা হইত।

ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে আর্যদের অবদান অনস্বীকার্য। এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, এই আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ পরস্পর-বিরোধী মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। একদল ঐতিহাসিক মনে করেন যে ভারতবর্ষই আর্যদের আদি বাসস্থান। এই মতটি গ্রহণ করা যায় না। কারণ ভারত যদি আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল তাহা হইলে আর্যরা ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ইরান ও ইউরোপে যাইবার পূর্বে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে তাহারা বসতি বিস্তার করে নাই কেন? সমগ্র ভারতবর্ষে আর্য সংস্কৃতি প্রসারিত হইতে এক হাজর বৎসরের বেশি লাগিয়াছিল কেন? তাহা ছাড়া ভারতের আদিবাসীদের ভাষার সঙ্গে আর্যজাতির ভাষার কোন মিল ছিল না। ভারতবর্ষ আদি বাসস্থান হইলে ইহা সম্ভব হইত না। অতএব ভারতবর্ষ আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল না ইহা মানিয়া লওয়াই সঙ্গত।

আদি আর্যদের বাসস্থান ভারতবর্ষ কেন নয়?

আর একদল ঐতিহাসিক ইউরোপকে আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল বলিয়া মনে করেন। এই মত গ্রহণযোগ্য হইলেও ইউরোপের কোন্ অঞ্চল আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল সে সম্বন্ধে আবার ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে উড়াল পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত স্তেপ অঞ্চল, কাহারও মতে লিথুয়ানিয়া, আবার কাহারও মতে পোলাও, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী অঞ্চল। ঋগ্বেদ ও আবেস্তায় যে সকল বৃক্ষ, জন্তুজানোয়ারের উল্লেখ আছে সেগুলি ইউরোপের ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ ও জীবজন্তু। ইউরোপীয় এবং ইন্দো-ইরানীয়গণ বহুদিন ঐ স্থানে একত্রে বসবাস করিতেন এবং পরে বিভিন্ন কারণে তাঁহারা ইরান ও ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। যে সব আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেন তাঁহাদের ভারতীয় আর্যরূপে গণ্য করা হয়।

ইউরোপই আর্যদের আদি বাসস্থান

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক দেড় হাজার বছর পূর্বে সম্ভবতঃ আর্যগণ তাহাদের অজ্ঞাত মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে।

ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তারের ঐতিহাসিক উপাদান বৈদিক সাহিত্যে রহিয়াছে। ঋগ্বেদ ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ভারতে আর্য বসতির বিস্তারকাল হইল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ হইতে ৫০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত।

ভারতবর্ষে আর্য বসতির বিস্তার কোন একটি বিশেষ দলের দ্বারা ঘটে নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠী ক্রমানবয়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। এই সকল গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। এই গোষ্ঠীগুলি অনার্যদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া ভারতবর্ষের পূর্ব ও দক্ষিণে বসতি বিস্তার করিয়াছিল। সিন্ধু ও তাহার শাখা-প্রশাখা বিধৌত পাঞ্জাব ঋগ্বেদ যুগের ভারতীয় আর্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানের পুরু ও শিবি জাতির কথা ঋগ্বেদে আছে। পূর্বদিকে তাহারা থানেশ্বর ও তাহার নিকটবর্তী সমতল অঞ্চলে বসতি শুরু করিয়াছিল। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃশদ্বতী, গোমতী, সরযূ প্রভৃতি নদী এবং মধ্যদেশের অধিবাসী বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠীর কথা ঋগ্বেদে আছে।

ভারতে আর্যবসতির স্বরূপ

বৈদিক বা আর্য সভ্যতা

আর্যদের সাহিত্য। আর্যদের সর্বপ্রাচীন সাহিত্যের নাম বেদ। 'বিদ্' অর্থাৎ জ্ঞান এই শব্দ হইতেই বেদ নামের উৎপত্তি। বেদ চারটি —ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। এই চারি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বেদ কোন ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা রচিত নয়। হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস যে বেদ হইল ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী। এই কারণে ইহার অপর নাম 'শ্রুতি'।

ভারত উপমহাদেশে আর্যদের সাহিত্যচর্চার প্রথম প্রকাশ ঘটে ঋগ্বেদে। পৃথিবীর সমস্ত আর্যজাতির গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা পদ্যে লিখিত। ঋগ্বেদে ১০২৮ টি মন্ত্র বা সূক্ত আছে। ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের মধ্যে বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করিয়া হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ফলে যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ঋগ্বেদে যে সভ্যতার পরিচয় আমরা পাই তাহার পরিপূরক হিসাবে এগুলিকে গণ্য করা যায়।

ঋগ্বেদ

প্রত্যেকটি বেদ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ—এই চারিভাগে বিভক্ত। এই বিভাগগুলির মধ্যে সংহিতা পদ্যে রচিত দেবতাদের স্তুতি। ব্রাহ্মণ অংশ প্রধানতঃ গদ্যে লিখিত। এই অংশে বৈদিক যাগযজ্ঞের বিধি বর্ণনা করা আছে। পরিণত বয়সে যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবেন তাঁহাদের কিভাবে জীবনযাপন করিতে হইবে তাহারাই আলোচনা আছে বেদের আরণ্যক অংশে। উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের শেষ অংশ। সেইজন্য ইহাকে বেদান্তও বলা হয়। উপনিষদগুলি ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রতিটি বেদের চারিটি ভাগ

বেদাঙ্গ ছয়টি শাখায় বিভক্ত—**শিক্ষা** (শব্দবিদ্যা), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় ও মূল ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত বিদ্যা), **কল্প** (ধর্মীয় ভজন পূজন-পদ্ধতি সংক্রান্ত শাস্ত্র), ছন্দ (ছন্দোবিদ্যা) এবং জ্যোতিষ (জ্যাতির্বিদ্যা)। কল্পসূত্র বিপুল। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র (গার্হস্থ্য বিধি), ধর্মসূত্র ও শুল্কসূত্র। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া মনুস্মৃতি প্রভৃতি

বেদাঙ্গ ও কল্পসূত্র

উনিশটি স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়। গৃহ্যসূত্রে আছে উপনয়ন, চূড়াকরণ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি বিধি। ধর্মসূত্রে সমাজ-ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিরূপণ করা হইয়াছে।

আদি বৈদিক সভ্যতা : ঋগ্বেদের যুগে জনজীবন। ঋগ্বেদ কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়, তৎকালীন ভারতীয়দের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায়।

সামাজিক জীবন। আদি বৈদিক যুগে আর্যরা পিতৃতান্ত্রিক প্রথায় সমাজ গঠন করিত। পিতাকে ঘিরিয়া তাহাদের গৃহযাত্রা শুরু হইত। পারিবারিক জীবনে ও সমাজে নারীর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। সে যুগে পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল না ; বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাইত। ঘোষা, মমতা, অপালা প্রভৃতি আর্যনারীর রচিত মন্ত্র ঋগ্বেদে স্থান পাইয়াছে। এমন কি যুদ্ধ পরিচালনায় মেয়েরা অংশগ্রহণ করিত।

সমাজে নারীর স্থান

আদি বৈদিক যুগের সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিল না। তাহাদের মধ্যে যাহা ছিল তাহা হইল বর্ণ বিভাগ। মানুষের গায়ের রঙকে সে যুগে বর্ণ বলা হইত। আর্যরা গৌরবর্ণ ছিলেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদের রঙ ছিল কৃষ্ণবর্ণ। এই বর্ণবৈষম্য হইতে আংশিকভাবে সামাজিক বৈষম্যের জন্ম হয়। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে আর্যদের জয়লাভই পরবর্তীকালে সামাজিক বৈষম্যের উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে বা সুক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের মতে এ সুক্তটি পরবর্তীকালে ঋগ্বেদে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

জাতিভেদ প্রথা

ঋগ্বেদের যুগে সামাজিক কাঠামোর মূলকথা ছিল আত্মীয়তা। সমাজের ব্যক্তিমানুষের পরিচয় নির্ধারিত হইত সে কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তাহা নিয়া। গোষ্ঠীর অপর নাম ছিল 'জন'। জন বা গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য দেখান সমাজ-ব্যক্তিদের প্রধান কর্তব্য ছিল। রাজ্যের উৎপত্তি তখনও হয় নাই বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। 'জন' ছাড়াও গোষ্ঠীর আর একটি নাম ছিল ভিশ বা বিশ। ঋগ্বেদে 'জন' বা 'বিশ'-এর বারংবার উল্লেখ আছে।

গোষ্ঠী জীবন

অর্থনৈতিক জীবন। প্রাচীন বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক। এই কারণে কৃষি ও পশুপালনই ছিল সেই সময়কার প্রধান পেশা। বর্তমান কালের ন্যায় তখনকার দিনে হাল ও বলদের দ্বারা জমি কর্ষণ করা হইত। গো-প্রতিপালনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইত।

প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারের আবাদযোগ্য নিজস্ব জমি ছিল এবং জলসেচ ও সার দিয়া চাষ-আবদ করার পদ্ধতিও তাহারা অনুসরণ করিত। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরুই ছিল প্রধান। ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া ও কুকুরও তাহারা পালন করিত। কৃষিকার্য ও পশুপালন ছাড়া বন্যপশু শিকার বৈদিক যুগে অন্য একটি উপজীবিকা ছিল। যানবাহন বলিতে ছিল বলদে-টানা গাড়ি ও ঘোড়ায়-টানা রথ।

মূলতঃ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রয়োজনে অন্যান্য বৃত্তির উদ্ভব হয়। বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প ও চারুশিল্প গ্রাম্য অর্থনীতির সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে সম্মানজনক পেশা ছিল ছুতার এবং কামারের, কারণ তাহারা চাষের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী করিত। ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ, তাম্র, ব্রোঞ্জ-এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অনেকের মতে এই যুগে লৌহের ব্যবহার শুরু হয় নাই।

অন্যান্য বৃত্তি

বৈদিক যুগের প্রথমদিকে বিনিময় দ্বারাই বেশির ভাগ ব্যবসায় ও আদান-প্রদান চলিত। পরে 'নিষ্ক' নামক একপ্রকার মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

ধর্মীয় জীবন। বৈদিক সাহিত্য পাঠেই জানা যায় আর্যগণ বহু দেবদেবীর উপাসক ছিলেন। এই সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, বজ্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অরণ্য-পর্বত-বেষ্টিত ভারতভূমিতে সেদিন যে আর্য সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল তাহার উপর প্রকৃতির প্রভাব ছিল অপরিসীম। ধর্মে এই প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশী পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে স্বর্গের দেবতা দৌস ছিলেন তাহাদের প্রধান দেবতা। তাঁহাকে সমগ্র জাতির পিতারূপে কল্পনা করা হইত। তাঁহার সঙ্গিনী ছিলেন মাতা পৃথিবী। ঊষা বা অদিতি নামক দেবীর উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন ভোরের দেবতা। নক্ষত্র-খচিত আকাশের দেবতা বরুণ প্রাচীন আর্যদের মনে প্রধান স্থান অধিকার করেন। বৈদিক যুগে আর্যগণ প্রধানতঃ গোপালন ও কৃষিকার্য করিয়া জীবন যাপন করিত বলিয়া বর্ষা ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র ছিলেন তাহাদের বিশেষ প্রিয় দেবতা। ইন্দ্র ছিলেন বড় যোদ্ধা। সে কারণে শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা বহু প্রচলিত ছিল। অগ্নিতে কোন দ্রব্য আহুতি দিলে তিনি তাহা দেবতাদের নিকট পৌঁছাইয়া দেন এইরূপ মনে করা হইত। ঋগ্বেদের প্রায় ২৫০টি স্তব তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

প্রকৃতি পূজা: বিভিন্ন দেবদেবী

প্রথমদিকে আর্যরা দেবতার মূর্তি গড়িয়া পূজা করিতেন না। কোন মন্দিরেরও উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে নাই। দেবতাদের উপাসনার জন্য যজ্ঞের আয়োজন করা হইত। বেদীর উপর হোমাগ্নি জ্বালিয়া স্তবস্তুতির পর মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে ঘৃত, দুগ্ধ, যব, মধু প্রভৃতি আহুতি দেওয়া হইত। ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের ধর্ম বিশেষ জটিল ছিল না। তাঁহারা দেবতাদের মানুষের ন্যায় মনে করিতেন। দেবতাদের নিকট তাঁহারা সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা জানাইতেন।

যাগযজ্ঞ ও পূজা

রাজনৈতিক জীবন। পারিবারিক সংগঠন ছিল রাষ্ট্রের ভিত্তি। কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টি লইয়া একটি গোত্র (clan) গঠিত হইত—এই পরিবারগুলির মধ্যে প্রকৃত অথবা কাল্পনিক রক্তের সম্পর্ক থাকিত। কতিপয় গোত্রের সংহতি দ্বারা একটি 'বিশ' (district) গঠিত হইত। অনুরূপভাবে একাধিক বিশ-এর সংযোগ দ্বারা গোষ্ঠী গঠিত হইত। ঋগ্বেদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পঞ্চগোষ্ঠীর উল্লেখ রহিয়াছে—তুর্ভস, যদু, পুরু, দ্রুহ ও অনু। এই সকল গোষ্ঠীর শীর্ষদেশে থাকিতেন রাজন্। রাজপদ বংশানুক্রমে অধিকৃত হইত,

কখনও কখনও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ইঙ্গিত রহিয়াছে। রাজার প্রধান কর্তব্য ছিল জাতির ধনপ্রাণ রক্ষা করা, যুদ্ধ পরিচালনা করা, ধর্ম রক্ষা করা প্রভৃতি। শাসনকার্যে তিনি 'পুরোহিত', রাজকর্মচারীরূপে 'সেনানী' এবং 'গ্রামণী'র সাহায্য লইতেন। 'সভা' ও 'সমিতি' রূপে পরিচিত দুই প্রকারের পরিষদ ছিল। সঠিকভাবে ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। তবে মনে হয় যে সমিতিতে সকলে উপস্থিত হইত, আর সভায় বর্ষীয়ান ব্যক্তিদেরই সমাগম হইত।

রাজনৈতিক সংগঠন

পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা। সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও সূত্র সাহিত্য হইতে পরবর্তী বৈদিক যুগের আর্যদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা যায়।

এই যুগে আর্য সমাজ কিছুটা জটিল হইয়া পড়ে এবং লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ফলে বৃত্তি ও কর্মক্ষমতা অনুসারে সমাজে চারিটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তবে সমাজে জাতিভেদ প্রথা বলিতে আমরা যা বুঝি তাহা তখনো দেখা দেয় নাই। এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে যাওয়া সহজ ছিল। ক্ষত্রিয় শিক্ষকদের বহু ব্রাহ্মণ ছাত্র থাকিত। শাখা, চরণ, পরিষদ, কুল প্রভৃতি ছিল বেদ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয়। শূদ্রদের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পূজা-পার্বণ, যাগযজ্ঞ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়া যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের বলা হইত ব্রাহ্মণ। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার, যুদ্ধ-বিগ্রহ যাঁহারা করিতেন তাঁহারা হইলেন ক্ষত্রিয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন যাঁহারা করিতেন তাঁহারা হইলেন বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। অনার্যদের মধ্যে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর্য-সমাজে স্থান পাইল তাহারা হইয়া রহিল সবচেয়ে নিম্নশ্রেণী—শূদ্র। প্রথম প্রথম সমাজে এই বর্ণভেদ খুব কঠোর ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রথা ক্রমশঃ কঠোর হইয়া উঠে।

সামাজিক অবস্থা : বৃত্তি বিভাগ

এই যুগের সমাজব্যবস্থায় চতুরাশ্রমের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—সমাজের এই তিনটি শ্রেণীর প্রত্যেকের জীবন চারিটি স্তরে বিভক্ত ছিল। প্রথম জীবন গুরুগৃহে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস ও ব্রহ্মচারী জীবন যাপন—ইহাকে বলা হইত ব্রহ্মচর্য। এই স্তর শুরু হইত উপনয়নের মাধ্যমে। উপনয়নের পর ব্রহ্মচারী শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে যাইত এবং সমগ্র শিক্ষাকাল গুরুগৃহে থাকিত। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শিক্ষার্থীদের পক্ষে বেদ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার প্রয়োজন ছিল না। শূদ্রের পক্ষে বেদপাঠ নিষিদ্ধ ছিল। তাহারা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও যাগযজ্ঞে যোগ দিতে পারিত না। ব্রহ্মচর্য পর্যায় শেষ হইলে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইত। তাহার পর প্রৌঢ় অবস্থায় বানপ্রস্থে যাইতে হইত। আর সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় জপতপে জীবন কাটাইতে হইত।

চতুরাশ্রম

এই যুগে নারীদের স্বাধীনতা কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। উপনয়নের অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত হয় এবং বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে নারী ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

এই যুগের মানুষ মূলতঃ কৃষিজীবী ছিলেন এবং এক এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন। নগরের আবির্ভাব এই সময় ঘটে। জমির মালিক ছিল পরিবার। এই যুগের অর্থনীতিতে গরুর স্থান পূর্বের ন্যায়ই ছিল। জীবনধারণের জন্য আর্যগণ বিভিন্ন বৃত্তিও গ্রহণ করিত। বৈশ্য জাতি বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে বহু শাখায় ভাগ হইয়া পড়ে। সমাজে শ্রেষ্ঠী বা ব্যবসায়ীদের আবির্ভাব এই যুগে দেখা দেয়। স্বর্ণ, লৌহ, পিতল, তামা, সীসা প্রভৃতি ধাতু এই যুগে ব্যবহৃত হইত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

যব, গম প্রভৃতি শস্য এবং দুধ, ফলমূল ও মাংস ছিল তাঁহাদের প্রধান খাদ্য। সুরা ও সোমরস নামে দুইরকম পানীয়ও ছিল তাহাদের বিশেষ প্রিয়। নীবি, পরিধান ও অধিবাস এই তিনখণ্ড পোষাকে আর্যগণ দেহ আচ্ছাদিত করিতেন। পোষাক সাধারণতঃ তুলা ও পশম হইতে তৈয়ারী হইত। আর্য নারী ও পুরুষ উভয়েই স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতুনির্মিত অলঙ্কার পরিধান করিতেন। নৃত্য, গীত ও রথচালনা—এই ছিল আর্যদের আমোদ-প্রমোদ।

খাদ্য ও পোষাক

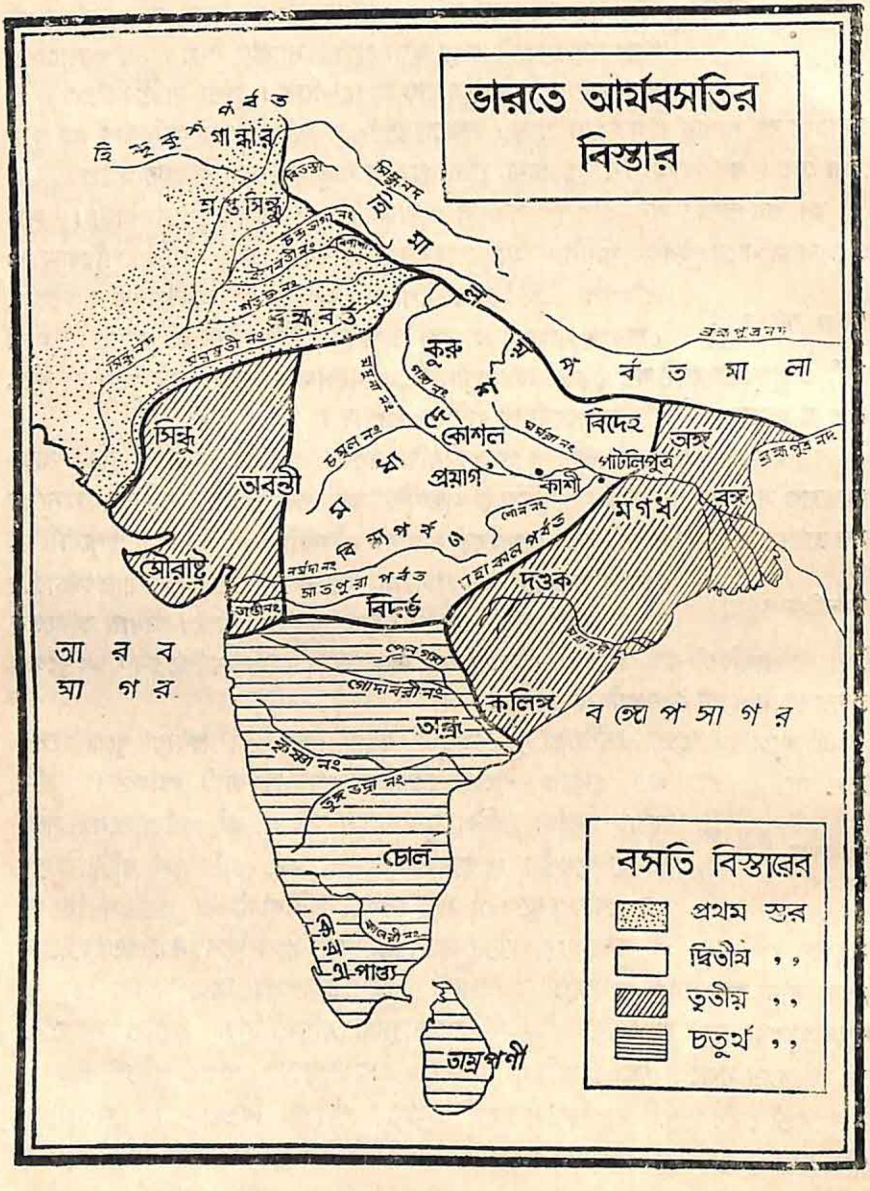
বড় বড় রাজ্য স্থাপন রাজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান রাজ-ক্ষমতাকে সংহতি দান করে। রাজসূয়, অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি সাধারণ মানুষের মনে রাজার ক্ষমতা সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইতে সাহায্য করিয়াছিল। রাজা রাজপুরোহিত, সেনাপতি, রানী ও অন্যান্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর সাহায্য লইতেন। রাজার হইয়া যাহারা রাজস্ব আদায় করিতেন তাঁহাদের সংগৃহিত্রী বলা হইত। কোষাগারের তত্ত্বাবধানে ইহারা থাকিতেন। এ যুগেও রাজার কোন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল না।

রাজনৈতিক অবস্থা

এই যুগে যাগযজ্ঞের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। ইহার জন্য ২৭ প্রকার পুরোহিতের উদ্ভব ঘটে। এক এক প্রকার পুরোহিতের অসংখ্য সহকারী থাকিত। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান জটিল রূপ ধারণ করে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীর পারস্পরিক অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। আদি বৈদিক যুগে যে সব দেবতা শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ছিলেন তাঁহাদের জনপ্রিয়তা এই সময় হ্রাস পাইয়াছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ তিনজন দেবতা হইলেন প্রজাপতি বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা শিব। এই তিনজনের মধ্যে আবার বিষ্ণু ও শিবের পূজারই বহুল প্রচলন ঘটে। এই যুগে যাদুমন্ত্র, ডাকিনী-বিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কেও নানা কুসংস্কার সমাজে দেখা দিয়াছিল। আবার একেশ্বরবাদের ধারণাও শক্তিশালী হয়।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিবর্তন

পরবর্তী বৈদিক যুগে ভারত উপমহাদেশে আর্য সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে। কৃষিকার্যের উন্নতি ঘটে। লৌহের ব্যবহার এই যুগে ব্যাপক হইতে দেখা যায় এবং তাহার ফলে কৃষি উৎপাদন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। সংস্কৃত ভাষা, বর্ণভিত্তিক সমাজ, ধর্মীয় যজ্ঞ এবং উচ্চমানের দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এই যুগের বিরাট অবদান রহিয়াছে। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই যুগের অবদান কম নয়। ভারতের বিস্তৃত বনভূমি পরিষ্কার করিয়া ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য এই যুগেই দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল।



ভারত উপমহাদেশে বৈদিক সংস্কৃতির প্রসার। চারিটি বেদ ও নানারকম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর নির্ভর করিয়া ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার প্রসারের ইতিহাস কিছুটা জানা যায়। অবশ্য আর্যদের এই সম্প্রসারণ একদিনে ঘটে নাই, কয়েকশত বৎসর ধরিয়া ইহা চলিয়াছিল। এই সময় আর্য উপজাতিগুলি নিজেদের মধ্যে যেমন লড়াই

করিয়াছে অপরদিকে বিভিন্ন অনার্যদেরও পরাজিত করিয়া নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে।

ঋগ্বেদের সূত্রগুলি হইতে জানা যায় যে প্রাচীন ইন্দো-আর্য উপজাতিগুলি পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলেই বসবাস করিত। সরস্বতী নদী ছিল তাহাদের নিকট সবচেয়ে পবিত্র। ইহা ছাড়া সিন্ধু, লোমান এবং পাঞ্জাবের আরও কয়েকটি নদীর উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। তবে গঙ্গা নদীর নাম মাত্র একবার রহিয়াছে। ঋগ্বেদের যুগের আর্যরা হিমালয়ের সঙ্গে খুব পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বিন্ধ্য পর্বতের নামও তাহারা জানিতেন না।

তখন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। আর্য উপজাতিগুলির পক্ষে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া সহজ ছিল না। বিরাট বিরাট বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া পথ বাহির করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে অগ্নিদেবতা সরস্বতী নদী (পূর্ব পাঞ্জাব) এবং সদানীর নদের (পশ্চিম বিহারের গণ্ডক নদী) মধ্যবর্তী ভূখণ্ড দগ্ধ করিয়া দিতেছেন এবং রাজা মাধব এই অগ্নি-দেবতাকে সঙ্গে লইয়া পূর্বদেশে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে আর্যগণ কিভাবে উত্তর ও পূর্ব ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্য সভ্যতা বিদেহ (উত্তর বিহার) পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল।

পাঁচটি ভৌগোলিক অঞ্চল

পরবর্তী বৈদিক সভ্যতার সময় সমগ্র ভারতবর্ষ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি অখণ্ড ভৌগোলিক রূপ নেয়—মধ্যাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চল। ইহার মধ্যে মধ্যাঞ্চল ছিল আর্য সভ্যতার পীঠভূমি। কুরু, পাঞ্চাল, উশীনর প্রভৃতি ছিল বিখ্যাত আর্যগোষ্ঠীগুলির আবাসস্থল। বেরার অঞ্চলে বিদর্ভগণ আর্য সভ্যতার বাহক ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তারলাভ পরবর্তী বৈদিক যুগে ঘটে নাই। সূত্র সাহিত্য, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি হইতে এ সম্বন্ধে জানা যায়। অঙ্গ, মগধ, বঙ্গ, কলিঙ্গ অঞ্চলকে অনার্য দেশ হিসেবে গণ্য করা হইত। বৌদ্ধগ্রন্থে অবশ্য রাজমহল পর্যন্ত আর্যাবর্তের সীমা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আসামকে কিন্তু বহুদিন আর্য সভ্যতার বাহিরে রাখা হয়। দাক্ষিণাত্যে আর্য সভ্যতার প্রসার ঘটে সর্বপ্রথম গোদাবরী নদীর উপত্যকায়। এই অঞ্চলেই পঞ্চবটী, জনস্থান ও অস্মক রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ঘটিয়াছিল। পশ্চিমাঞ্চলে অবন্তী, সৌরাষ্ট্র, সৌবীর প্রভৃতি জনপদের উদ্ভব ঘটে। এইভাবে ক্রমশঃ সমগ্র ভারতবর্ষ আর্য-সভ্যতার পীঠভূমিতে পরিণত হয়।

এই আর্য সভ্যতা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আর্যদের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই। আর্য ও স্থানীয় উপজাতিগুলির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে এই সার্বজনীন সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে।

আর্যবিজয়ের ফলে কালক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে আর্য প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেও আর্য সংস্কৃতির প্রভাব এই দেশের সর্বত্র সমানভাবে পড়ে নাই। গাঙ্গেয় উপত্যকায় উহা যেমন গভীর, ভারতবর্ষের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে সেরূপ নয়। অনার্যদের ভাষা, সভ্যতা ও আচার-

আচরণের সহিত আর্যদের বহু পরিমাণে আপস করিতে হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও বলা যায় যে আর্যগণ বৈদিক সাহিত্য ও ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার স্রষ্টা এবং আধুনিক হিন্দু সংস্কৃতির ভিত্তিস্বরূপ।

লৌহযুগের সূচনা। ধাতুর আবিষ্কার মানব সভ্যতার উন্নতির একটি বিশেষ চিহ্ন। তামা, ব্রোঞ্জ, লৌহ ইত্যাদি ধাতু আমাদের নিত্য কাজে লাগে। মানুষ সর্বপ্রথম তামার ব্যবহার শেখে এবং তামার সঙ্গে টিন মিশাইয়া ব্রোঞ্জ তৈয়ারীও শুরু করে। পৃথিবীতে ব্রোঞ্জের যুগ চলিয়াছিল প্রায় দুই হাজার বৎসর। ইহার পর শুরু হয় লৌহ যুগ। ভারত উপমহাদেশে আর্যরাই লৌহযুগের সূচনা করেন। এই লৌহের ব্যবহার কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব এগার শতকের পূর্বে ঘটে নাই। ঋগ্বেদে লোহাকে 'অয়স' বলা হইলেও ইহার ব্যবহারের বিশেষ উল্লেখ নাই। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের মধ্যেই অবশ্য লৌহের ব্যাপক প্রচলন হইয়াছিল। আর এই ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার আর্যদের জীবনযাত্রায় এক বিরাট পরিবর্তন লইয়া আসে। পরবর্তী বৈদিক যুগে লৌহ-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। লৌহ-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যেই তাহারা অনার্যদের পরাজিত করে। জঙ্গল কাটিয়া চাষযোগ্য জমি ও বসতি স্থাপনে লৌহের যন্ত্রপাতি তাহাদের সাহায্য করিয়াছিল।

লৌহ ব্যবহারের ফল

লৌহযুগের শুরুতে যে সমাজ ভারতে গড়িয়া উঠে তাহা নির্ভর করিত কৃষি ও গবাদি পশুপালনের উপর। লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতির প্রবর্তনে কারু-শিল্পের লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছিল। রাজার অস্ত্রবল বৃদ্ধি পাইল। যে অঞ্চলে লৌহ-খনি আবিষ্কৃত হইল সেই অঞ্চলে শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া উঠিল। পরবর্তীকালে মগধ একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। কারণ মগধের লৌহখনি তাহাকে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণে স্বয়ম্ভর করিয়াছিল।

হরপ্পা এবং আর্য সভ্যতার মধ্যে তুলনা। হরপ্পা ও আর্য সভ্যতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক, কিন্তু আর্য সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক ছিল। দ্বিতীয়ত, হরপ্পা সভ্যতার যুগে লোহার ব্যবহার জানা ছিল না, কিন্তু আর্য সভ্যতার যুগে লোহার ব্যবহার জানা ছিল। তৃতীয়ত, হরপ্পা সভ্যতায় অশ্বের সন্ধান পাওয়া কঠিন, আর্য সভ্যতার যুগে অশ্বই ছিল প্রধান বাহন। চতুর্থত, আর্য সভ্যতায় গাভী সম্মানের ভাগী, হরপ্পায় ষাঁড় মর্যাদার অধিকারী। পঞ্চমত, হরপ্পা সভ্যতার সমাজ-ব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। কিন্তু আর্য সভ্যতার সমাজচিত্র পিতৃতান্ত্রিক। মানব সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রথম মাতৃতান্ত্রিক সমাজ দেখা দেয় এবং পরে আসে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। সে কারণে বৈদিক যুগে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য, হরপ্পা সভ্যতায় নারী দেবতাই মুখ্য। দুইটি সভ্যতার মধ্যে তুলনা করিলে এইসব মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পার্থক্যগুলির উপর ভিত্তি করিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে হরপ্পা সভ্যতা আর্য সভ্যতার চেয়ে প্রাচীন এবং হরপ্পা সভ্যতাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মূলভিত্তি রচনা করিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলন : বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম

প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের কারণ। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম একদিন আর্য সমাজে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল। প্রাথমিক যুগের ধর্মের সরলতা প্রত্যেক আর্য সন্তানের জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে বৈদিক ধর্ম তাহার সরলতা হারাইয়া যাগযজ্ঞের ক্রিয়াকলাপে ভীষণ জটিল হইয়া উঠে। ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান ক্রমশঃ আন্তরিক ভক্তি ও আবেদন অপেক্ষা বড় হইয়া দাঁড়ায়। একদিন ছিল যখন যে কোন আর্য-দম্পতিই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্মাচরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্মাচরণে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই যাগ-যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদনের অধিকার ব্রাহ্মণ শ্রেণীর একচেটিয়া হইয়া যায়।

ধর্মীয় কারণ, বৈদিক ধর্মে জটিলতা বৃদ্ধি

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ঋগ্বেদের যুগ হইতেই যাজকদের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল। সাধারণ লোক ইহা লইয়া চিন্তা-ভাবনা করিত না। যাজকেরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেন তাহাই সাধারণ মানুষ বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিত। কিন্তু উপনিষদ-প্রসূত চিন্তাধারা এই অবস্থায় পরিবর্তন আনিল। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যাজক ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার উপনিষদ স্বীকার করিল না। যাজক পুরোহিতদের প্রবর্তিত অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারগুলির উচ্ছেদের জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরা তৎপর হইলেন। যাজক ব্রাহ্মণদের প্রকৃত ধর্মবিরোধী কাজের তাঁহারা সমালোচনা করিতে লাগিলেন। পাঞ্চাল ও বিদেহ রাজ্যের নৃপতিরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংস্কার সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ্য সমাজের জটিলতা বৃদ্ধি পাইল।

স্বাধীন চিন্তার উদয়

এই সময় ভারত উপমহাদেশে নানা সংস্কারধর্মী মত দেখা দেয়। বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের বহুদিন আগে হইতেই ধর্মকে সহজ ও সরল করিবার জন্য নানা ধর্মগোষ্ঠীর উদ্ভব ভারতের নানাস্থালে ঘটিয়াছিল। এগুলিকে সামগ্রিকভাবে অসনাতনী ধর্মমত বলা হয়। এগুলি মূলতঃ ছিল বেদসমূহের কর্তৃত্বে অবিশ্বাসী। শ্রমণ সম্প্রদায় বেদ-ভিত্তিক মতামত এবং সামাজিক নিয়মকানুন মানিতেন না। ব্রাহ্মণগণ যে 'পরম জ্ঞানের' অধিকারী তাহা তাঁহারা মনে করিতেন না। অজীবিকরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী। গোসাল-প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মমতে বিশ্বাসীরা ব্রাহ্মণদের রক্ষণাধীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংস্কারভিত্তিক ধর্ম আন্দোলন শুরু করে। প্রথম হইতেই গোসাল তাঁহায় ধর্ম গৃহী শিষ্যদের মধ্যে ছড়াইয়া দেন। অজীবিক ধর্মের অনুসারীরা অধিকাংশই শূদ্র ও বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর লোক ছিলেন। এই যুগের অপর একজন স্বাধীন ও মুক্ত ধর্মীয় চিন্তার প্রতিভূ ছিলেন অজিত

বেদবিরোধী ধর্মীয় সম্প্রদায়

কেশকম্বল। তিনি মনে করিতেন আত্মা বলিয়া কোন কিছু নাই এবং মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হইয়া যায়। তিনি শূন্যবাদ, বস্তুবাদ প্রভৃতি দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন তৎকালীন অপর একজন সাধু, তাঁহার নাম পুরাণকাশ্যপ।

এই যুগে ব্রাহ্মণদের কোন রাজস্ব দিতে হইত না। গুরু অপরাধ করিলেও তাহারা লঘু শাস্তি পাইত। ব্রাহ্মণ ছিল সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী। ক্ষত্রিয়দের স্থান ছিল ব্রাহ্মণদের পর। যুদ্ধ করা, শাসন করা এবং রাজস্ব সংগ্রহ করা ছিল তাহাদের কাজ। চাষবাস, পশুপালন, ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বৈশ্যদের কাজ। তাহারাই সর্বাপেক্ষা বেশি কর দিত। শূদ্রদের কাজ ছিল উচ্চবর্ণের সেবা করা। অতএব এই বর্ণবিভক্ত সমাজ অশান্ত ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই সমাজে ব্রাহ্মণের একাধিপত্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল।

সামাজিক কারণ

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যাজকগণ পূজা পার্বণে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। সাধারণ লোকের ইহা বোধগম্য ছিল না। ইতিমধ্যে আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব হওয়ায় তাহারা মাতৃভাষায় ধর্মের মর্ম বুঝিতে চাহিল। ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাহার জনপ্রিয়তা হারাইল।

এই যুগে নগরভিত্তিক সভ্যতার উদয় হয়। নগরে বেশীর ভাগ ধনীই ছিলেন বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের অর্থকৌলিন্য থাকিলেও সামাজিক কৌলিন্য ছিল না। তাঁহারা এমন একটি ধর্ম চাহিলেন যাহার মাধ্যমে তাঁহারা সামাজিক মর্যাদা পাইবেন। এ কারণে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম তাঁহাদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাইয়াছিল। এই দুইটি ধর্ম বর্ণাশ্রম প্রথার বিরোধী ছিল।

যাজক ব্রাহ্মণগণ জনসাধারণের ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নানাভাবে অর্থসংগ্রহ করিত। এইভাবে অসংখ্য ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ শ্রেণীই আর্থিক দিক হইতে লাভবান হইত। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংশ হইয়া দাঁড়ায়। ফলে গ্রামের ভাল জমির মালিক হন ব্রাহ্মণরা। যাজক ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রাও সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিল না। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই শাস্ত্রবহির্ভূত বিলাসব্যসনে জীবনযাপন করিত।

অর্থনৈতিক কারণ

এই যুগের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। গরুর দ্বারা চালিত লাঙ্গল দিয়া চাষ-আবাদ হইত। ইহার ফলে পশুপালনের উপরও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলিদান হিসাবে অসংখ্য পশু বলি দেওয়া হইত। ইহাতে কৃষিকার্যের ক্ষতি হইত। স্বভাবতই নূতন অর্থনীতি শক্তিশালী করিবার জন্য পশুহত্যা নিবারণ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনগুলির প্রত্যেকটি ছিল পশুহত্যার বিরুদ্ধে। প্রতিবাদমূলক মতবাদগুলির মধ্যে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মই হইল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জৈনধর্ম

জৈনদের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে চব্বিশজন তীর্থঙ্কর বা মহাপুরুষ এই ধর্ম প্রবর্তন করেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম হইলেন ঋষভ এবং শেষ দুইজন যথাক্রমে পার্শ্বনাথ ও

মহাবীর। ঐতিহাসিকদের মতে পার্শ্বনাথই জৈনধর্মের প্রবর্তক, পূর্ববর্তী তীর্থঙ্করদের কাহিনী কল্পনা মাত্র।

মহাবীর। জৈনধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর বাল্যকালে বর্ধমান নামে পরিচিত ছিলেন। উত্তর বিহারের অন্তর্গত বৈশালীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন জ্ঞাত্রিক বংশীয় ক্ষত্রিয় নায়ক এবং মাতা ত্রিশলা বৈশালীর রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। পার্শ্বনাথ তাঁহাদের পরিবারের উপাস্য ছিলেন।

জীবন

যশোধা নামে এক ক্ষত্রিয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এবং একটি কন্যারও জন্ম হয়। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পার্শ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত সংঘে যোগ দেন এবং গোসাল নামে এক সাধুর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। বার বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা তিনি কৈবল্য বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হন এবং আনন্দ ও বেদনার অতীত অবস্থায় পৌঁছান। জিতেন্দ্রিয় হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শিষ্যরা তাঁহাকে 'জিন্' (বিজয়ী) আখ্যা দেন এবং গুরুদেবের নামকরণ করেন মহাবীর। 'জিন্' হইতে তাঁহার অনুগামীদের নাম হইয়াছে 'জৈন'। প্রায় তিরিশ বৎসর মহাবীর ধর্মপ্রচারকরূপে বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি অঙ্গ, মগধ, বিদেহ প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার নূতন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৪৬৮ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে দক্ষিণ বিহারের পাবা নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

সংসার ত্যাগ ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ



মহাবীর

জৈন ধর্মমত। জৈনধর্মের প্রবর্তক পার্শ্বনাথ তাঁহার শিষ্যদের চতুর্যাম বা চারিটি বিষয়ে সংযম বা সাধনার উপদেশ দেন। এই চতুর্যাম হইতেছে হিংসা করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, চুরি করিবে না এবং কোন কিছুতে আসক্তি রাখিবে না। মহাবীর এই চতুর্যামের সঙ্গে আর একটি নির্দেশ সংযোজন করেন --ইন্দ্রিয়কে জয় করিবে।

জৈনধর্মের শিক্ষা

জৈনগণ মূলতঃ অহিংসা পালন করেন। বৈদিক যাগ-যজ্ঞের আনুষ্ঠানিকতায় তাঁহারা

বিশ্বাস করেন না। জৈনদের মতে মানুষ নিজ কর্মফলের জন্যই পুনর্জন্ম লাভ করে। এই পুনর্জন্মের হাত হইতে মুক্তির উপায় কঠোর ব্রত পালন করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন। জৈনগণ জাতিভেদ প্রথাও মানেন না। জৈনধর্মের মধ্যে আবার ত্রিরত্নের সন্ধান পাওয়া যায়—যথার্থ বিশ্বাস, যথার্থ জ্ঞান এবং যথার্থ কার্য। এইগুলির দ্বারা পার্থিব বন্ধন মোচন সম্ভব। সংসারের বন্ধন হইতে মানবাত্মার মুক্তি ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য, তাই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম ছিল নির্গ্রন্থ বা বন্ধন-মুক্ত। জৈনধর্মে অহিংসা নীতি একটি সুউচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে এবং মুক্তি বা 'সিদ্ধশীলা' লাভের উপায়রূপে স্বীকৃত রহিয়াছে।

মুক্তিলাভের উপায়

জগতে সকল বস্তুর প্রাণ আছে বলিয়া জৈনগণ মনে করেন। এর ফলে নানাপ্রকার প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে বিভেদের সকল সীমানাই দূর হইয়া যায়। তাঁহাদের মতে মানুষ পরজন্মে পাথরে পরিণত হইতে পারে আবার পাথর জন্মান্তরে হইতে পারে মানুষ। কর্মবাদই ঠিক করিয়া দেয় আত্মার আধার কি হইবে। জন্মান্তরে আত্মা প্রাণী, মানুষ দেবতা কিংবা দানবও হইতে পারে।

কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ

জৈনধর্মের মাতৃভূমি বিহার। এই অঞ্চলেই প্রথম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারলাভের পর ইহা ভারতের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বিহার অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইলে বহু জৈনধর্মাবলম্বী ভদ্রবাহু নামে নেতার নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতে মহীশূর অঞ্চলে চলিয়া যান। ইহার ফলে দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের প্রসার ঘটে। জৈনগ্রন্থে রহিয়াছে যে মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত শেষ বয়সে জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়া মহীশূর চলিয়া যান এবং সেখানে দেহত্যাগ করেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সংস্কৃতিতে জৈনধর্মের প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়িয়াছিল।

অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় ধর্মমতের ন্যায় জৈনধর্মেরও মূল লক্ষ্য হইল পরম জ্ঞান অর্জনে ব্যক্তি-মানুষকে বিধি-বিধান নিয়মকানুনের মাধ্যমে তাহার ধর্মীয় আদর্শে পৌঁছাইতে সাহায্য করা। এই আদর্শ হইল 'পরমা মুক্তি' বা সর্ববন্ধনমুক্তি। এই অবস্থায় পৌঁছাইলে ব্যক্তি-মানুষের কামনা-বাসনা বলিয়া কিছু থাকে না। ইহাকে তুরীয় অবস্থা বলে। এই পর্যায়ে পৌঁছাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। কর্মবাদ আর মানুষকে পরিচালিত করিতে পারে না। কঠিন তপশ্চর্যা, সর্বত্যাগ ও আত্ম-পীড়নের মধ্য দিয়া এই লক্ষ্যে পেঁছান যায়। জৈনধর্ম অনুযায়ী একমাত্র সন্ন্যাসীর আত্মাই মুক্তি পাইতে পারে। এই জন্য জৈনধর্মের অনুগামীদের মধ্যে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বেশী ছিল।

জৈনধর্মের লক্ষ্য

তপশ্চর্যার পদ্ধতি বিষয়ে মতান্তর লইয়া জৈনদের মধ্যে গুরুতর অনৈক্য ঘটে। ফলে জৈনরা দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়া যান। ধর্ম বিষয়ে ইঁহাদের মধ্যে কিন্তু মতান্তর ছিল না। তবে ইঁহাদের একদল যাঁহারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিতে শুরু করেন তাঁহাদের বলা হইল শ্বেতাম্বর, আর রক্ষণশীল সম্প্রদায়টিকে বলা হইত দিগম্বর, কারণ তাঁহারা দিক্‌রূপ বস্ত্র পরিতেন।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর

শ্বেতাম্বর শাখার জনশ্রুতি অনুসারে মহাবীরের উপদেশ 'পূর্ব' নামক চৌদ্দখানি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। জৈন আচার্য ভদ্রবাহু সদলবলে দাক্ষিণাত্যে চলিয়া গেলে উত্তর

ভারতের জৈনগণ একটি মহাসভার আহ্বান করিয়া জৈন ধর্মশাস্ত্রকে সুস্পষ্ট রূপ দেন। ইহার ফলে বারটি 'অঙ্গ' নামক গ্রন্থের মধ্যে জৈনধর্মের তত্ত্বগুলি সন্নিবেশিত হয়। পরবর্তীকালে অঙ্গের সহিত উপাঙ্গ, মূলসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থের সংযোগ ঘটান হয়। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় কিন্তু এগুলি স্বীকার করেন না। অতএব অঙ্গ, উপাঙ্গ ও মূলসূত্রগুলি জৈনদের দিগম্বর শাখার ধর্মগ্রন্থ হিসাবে রহিয়া যায়।

জৈন ধর্মশাস্ত্র ঃ পূর্ব, অঙ্গ, উপাঙ্গ ও মূলসূত্র

জৈনধর্মের অবদান। জৈনধর্ম বর্ণাশ্রম প্রথা ও বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম প্রতিবাদ জানায়। এই ধর্ম সাধারণ মানুষের ভাষায় ধর্মপ্রচার ও ধর্মপুস্তক রচনা করিয়াছিল। জৈনধর্মগ্রন্থগুলি অর্ধমাগধী ভাষায় লিখিত। গুজরাটের বল্লভীতে জৈনরা এক বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র গড়িয়া তোলে এবং এখানে জৈন ছাড়াও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল। নালন্দার ন্যায় এই শিক্ষাকেন্দ্রের খ্যাতি ছিল। প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য জৈনদের প্রচেষ্টায় উৎকর্ষ লাভ করে। প্রাকৃত ভাষা হইল বহু ভাষার উৎসস্থল। সৌরসেনি, মাগধী প্রভৃতি ভাষা ইহা হইতে উদ্ভূত। মধ্যযুগে অবশ্য জৈনরা সংস্কৃত ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করিয়াছিল। ফলে এই যুগে সংস্কৃত ভাষাকে তাহারা সমৃদ্ধশালী করে। এমন কি দাক্ষিণাত্যের কানাড়ি ভাষার উৎকর্ষ সাধনে জৈনদের অবদান কম নয়। এই ভাষায় তাঁহারা বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম

গৌতম বুদ্ধ। বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত সেকালের কপিলবস্তু রাজ্যের শাক্য জাতির নায়ক শুদ্ধোদনের পুত্র ছিলেন গৌতম। তাঁহার আসল নাম ছিল সিদ্ধার্থ। লুম্বিনী গ্রামে সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁহার মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। বিমাতা গৌতমী তাঁহাকে লালন-পালন করেন। সেইজন্য তাঁহার আর এক নাম ছিল গৌতম। এই মাতৃহীন শিশু বাল্যকাল হইতেই রাজপ্রাসাদে রাজপুত্র-সুলভ বিলাস ঐশ্বর্যে মানুষ হইলেও সিদ্ধার্থ ঐশ্বর্যের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে গোপা অথবা যশোধরা নামে এক রাজকন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। কালক্রমে তাঁহার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁহার নাম রাহুল। পুত্র অথবা পত্নীর আকর্ষণ কিন্তু সিদ্ধার্থকে সংসারে আবদ্ধ রাখিতে পারিল না। মানুষের জীবনে জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতির দুঃখ তাঁহাকে সংসারের প্রতি ক্রমশঃ অনাসক্ত করিয়া তোলে। অবশেষে জীবাত্মার মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে এই ঘটনাটি 'মহা-নিষ্ক্রমণ' নামে পরিচিত।

গার্হস্থ্য জীবন

গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ সত্যজ্ঞান লাভের আশায় নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন। বহু সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াও বহু কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ও তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। গয়ার নিকট উরুবিল্ব নামে একটি স্থানে কঠোর তপস্যার সময় সুজাতা নামে এক পরম দয়াবতী মহিলার সেবাতেই তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। তখন কৃচ্ছ্রসাধনের পথ ছাড়িয়া তিনি নূতনভাবে বোধগয়ায় এক অশ্বত্থ গাছের নীচে উপাসনায়

নিমগ্ন হইলেন। এই সময়ে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। অশ্বত্থের মূলে বসিয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ওই গাছের নাম হয় বোধিদ্রুম এবং স্থানটি বোধগয়া নামে পরিচিত হয়। দিব্যজ্ঞান লাভের পর গৌতম অথবা সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধ' নামে পরিচিত হন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতই 'বৌদ্ধধর্ম' নামে পরিচিত।

দিব্যজ্ঞান লাভ



গৌতম বুদ্ধ

ইহার পর তিনি ধর্মপ্রচার করিতে শুরু করেল এবং বারাণসীর নিকট ঋষিপত্তন বা মৃগদাভ নামক বনে (বর্তমান নাম সারনাথ) তিনি তাঁহার ধর্মমত সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে এই ঘটনাকে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কৌণ্ডিন্য, ভদ্রিয়, বপ্র, মহানাম নামে শিষ্যদের নিকট তিনি সারনাথে তাঁহার ধর্মের মূলতত্ত্বগুলি সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন এবং প্রতিদিন ২০ হইতে ৩০ কিলোমিটার পথ হাঁটিতে পারিতেন। এক বর্ষাকাল ছাড়া তিনি সব ঋতুতেই তাঁহার এই ধর্মপ্রচারযাত্রা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরিয়া তিনি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এই সময় ধনী-নির্ধন অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অনাথপিণ্ডদ ছিলেন মহাধনী। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন ধনী, আনন্দ এবং উপালী ছিলেন সাধারণ নাগরিক। ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগরে তিনি দেহরক্ষা করেন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৬ বা ৪৮৩ অব্দে তাঁহার তিরোধান হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর ঘটনাটি 'মহাপরিনির্বাণ' বলিয়া পরিচিত।

ধর্মচক্র প্রবর্তন ও ধর্মপ্রচার

বুদ্ধের ধর্মমত। এ জগতে মানুষের বেদনা ও দুঃখের অবসান ঘটাইয়া মানবকল্যাণের জন্য মানুষের মুক্তির পথের সন্ধান লাভ করাই ছিল গৌতম বুদ্ধের লক্ষ্য। তিনি নিজেকে দেবতার আসনে বসাইয়া আপনাকে ভগবানরূপে প্রচার করেন নাই। তিনি ছিলেন মানবমুক্তির পথপ্রদর্শক—ত্রাণকর্তা নন, আচার্য।

সাধনা ও গভীর তপস্যার ফলে বুদ্ধদেব যে চারিটি সত্যের সন্ধান পান, তাহাকে চারিটি 'আর্যসত্য' বলা হয়। (ক) জগতে দুঃখ রহিয়াছে। জানিতে হইবে দুঃখ কি।

যেমন জরা, রোগ, মৃত্যু। (খ) এই দুঃখের অবশ্যই কারণ আছে। জানিতে হইবে যে কেন মানুষ দুঃখ পায়। মানুষ দুঃখ পায় বিভিন্ন জিনিস চায় বলিয়া, না পাইলেই দুঃখ। (গ) তৃতীয় সত্য হইল দুঃখ হইতে বাঁচিবার জ্ঞান। চাওয়াকে বাদ দিলে, আকাঙ্ক্ষা নষ্ট করিলে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। (ঘ) চতুর্থ সত্য হইল বাঁচিবার উপায় জ্ঞান বা সত্য পথ জানা।

চারিটি আর্যসত্য

বুদ্ধদেবের মতে এই জগতের সবকিছুই দুঃখময়। জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক সবই দুঃখপূর্ণ। যাহাকে আমরা আপাত সুখ বলিয়া মনে করি তাহার মধ্যেও দুঃখ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। প্রত্যেকটি বস্তুর মত এই জগৎ ও জীবন অনিত্য এবং যাহা অনিত্য তাহাই দুঃখময়। বুদ্ধদেবের মতে সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি দুঃখের কারণও আছে। কারণ ছাড়া কোন কার্যের উৎপত্তি সম্ভব নয়। সংসারে জন্মগ্রহণ না করিলে মানুষকে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ভোগ করিতে হইত না। পুনরায় জন্মলাভের বাসনা হইল জন্মের কারণ। এই বাসনা হইল পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তি। আর আসক্তির কারণ হইল তৃষ্ণা। ইহার জন্যই মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করে। অতএব যে কারণ হইতে দুঃখের উৎপত্তি তাহার অবলুপ্তি ঘটাইলে দুঃখের অবসান ঘটিবেই। সুতরাং তাঁহার মতে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। দুঃখের নিবৃত্তিকে বৌদ্ধগণ 'নির্বাণ' বলিয়া থাকেন। বিষয়াসক্তি বর্জন করিয়া এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিয়া সর্বদা সত্যের ধ্যান করিলে এই জীবনে নিজের চেষ্টায় নির্বাণ লাভ সম্ভবপর। যে পথ অনুসরণ করিলে দুঃখ হইতে চিরমুক্তি সম্ভবপর তাহাকে দুঃখনিরোধ বা নিবৃত্তি মার্গ বলা হয়। এই পথের আটটি অঙ্গ বা স্তর আছে। সেইজন্য এই পথকে বলা হয় 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'। একদিকে অত্যধিক শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন এবং অপরদিকে অসংযত ইন্দ্রিয়সুখ—এই দুই চরম পথের মধ্যবর্তী পথ (মধ্যমপন্থা) বুদ্ধদেব তাঁহার অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে নির্দেশ করিয়াছেন। এই আটটি পথ হইল ঃ সৎবাক্য, সৎ ব্যবহার, সৎ চিন্তা, সৎ জীবন, সৎ শ্রম, সৎস্মৃতি, সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সমাধি। মিথ্যা কথা না বলা, পরনিন্দা না করা, কাহাকেও কটু বাক্য না বলা হইল সৎবাক্য। ন্যায়সঙ্গত আচরণ, চুরি না করা, কোন জীবকে হিংসা না করা—এইসব সৎ ব্যবহার। ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া সৎ জীবন যাপন করা, সাধু উপায়ে জীবিকা অর্জন করা হইতেছে সৎ শ্রম। মন হইতে সমস্ত রকম অশুভ অসৎ চিন্তা দূর করা, সর্বদা সৎ চিন্তা দিয়া মনকে পূর্ণ করিয়া রাখা হইল সৎ চিন্তা। বুদ্ধদেব দুঃখ সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন সেগুলি যাহারা বুঝিতে পারে এবং বিশ্বাস করে একমাত্র তাহারাই সম্যক্ দৃষ্টি বা সত্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে। সম্যক্ সংকল্প হইল সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা। এইসব উপদেশ সর্বদা মনে রাখা এবং পালন করা হইল সম্যক্ স্মৃতি। এইভাবে দেহ-মনকে বিশুদ্ধ, সংহত ও শান্ত করিয়া ধীর ও স্থিরভাবে সাধন ও ধ্যান করাকেই সম্যক্ সমাধি বলা হয়।

নির্বাণ

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

অষ্টাঙ্গিক মার্গ ছাড়াও বুদ্ধদেব মানুষকে কতকগুলি সাধারণ নীতি অনুসরণের

উপদেশ দিয়াছেন—হিংসা না করা, চুরি না করা, মিথ্যা কথা না বলা, জীবহত্যা না করা এবং লোভ ত্যাগ করা। এগুলিকে পঞ্চশীল বলা হয়। এইসব সহজ সরল নীতি উপদেশের দ্বারা নৈতিক চরিত্র গঠন করিয়া ক্ষমা ও মৈত্রীর ভিত্তিতে মানবজীবন গড়িয়া তুলিতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণদের যাগযজ্ঞ, দেবদেবী, আচার-বিচার, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা কিছুই মানিতেন না। মানুষ কাজের দ্বারা বড় হয়, জন্ম দিয়া বা দেবদেবীর পূজা করিয়া বড় হয় না। ঈশ্বর আছেন কি নাই সে কথা বড় নয়, মানুষই হইল বড়। তাহাকে ভালবাসিতে হইবে।

পঞ্চশীল

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যাহাতে সকলে একত্র হইয়া ধর্মালোচনা করিতে পারেন সেজন্য বুদ্ধদেব তাঁহাদের লইয়া বৌদ্ধসংঘ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। প্রথমে মেয়েরা সংঘে যোগ দিতে পারিত না। পরে তাহাদের লইয়া একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ সংঘ গঠিত হয়। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ—এই তিনটি হইল বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন। বৌদ্ধদের মূলমন্ত্র হইল—

বৌদ্ধসংঘ

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। সংঘং শরণং গচ্ছামি। ধর্মং শরণং গচ্ছামি।"

বুদ্ধদেব তাঁহার বাণী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে বুদ্ধদেবের দেহাবসানের পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতি বা মহাসভার অধিবেশন বসিয়াছিল। তাহাতে ৫০০ জন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে মহাকাশ্যপ বুদ্ধবচনগুলি সংগ্রহ করিয়া সূত্রপিটক, আনন্দ তাহার ব্যাখ্যা করিয়া অভিধর্মপিটক, উপালী নীতিগুলি সংগ্রহ করিয়া বিনয়পিটক সংকলন করেন। ঐগুলিকে একত্রে 'ত্রিপিটক' বলা হয়। সূত্রপিটকে ধর্মসম্বন্ধীয় বিবিধ আলোচনা, বিনয়পিটকে ভিক্ষুদের আচরণবিধি এবং অভিধর্মপিটকে দার্শনিক তত্ত্ব রহিয়াছে। এইগুলি সবই পালি ভাষায় লিখিত। পরে বুদ্ধদেবের পূর্বতন জীবনের কাহিনীর নানা গল্প লইয়া 'জাতক' গ্রন্থগুলি রচিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ : ত্রিপিটক

বৌদ্ধধর্মের প্রসার। বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির মতানুসারে বুদ্ধের জীবনকালেই বৌদ্ধধর্ম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। বুদ্ধদেব নিজে প্রায় ৪০ বৎসর ধরিয়া পূর্ব ভারতের নানাস্থান পর্যটন করিয়া ধর্মপ্রচার করেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার জীবিতকালেই বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মগধরাজ বিম্বিসার, অজাতশত্রু, কোশলরাজ প্রসেনজিত তাঁহার ধর্মমত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করিতেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বৌদ্ধসংঘ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণিগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্মের প্রতি জনসাধারণ আকৃষ্ট হইতে থাকে। তবে সম্রাট অশোকের রাজত্বকাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধর্ম সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। কুষাণরাজ কণিষ্কও বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সাহায্য করেন। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম এক বিশ্বধর্মে পরিণত হয়।

বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কারণ : রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা

বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র রাজানুগ্রহের ফলেই প্রসারলাভ করে নাই। ইহার প্রসারের

অন্যতম কারণ হইল এই ধর্মমতের সহজ সরল রূপ। অতি সাধারণ লোকের পক্ষে বুদ্ধদেবের বাণী বুঝিতে অসুবিধা হয় না। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ধর্মপ্রচারকদের এ কারণে কোনরূপ জটিল আলোচনার মধ্যে যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। যাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের জটিলতায় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহারা সহজ সরল বৌদ্ধধর্মের দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মতত্ত্বের আলোচনা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া জনসাধারণের পক্ষে বোধগম্য ছিল না। বুদ্ধদেব জনসাধারণের ভাষায় ধর্মতত্ত্ব আলোচনার প্রথা প্রবর্তন করেন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে এই ধর্ম-প্রচার সহজে হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করে না। জাতি-নির্বিশেষে সকলেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে পারে। এ কারণে বৈশ্য-শূদ্রগণ এই ধর্মমতে অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। জাতিভেদ প্রথা প্রত্যাখ্যান করিয়া সকল মানুষের সমানাধিকার সমর্থন করিয়া বৌদ্ধধর্ম সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ধর্মের সার্বজনীন রূপ

সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রসার

বৌদ্ধধর্মের প্রসারের অন্যতম কারণ হইল বুদ্ধদেব তাঁহার বাণীতে পুরাতন ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে একেবারে বাদ দেন নাই। বরং তিনি প্রচলিত রীতিনীতির নূতন ব্যাখ্যা করেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীর তিনি নিন্দা করেন নাই। তৎকালীন পূজা-পার্বণের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম শেষের দিকে মানুষকে ভয়ঙ্কর অদৃষ্টবাদী এবং ভগবানের উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছিল। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম সেই মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করিয়া তুলিয়াছিল। জাতিভেদ প্রথাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সকল মানুষের সমানাধিকার দেওয়ায় বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় হইয়া ওঠে। কথিত আছে, বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, সমুদ্রের জলের স্বাদ যেমন লবণাক্ত, তেমনি তাঁর ধর্মশিক্ষায় আছে মুক্তির স্বাদ।

স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল মানুষ

বৌদ্ধভিক্ষুগণ নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধর্ম প্রচার করিতেন। কালক্রমে বিভিন্ন স্থানে বিহারও স্থাপিত হয়। বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পায়। সমাজে সকল শ্রেণী হইতে ভিক্ষু হইবার সুযোগ থাকায় শিক্ষা সমাজের সব শ্রেণীতে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতীয় সমাজে সেই সময় নারীদের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করায় সমাজে নারীর অধিকার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসে। বৌদ্ধধর্মে নারী-পুরুষের অধিকার প্রায় সমানভাবে স্বীকার করা হয় এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের জন্য পৃথক মঠ স্থাপিত হয়। স্ত্রী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন।

শিক্ষার প্রসার ও স্ত্রী-স্বাধীনতা

ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণার আদর্শে উজ্জীবিত বৌদ্ধধর্ম মানুষকে শান্তিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়াছিল। মানুষের সমাজে হিংসা ও হানাহানির পরিবর্তে মানবিক প্রেম ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিল।

বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। বৈদিক হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের আবির্ভাব। এই কারণেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মধ্যে কতকগুলি ক্ষেত্রে অনেক সামঞ্জস্য আছে এবং অন্যদিকে হিন্দুধর্মের সঙ্গে এই দুই ধর্মেরই সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে পার্থক্য

বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ভগবান বিশ্বাস করে না, বেদ ভগবানের সৃষ্টি—এই কথাতেও বিশ্বাস করে না। হিন্দুধর্ম তাহা করে। হিন্দুগণ জাতিভেদ প্রথা মানেন, কিন্তু বৌদ্ধ অথবা জৈনরা জাতিভেদ প্রথা মানেন না। হিন্দুদের মত বৌদ্ধ এবং জৈনরা ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না। জৈন এবং বৌদ্ধগণ অহিংসা নীতিকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকেন। হিন্দুধর্মে কোন সংঘের প্রয়োজনীয়তা বোধ করা হয় নাই, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ইহা একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

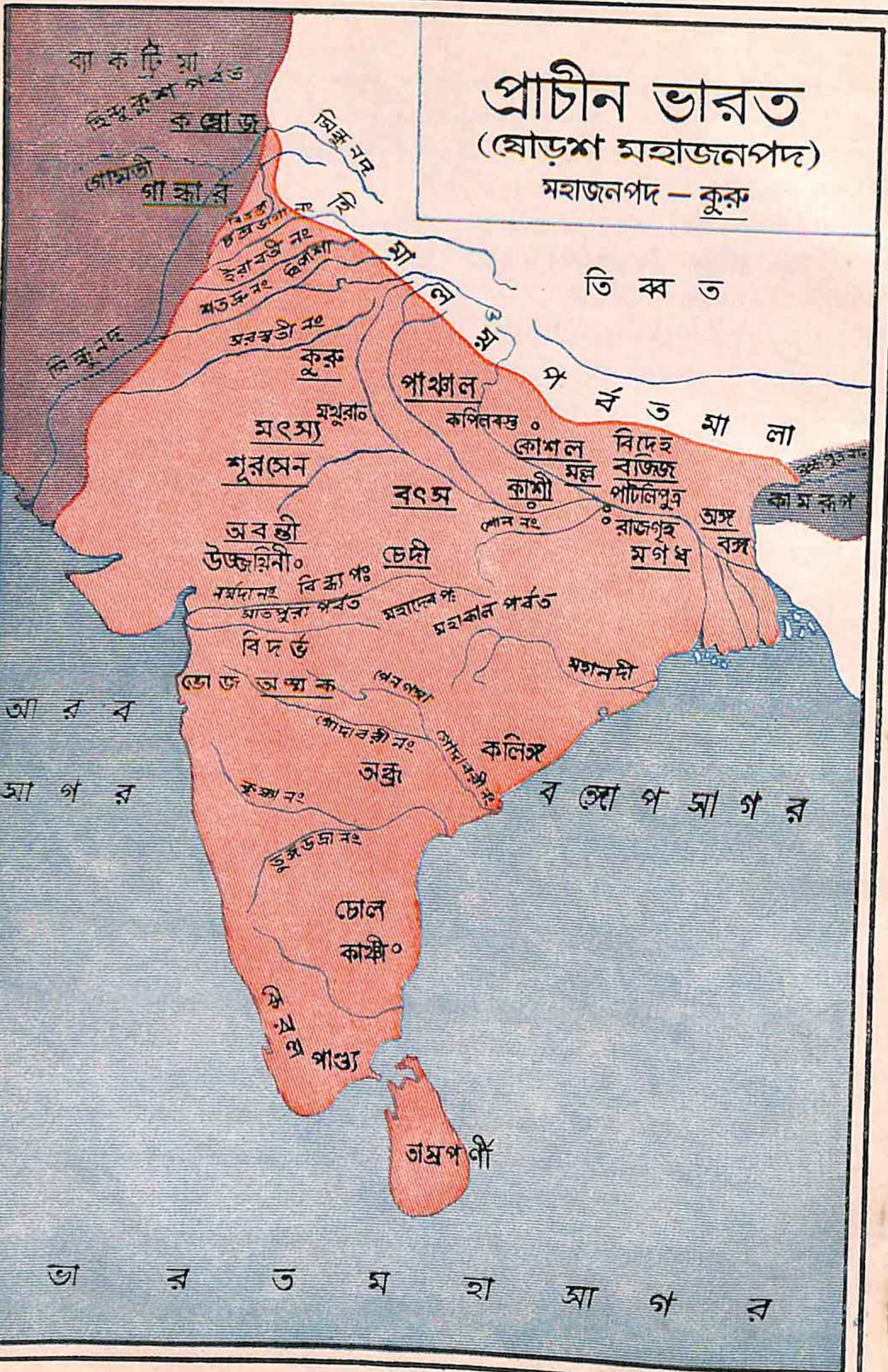
সাদৃশ্য

হিন্দুধর্মের সঙ্গে এই দুই ধর্মের কয়েকটি জায়গায় সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ এবং জৈনরা হিন্দুদের মতই জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাস করে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মত হিন্দুধর্মেও অহিংসার স্থান আছে। হিন্দুগণ বুদ্ধদেব ও মহাবীরকে অবতার বলিয়া মনে করেন। বিশেষতঃ, জৈনধর্ম হিন্দুধর্মের অনেক দেবদেবীকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মধ্যে উভয় ধর্মই অহিংসায় বিশ্বাসী, উভয়েই ভগবানে অবিশ্বাসী এবং বেদ ভগবানের সৃষ্টি তাহা বিশ্বাস করে না। এই উভয় ধর্মই কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে এবং উভয়ের চরম লক্ষ্য হইল মোক্ষ বা নির্বাণ।

এই সমস্ত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। জৈনগণ কৃচ্ছ্রসাধনের উপর জোর দেন। কাজেই সন্ন্যাসী ছাড়া গৃহীর পক্ষে এই ধর্মাচরণ সম্ভব নহে। কিন্তু বৌদ্ধগণ কৃচ্ছ্রতার পথ ছাড়িয়া মধ্যপন্থা গ্রহণ করায় এই ধর্মকে অনেক বেশী বাস্তববাদী এবং সাধারণের পক্ষে আচরণীয়। বৌদ্ধগণ অহিংসা নীতিতে বিশ্বাসী হইলেও জৈনদের মত ধাতু, পাথর প্রভৃতির মধ্যে প্রাণ আছে তাহা স্বীকার করেন না। জৈনধর্মে 'সংঘ' নাই, কিন্তু 'সংঘ' বৌদ্ধধর্মে অপরিহার্য।


প্রাচীন ভারত
(ষোড়শ মহাজনপদ)
মহাজনপদ — কুরু
ব্যাকট্রিয়া
কম্বোজ
গান্ধার
গোমতী
সিন্ধু নদ
হিমালয় পর্বতমালা
তিব্বত
শতদ্রু নদ
সরস্বতী নদ
কুরু
পাঞ্চাল
মথুরা
মৎস্য
শূরসেন
কপিলবস্তু
কোশল
বিদেহ
বজ্জি
মল্ল
কাশী
পাটলিপুত্র
রাজগৃহ
মগধ
অঙ্গ
বঙ্গ
কামরূপ
বৎস
শোন নদ
অবন্তী
উজ্জয়িনী
চেদী
নর্মদা নদ
বিন্ধ্য পর্বত
সাতপুরা পর্বত
মহাকাল পর্বত
বিদর্ভ
ভোজ
অশ্মক
মহানদী
গোদাবরী নদ
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
কৃষ্ণা নদ
তুঙ্গভদ্রা নদ
চোল
কাঞ্চী
পাণ্ড্য
তাম্রপর্ণী
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতে অখণ্ড রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের যুগ

ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য যদিও সাম্প্রতিক ঘটনা তবুও এই ঐক্য প্রতিষ্ঠার আদর্শ বহু প্রাচীন। আসমুদ্র হিমাচলের স্বপ্ন প্রাচীন ভারতের বহু রাজা দেখিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক যুগে মগধের অভ্যুত্থানের সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকায় আধিপত্য স্থাপনের দ্বারা রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে আর্যাবর্তে যখন বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম ধর্ম আন্দোলনের অবস্থা সৃষ্টি হইতেছিল সেই সময়ে আর্যাবর্তে যে রাজনৈতিক যুগ চলিতেছিল তাহাকে ষোড়শ মহাজনপদের যুগ বলা হয়।

বৌদ্ধ 'অঙ্গুত্তর নিকায়' এবং জৈন 'ভগবতী সূত্ত' গ্রন্থ দুইটি আমাদের ষোড়শ মহাজনপদ-এর ইতিহাস জানিতে সাহায্য করে। এই ষোড়শ মহাজনপদগুলি হইতেছে যথাক্রমে

ষোড়শ মহাজনপদ

(১) কাশী, (২) কোশল, (৩) অঙ্গ, (৪) মগধ, (৫) বজ্জি বা বৃজি, (৬) মল্ল বা মালব, (৭) চেদী, (৮) বৎস, (৯) কুরু, (১০) পাঞ্চাল, (১১) মৎস্য, (১২) শূরসেন, (১৩) অস্মক, (১৪) অবন্তী, (১৫) গান্ধার এবং (১৬) কম্বোজ। অবশ্য এইগুলি ছাড়াও ছোট ছোট অনেক রাজ্য ছিল। ষোল সংখ্যাটি দিয়া কেবল তাহাদের মধ্যে বৃহত্তম ও শক্তিশালী রাজ্যগুলির কথাই বলা হইয়াছে।

ষোড়শ মহাজনপদের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়াই থাকিত। এই যুদ্ধবিগ্রহের পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত বড় রাজ্যগুলির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই ছিল

মগধের প্রাধান্য

প্রধান। কিছুদিনের মধ্যেই ষোড়শ মহাজনপদের দুর্বল রাষ্ট্রগুলি শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে। ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে দেখা যায় আর্যাবর্তে মাত্র চারিটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। এই চারিটি রাষ্ট্র হইতেছে মগধ, কোশল, অবন্তী ও বৎস। এই রাষ্ট্রগুলি সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত অন্য তিনটি রাষ্ট্রের ধ্বংসসাধন করিয়া মগধ রাজ্য আর্যাবর্তে ক্ষমতা অধিকার করে।

মগধের নেতৃত্বে সাম্রাজ্য স্থাপন

আধুনিক বিহার রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের পাটনা এবং গয়া জিলা দুইটি লইয়া প্রাচীনকালে মগধ রাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীন মগধ রাজ্য এমন এক অত্যন্ত সুবিধাজনক ভৌগোলিক স্থান দখল করিয়াছিল যাহার ফলে তাহার সামরিক ও বাণিজ্যিক বিকাশের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর।

মগধের সম্প্রসারণ। মগধের হর্যঙ্ক রাজবংশের রাজা বিম্বিসারের শাসনকালেই মগধের উন্নতি শুরু হয়। বিম্বিসার (৫৪৬/৪৩—৪৯৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) খুবই উচ্চাভিলাষী

বিম্বিসার

নৃপতি ছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হন। তিনি অঙ্গরাজ্যের রাজাকে পরাজিত করিয়া এই রাজ্যটি মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি মদ্র, কোশল ও বৈশালী রাজ্যের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া উত্তর ও পশ্চিমে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। কোশল রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি কাশী রাজ্যে একাংশ লাভ করেন। তিনি রাজগৃহে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন।

বিম্বিসার ভারতের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য নরপতি। তিনি মগধে একটি দক্ষ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আমলে মগধ অতিশয় সম্পন্ন ও পরাক্রমশালী হইয়া ওঠে। তাঁহার রাজত্বে গৌতম বুদ্ধ ও জৈন ধর্মগুরু মহাবীর উভয়েই মগধে নিজ নিজ ধর্মমত প্রচার করেন। বিম্বিসার বুদ্ধের অনুরাগী ছিলেন।

অজাতশত্রু

বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু (৪৯৩—৪৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিংবদন্তী মতে তিনি পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যজয়ের দ্বারা মগধের গৌরব বৃদ্ধি করেন। প্রথমেই তিনি কোশলরাজ প্রসেনজিৎ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং শেষ পর্যন্ত মগধ বিজয়ী হয়। কাশী অঞ্চলটি মগধ ফিরিয়া পায়। অজাতশত্রুর জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা সাধারণতন্ত্র বৃজি বা বজ্জি রাজ্যের ধ্বংসসাধন। ইহার ফলে পূর্ব ভারতে মগধ শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। প্রথম জীবনে অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বৌদ্ধ ও জৈন উভয় ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালেই মহাবীর ও বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন। প্রথম বৌদ্ধসংগীতি বা ধর্মমহাসম্মেলন তাঁহার শাসনকালেই অনুষ্ঠিত হয়। তিনি গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলিপুত্র নগরী স্থাপন করেন।

মগধের রাষ্ট্রশক্তিকে আরও দৃঢ়মূল করিয়া তুলিবার জন্য অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ন (৪৬১-৪৪৫ খ্রীষ্টপূর্ব) রাজ্যের রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেন।

শিশুনাগ বংশ

হর্যঙ্ক বংশের শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া কাশীর শাসক শিশুনাগ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। শিশুনাগ অবন্তী রাজ্য জয় করেন এবং তাঁহার শাসনকালেই কোশলের বাকী অংশ এবং বৎস রাজ্য মগধের অধিকারে আসে। শিশুনাগের পুত্র কালাশোক বা কাকবর্ণ বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধসংগীতির উদ্যোক্তা ছিলেন। শিশুনাগ যেভাবে মগধের সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন ঠিক সেইভাবেই শিশুনাগ বংশীয় শেষ রাজা নন্দীবর্মণকে হত্যা করিয়া মহাপদ্ম নন্দ মগধের সিংহাসন দখল করিয়া লন।

নন্দবংশ

জৈন ও বৌদ্ধ উভয় শাস্ত্রেই উল্লেখ আছে যে নন্দ রাজারা হীনবংশীয় ছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকেরাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। নন্দ রাজবংশের পর পর নয়জন রাজা মগধ শাসন করেন। মহাপদ্ম নন্দ ছিলেন একজন যোদ্ধা রাজা ; তিনি ইক্ষ্বাকু, পাঞ্চাল, হৈহয়, কলিঙ্গ, অস্মক, কুরু, শূরসেন, বীতিহোত্র,

প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি এক বিশাল সামরিক বাহিনী গঠন করেন। ভারতীয় কবি, দার্শনিক এবং আঞ্চলিক রাজারা যে ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখিতেন তাহা বাস্তবে রূপদান করেন মহাপদ্ম নন্দ।

নন্দ বংশের পতন ঃ মৌর্য বংশের উত্থান

নন্দ বংশের সর্বশেষ রাজার নাম ধননন্দ। তাঁহারই সময় আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। ধননন্দ ছিলেন ধনলিপ্সু এবং অত্যাচারী, ফলে দেশে তাঁহার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য আনুমানিক ৩২১ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন করেন এবং মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মৌর্য সাম্রাজ্য

ভারতের ইতিহাসে মৌর্য যুগের গুরুত্ব

খ্রীস্টপূর্ব ৩২১ হইতে খ্রীস্টপূর্ব ১৮৭ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মৌর্য সম্রাটদের রাজত্বের যুগ। এই যুগকে ভারতের ইতিহাসে বিশেষ গৌরবময় যুগ বলিয়া মনে করা হয়, কারণ ইতিহাসে এই যুগের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত খণ্ড খণ্ড ভারতের অনৈক্যের অবসান করিয়া মৌর্য সম্রাটগণ এই দেশে একটি অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতের জাতীয় ঐক্যের ইহা এক অতি প্রাচীন সূচনা। আসমুদ্র হিমাচলের স্বপ্ন মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকই বাস্তবে রূপায়িত করেন। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্য বিশাল হইয়া পড়ায় পুরাতন শাসনব্যবস্থার স্থলে সুসংগঠিত ও রীতিবদ্ধ শাসনব্যবস্থা মৌর্য-সম্রাটগণ প্রবর্তিত করেন।

বংশ পরিচয়

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশপরিচয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই। ইহার কারণ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থগুলি একমত নহে। গ্রীক ঐতিহাসিক জাস্টিনের মতে, চন্দ্রগুপ্ত নীচ-বংশোদ্ভূত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তকে হিমালয় অঞ্চলের 'মোরিয়া' নামে এক ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর দলপতির পুত্র বলা হইয়াছে। মনে করা হয় এই 'মোরিয়া' নাম হইতেই মৌর্য নামের উৎপত্তি। অপরদিকে হিন্দু কিংবদন্তীতে চন্দ্রগুপ্তকে শূদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা

তাঁহার মাতা অথবা পিতামহী 'মুরা' শেষ নন্দরাজার দাসী ছিলেন। প্রচলিত মত অনুসারে চাণক্যের সঙ্গে মিলিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন দখলের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকরা চন্দ্রগুপ্ত ও নন্দ রাজবংশের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ দিয়াছেন।

পাঞ্জাব ও মগধ অধিকার

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের নন্দ রাজবংশকে উৎপাটিত করিবার প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়। প্রথমে তিনি পাঞ্জাবে গ্রীক অধিকার ধ্বংস করিয়া পাঞ্জাব দখল করেন। তাহার পর মগধের সিংহাসন দখল করিবার জন্য এক সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন। নন্দরাজের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তকে কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। আনুমানিক ৩২৭ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে তিনি মগধের সিংহাসন অধিকার করেন এবং ঐ বৎসরেই তাঁহার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত

হয়। ইহার পর তিনি মালব ও সৌরাষ্ট্র অধিকার করেন। চন্দ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতেও অভিযান চালান এবং সম্ভবতঃ মহীশূর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করেন।

চন্দ্রগুপ্তকে গ্রীক সেনাপতি সেলিউকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ভারতে গ্রীক অধিকার পুনরুদ্ধারের আশায় সেলুকাস ৩০৫ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে সৈন্যবাহিনী লইয়া সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন। সেলিউকাস ও চন্দ্রগুপ্তের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ সেকালের কোন লেখায় পাওয়া যায় নাই। কেবলমাত্র সন্ধির কথাই গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখায় পাওয়া যায়। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে সেলিউকাস চন্দ্রগুপ্তকে কাবুল, হিরাট, কান্দাহার ও বেলুচিস্তান প্রদান করেন। সেলিউকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে এক দূতও প্রেরণ করেন। অপরপক্ষে চন্দ্রগুপ্ত সেলিউকাসকে একটি হস্তীবাহিনী উপহার দেন। এইভাবে রাজ্য বিজয়ের মধ্য দিয়া চন্দ্রগুপ্ত উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী (অনেকে মহীশূর পর্যন্ত মনে করেন) এবং পূর্বে বিহার হইতে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে মৌর্য আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

সেলিউকাসের সহিত যুদ্ধ ও মিত্রতা

সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২৯৮ অব্দের মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়। জৈন গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে শেষ বয়সে জৈনধর্মে গ্রহণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মহীশূরের শ্রাবণবেলগোলায় অনশনে মৃত্যুবরণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন সুদক্ষ যোদ্ধা, শাসক এবং প্রজাহিতৈষী রাজা। সামান্য অবস্থা হইতে উঠিয়া তিনি যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হন এবং অত্যাচারী নন্দরাজকে পরাজিত করিয়া প্রজাহিতৈষী শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। প্রায় সমগ্র ভারতকে একই সাম্রাজ্যের মধ্যে আনিয়া এবং একই শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তিনি সর্বভারতীয় ঐক্যকে বাস্তব রূপ দেন। তিনি যে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা প্রাচীন ভারতের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি বলিয়া মনে করা হয়। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁহাকে ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসাবে গণ্য করিয়াছেন।

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

মৌর্য শাসনব্যবস্থা। মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও অশোকের শিলালিপিগুলি হইতে আমরা মৌর্যযুগের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে জানিতে পারি। সেলুকাসের দূত মেগাস্থিনিস কয়েক বৎসর পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' নামক গ্রন্থটির রচনার ঠিক তারিখ এখনো বলা সম্ভব নয়। তবে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, 'অর্থশাস্ত্রে'র প্রণেতা এবং চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি। এই গ্রন্থ পাঠে আমরা মৌর্য শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য জানিতে পারি।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

মৌর্য শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুইভাগে বিভক্ত ছিল। অশোকের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মৌর্য সাম্রাজ্য তৎকালে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল—

উত্তরাপথ, অবন্তী রাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, কলিঙ্গ ও প্রাচ্য। চন্দ্রগুপ্তের সময় অন্ততপক্ষে তিনটি প্রদেশ ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সাধারণতঃ রাজপরিবার হইতে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের বলা হইত 'কুমারামাত্য'। রাজধানীর নিকটবর্তী প্রদেশের শাসনভার সম্রাট স্বহস্তে গ্রহণ করিতেন।

কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা

কৌটিল্য রাজার কর্তব্য ও তাঁহার ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, প্রজাদের সুখ রাজার সুখ, প্রজাদের মঙ্গল, রাজার মঙ্গল। রাজা দেবতা নহেন, তাঁহার ব্যক্তিগত সুখ বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। শাস্ত্রসম্মত বিধান ও প্রাচীন নিয়মকানুন অনুযায়ী রাজা রাজকর্ম পরিচালনা করিবেন। মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজা দিনের অধিকাংশ সময়েই রাজকার্যে লিপ্ত থাকিতেন।

আইন প্রণয়ন, কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা রাজার আদেশ অনুযায়ী হইত। রাজা সচিব বা অমাত্য উপাধিধারী মন্ত্রীদের সাহায্যে রাজ্য চালাইতেন। মন্ত্রীপরিষদ নামে রাজার এক পরামর্শ-সভা ছিল।

বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকর্মচারী

শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য রাজা 'অধ্যক্ষ' নামধারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। তাঁহারা শাসনব্যবস্থার এক একটি বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করিতেন। তাঁহারাই ছিলেন মৌর্য শাসনব্যবস্থার মেরুদণ্ড-স্বরূপ। প্রত্যেক বিভাগে বহুসংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হইত। ইহাদের মধ্যে রাজুক, যুক্ত, মহামাত্র ও প্রাদেশিক নামধারী কর্মচারীরা বিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন।

বিচার ব্যবস্থা

বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে দুই ধরনের আদালত ছিল—দেওয়ানী মামলা বিষয়ক আদালত (ধর্মীয় ব্যবহার) এবং ফৌজদারী মামলা বিষয়ক আদালত (কণ্টক শোধন)। গ্রামের ছোট ছোট মামলাগুলি নিষ্পত্তির ভার গ্রামিক-এর উপর ন্যস্ত ছিল। অর্থশাস্ত্রে ১৭ প্রকারের দণ্ডবিধির নির্দেশ আছে।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

মৌর্য যুগে প্রত্যেক প্রদেশ কয়েকটি 'বিষয়' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিষয় আবার কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামের শাসনভার 'গ্রামিক' বা গোপ নামক কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। তিনি গ্রামবৃদ্ধদের সহিত পরামর্শ করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। জেলার শাসক ছিলেন 'স্থানিক'। মেগাস্থিনিস 'অগোরানোমি' নামক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা পল্লী অঞ্চলে নিযুক্ত থাকিতেন। জমির পরিমাপ করা এবং সেচের জল সহজপ্রাপ্য করিবার দায়িত্ব তাঁহাদের উপর ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপর নজর রাখিবার এবং দেশের খুঁটিনাটি খবর পাইবার জন্য কৌটিল্য রাজাকে গুপ্তচর নিয়োগের নির্দেশ দিয়াছেন।

মৌর্যযুগে রাজস্বের হার বেশ বেশি ছিল। সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ ছিল রাজকর। 'সমাহার্ত' নামক একশ্রেণীর রাজকর্মচারীর দায়িত্ব ছিল করের পরিমাণ

নির্ধারণ করা। কোষাধ্যক্ষকে বলা হইত 'সন্নিধাতা'। অর্থ বা দ্রব্যের দ্বারা কর দেওয়া যাইত। মৌর্যযুগে মুদ্রাও প্রচলিত ছিল।

পাটলিপুত্রের শাসন-ব্যবস্থা

মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে রাজধানী পাটলিপুত্রের শাসনব্যবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। রাজধানী শাসনের দায়িত্ব ছিল ৩০ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি নগর-পরিষদের উপর। ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সমিতির উপর এক-একটি বিশেষ কার্যের দায়িত্ব দেওয়া থাকিত।

সামরিক বিভাগ

মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবাহিনী পদাতিক, হস্তীবিভাগ, অশ্বারোহী, রথ, রণতরী এবং সরবরাহকারী—এই ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব এক পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। এই পরিষদের সভ্য সংখ্যা ছিল ত্রিশ। পাঁচজন সদস্য লইয়া ছয়টি সমিতিতে ইহা বিভক্ত ছিল। এক-একটি সমিতির উপর এক-একটি দায়িত্ব ছিল।

মৌর্য শাসনব্যবস্থা খুবই সুপরিকল্পিত ছিল। রাজার ক্ষমতা সীমাহীন ছিল না। এই যুগে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক মধুর ছিল। রাজা এক মহান আদর্শের দ্বারা চালিত হইতেন। এই শাসনব্যবস্থা অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বিন্দুসার। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার 'অমিত্রঘাত' অর্থাৎ 'শত্রু-নিধনকারী' উপাধি গ্রহণ করিয়া সম্ভবতঃ ৩০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 'অমিত্রঘাত' উপাধি হইতেই বোঝা যায় তিনি বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। অনেকে মনে করেন বিন্দুসারই দক্ষিণ ভারত জয় করিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও গ্রীক-শাসিত মিশর ও সিরিয়ার রাজাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন। বিন্দুসার সম্ভবতঃ ৩০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ হইতে ২৭৩ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৭ বছর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

প্রিয়দর্শী অশোক। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ২৭৩ অথবা ২৭১ অব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২৩২ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অশোকের প্রথম জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সিংহাসনে আরোহণের চারি বৎসর পরে সম্ভবতঃ ২৬৯ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়।

অশোকের কলিঙ্গ বিজয় এবং ইহার প্রতিক্রিয়া

অশোক তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম কয়েক বৎসর তাঁহার পূর্বগামী মৌর্য-সম্রাটদের ঐতিহ্য ও নীতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পরে অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয় কাহিনী ত্রয়োদশ সংখ্যক অনুশাসনে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কলিঙ্গ যুদ্ধের নিষ্ঠুর রক্তাক্ত দৃশ্যে অশোকের হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভবিষ্যতে আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না। কলিঙ্গ বিজয়ের পর তিনি অহিংসায় বিশ্বাসী হইয়া ওঠেন। ইহার পর তিনি

বাহুবলের সাহায্যে দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের নীতি গ্রহণ করেন। বিম্বিসারের সময় হইতে মগধের যে সম্প্রসারণ নীতির সূত্রপাত হয়, কলিঙ্গ জয়ে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে।

অশোক প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী এক অখণ্ড সম্রাজ্য স্থাপন করেন। অশোকের শিলালিপি অনুসারে অশোক স্বয়ং কেবলমাত্র কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। দক্ষিণে মহীশূর হইতে উত্তর-পশ্চিমে মানসেরা ও সাহাবাজঘরী, নেপালের তরাই অঞ্চলে এবং কাথিয়াবাড়ে অশোকের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। অশোকের সাম্রাজ্য পাঁচটি বিরাট প্রদেশে বিভক্ত ছিল—(ক) প্রাচ্য, (খ) কলিঙ্গ, (গ) দক্ষিণাপথ, (ঘ) অবন্তী রাষ্ট্র ও (ঙ) উত্তরাপথ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে পূর্ব-ভারতের কামরূপ ও সুদূর দাক্ষিণাত্যে চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র ব্যতীত অসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। উত্তর-পশ্চিমে বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তানের কিয়দংশ তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

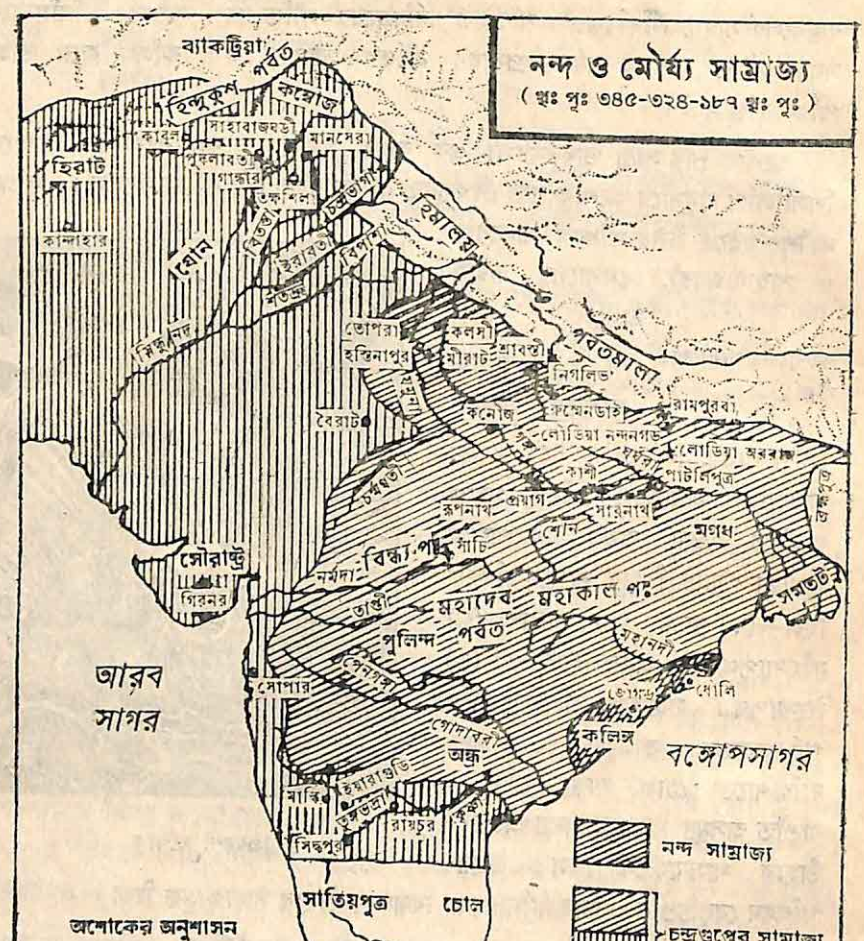
অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা



প্রিয়দর্শী অশোক

অশোক একদিনে বা রাতারাতি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন নাই। তাঁহার অনুশাসন-গুলিতেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কথা উল্লেখ আছে। কলিঙ্গ যুদ্ধের পূর্বে হইতেই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তিনি এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তবে তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও মঠবাসী ভিক্ষু হন নাই এবং বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মমতে পরিণত করেন নাই। তাঁহার ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পরধর্ম-সহিষ্ণুতা। তাঁহার ধর্ম ছিল বৌদ্ধধর্মের সারাংশ যাহার দ্বারা মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে। দয়া, দান, সত্য-নিষ্ঠা, পবিত্রতা, নম্রতা, মানুষের কল্যাণসাধন, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, ঈর্ষা হইতে মুক্তিলাভ করা—এই ছিল অশোকের ধর্মের সারমর্ম। এই ধর্ম পালন করিতে হইলে এই কার্যগুলি করিতে হইবে ; যথা—প্রাণিহত্যা না করা, জীবকে কষ্ট না দেওয়া, পিতামাতার আদেশ পালন করা, জ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, গুরুকে শ্রদ্ধা করা, বন্ধু, আত্মীয় ও সাধুসন্তদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, ভৃত্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা,

সম্রাট অশোকের ধর্মনীতি



অধিক ব্যয় বা অধিক সঞ্চয় না করা। ইহা হইতে বোঝা যায় যে তিনি সকল ধর্মের অন্তর্ভুক্ত মৌল নৈতিক নিয়মকানুন প্রচার করিয়াছিলেন।

ভারতে ও ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচারের জন্য অশোকের শাসনকাল চিহ্নিত হইয়া আছে। তাঁহার সাম্রাজ্যের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য অশোক বিভিন্ন প্রকার

ব্যবস্থা লইয়াছিলেন। রণবাদ্যের পরিবর্তে তিনি প্রজাগণের ঐহিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য নীতিধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। যে সমস্ত স্থানে সামাজিক অনুষ্ঠানে জনসমাগম হইত সেই স্থানে তিনি দেবতাদের তেজোদীপ্ত মূর্তি ও তাহাদের পবিত্র জীবন যাপনের চিত্র দেখানোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রজারা যাহাতে এই জীবনে ধর্মাচরণ করিয়া পরজন্মে দেবতা হইয়া এই সমস্ত স্বর্গীয় সুখ-সুবিধা ভোগ করিতে পারে সেই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে আগ্রহ জাগাইতে তিনি চেষ্টা করেন। অতীতের প্রথা অনুযায়ী বিহারযাত্রা বন্ধ করিয়া তিনি ধর্মযাত্রার প্রবর্তন করেন। যে সকল স্থান তিনি পরিভ্রমণ করিতেন সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে 'ধর্ম' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। অশোকের পক্ষে একা ধর্মপ্রচার করা সম্ভব ছিল না। তিনি 'ধর্মমহামাত্র' নামে একশ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাহাদের কাজ ছিল জনসাধারণের মধ্যে এই ধর্ম প্রচার করা এবং প্রজারা যাহাতে ধর্মপথে চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। তাহা ছাড়া তিনি তাঁহার উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিজ নিজ শাসনাধীন অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধর্মের বাণী প্রচার করিবার জন্য আদেশ দেন। প্রজাবর্গের মধ্যে তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিবার জন্য অশোক দেশময় পর্বত ও পাথরের স্তম্ভের গাত্রে তাঁহার ধর্মমত জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। এগুলিকে শিলালিপি ও স্তম্ভলিপি বলা হয়।

ধর্মপ্রচারক হিসাবে অশোক

বিহারযাত্রার পরিবর্তে ধর্মযাত্রা

অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ধর্মপ্রচার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ এবং সুদূর গ্রীক রাজ্যগুলিতে তাঁহার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরিত দূতগণ এণ্টিওকোস্ থিওস-এর অধীন সিরিয়ায়, টলেমি ফিলাডেলফস শাসিত মিশরে, মগ্‌স অধিকৃত সাইরিনে ও আলেকজাণ্ডারের অধীন এপিরাস বা কোরিন্থে গমন করিয়া সেখানকার অধিবাসীদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ও তাঁহার ধর্মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাবান করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া পশ্চিম-এশিয়া, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও সুমাত্রায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বহু প্রচারক প্রেরণ করেন। দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য, সাতিয়পুত্র, চোল, কেরলপুত্র রাজ্যেও তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। তাঁহার পুত্র (পক্ষান্তরে ভ্রাতা) মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে ধর্মপ্রচার করিয়া সিংহলরাজ তিস্স ও তাঁহার প্রজাবর্গকে দীক্ষিত করেন।

গ্রীক ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে দূত প্রেরণ

পৃথিবীর ইতিহাসে যে সব সম্রাট শাসন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অশোক সর্বশ্রেষ্ঠ। ঐতিহাসিক এইচ. জি. ওয়েলস্-এর মতে, সর্বদেশের সর্বকালের সম্রাটদের মধ্যে অশোক সর্বোত্তম। তিনি একজন বিচক্ষণ যোদ্ধা ছিলেন সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। তিনি যদি কলিঙ্গ যুদ্ধের পরও যুদ্ধনীতি চালাইয়া যাইতেন তাহা হইলে সুদূর দাক্ষিণাত্য সহজেই নিজের সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু অশোক তাঁহার চরম সামরিক গৌরবের সময়েই হিংসা নীতি ত্যাগ করিয়া অহিংসা নীতি গ্রহণ করেন এবং শান্তি ও মৈত্রী দ্বারা মানুষের হৃদয় জয়

অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব

করিবার জন্য সচেষ্ট হন। এই কারণেই তাঁহার রাজত্বকাল প্রপীড়িত মানব ইতিহাসের উজ্জ্বলতম বিরতিকাল বলিয়া গণ্য হয়।

অশোক তাঁহার শিলালিপি এবং স্তম্ভলিপিগুলিতে নিজেকে 'দেবনাম্‌পিয় পিয়দশী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র দেবতাদের প্রিয় নন, মানুষেরও তিনি প্রিয় ছিলেন। তিনি একটি শিলালিপিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ

অশোকের নীতি মানবকল্যাণ

"সর্বজনগণের হিতসাধন আমার কর্তব্য বলিয়া আমি মনে করি। এবং এই কর্তব্যসাধনের মূলে আছে তৎপরতা ও কর্ম সমাধান। সর্বলোকের হিতসাধন অপেক্ষা অধিক কোন কর্তব্যকর্ম নাই।" অপর একটি শিলালিপিতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "সকল প্রজাই আমার সন্তান। আমি যেমন নিজ সন্তানদের ঐহিক পারত্রিক সুখ ইচ্ছা করি সেইরূপ সকল প্রজার জন্যই করি।" অর্থাৎ তিনি জনগণের কল্যাণ সাধনকেই তাঁহার প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার সরকার দুঃস্থ ও আর্তদের অর্থসাহায্য করিত। সরকারী ব্যয়ে রাস্তাঘাট নির্মাণ, পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ, কূপ খনন, সরাইখানা স্থাপন, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার প্রজাবর্গ যাহাতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিয়া ধর্মের পথ অনুসরণ করে। অত্যাচার ও অবিচার প্রভৃতি দূর করিবার জন্য সরকারী কর্মচারী ৩ বা ৫ বৎসর অন্তর অন্তর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার অপেক্ষা পরাক্রান্ত সম্রাট ইতিহাসের পাতায় অনেক দেখা যায় কিন্তু সম্রাট অশোক পৃথিবীর সকল সম্রাট হইতে স্বতন্ত্র। কারণ তিনি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন যুদ্ধের নিষ্ফলতা, বাহুবলে রাজ্যবিস্তার নীতির অসারতা। অহিংসা যে পরম ধর্ম, তাহা তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে তিনি বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলেন তাঁহারা যেন তাঁহাকে ভয় না করে, যেন তাঁহাকে বিশ্বাস করে ; তাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা কোন দুঃখ পাইবেন না, যেন সুখ গ্রহণ করেন।

প্রাচীন ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ

পারসীক আক্রমণ। খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার, মদ্র, কম্বোজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সে সময়ে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অনৈক্যই ছিল একমাত্র দুর্বলতা। এই অনৈক্যের সুযোগে পারস্যরাজ সাইরাস্ ঐ সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশ আক্রমণ করিয়া গান্ধার নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

পারস্য সম্রাটদের আক্রমণ

সাইরাসের পর সম্রাট প্রথম দরায়ুস (৫২২-৪৮৬ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দ) ভারতবর্ষের উত্তরে পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। দরায়ুস-এর বেহিস্তান লিপিতে ভারতের কেবলমাত্র গান্ধার অঞ্চলটি পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই, পূর্বে পাঞ্জাব পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তারলাভ করিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দরায়ুস-পুত্র জারাক্সিস ভারতের তাঁহার সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করিয়াছিল। তবে খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পারসীক অধিকার শিথিল হইয়া আসে।

গ্রীক আক্রমণ। ম্যাসিডনিয়ার রাজা আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন সেই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে রাজনৈতিক ঐক্য বলিতে কিছুই ছিল না। এই অঞ্চল তখন অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সমস্ত রাজ্যের মধ্যে কতকগুলি ছিল রাজতন্ত্র-শাসিত এবং কতকগুলি ছিল প্রজাতান্ত্রিক।

উত্তর-পশ্চিমে ভারতের রাজনৈতিক চিত্র



আলেকজাণ্ডার

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ। আলেকজাণ্ডার একে একে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর ও পারস্য জয় করেন এবং ৩২৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন। কাবুলে পৌঁছিয়া আলেকজাণ্ডার ঐ অঞ্চলের সমস্ত ভারতীয় রাজ্যগুলিকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য হুমকি দেন। আলেকজাণ্ডারের হুমকিতে আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়া তক্ষশীলার রাজা অম্ভি আত্মসমর্পণ করেন এবং আলেকজাণ্ডারকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। অম্ভি ছাড়া আরও কয়েকটি রাজ্যও সেইদিন আলেকজাণ্ডারকে ভারতে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি উত্তর ভারতের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নিকট হইতে এবং কিছু ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার নিকট হইতে প্রচণ্ড প্রতিরোধ সংগ্রামের সম্মুখীন হইয়াছিলেন।

পুরুরাজের প্রতিরোধ

ইহার পর আলেকজাণ্ডার বিপুল গ্রীক বাহিনী লইয়া পুরুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। পুরুরাজ প্রাণপণ যুদ্ধ করেন এবং আপন মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া আলেকজাণ্ডারের হস্তে বন্দী হন। এই যুদ্ধই হিদাস্পিসের বা ঝিলামের যুদ্ধ নামে পরিচিত। পুরুরাজের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহার হৃতরাজ্য পুরুরাজকে ফিরাইয়া দেন।

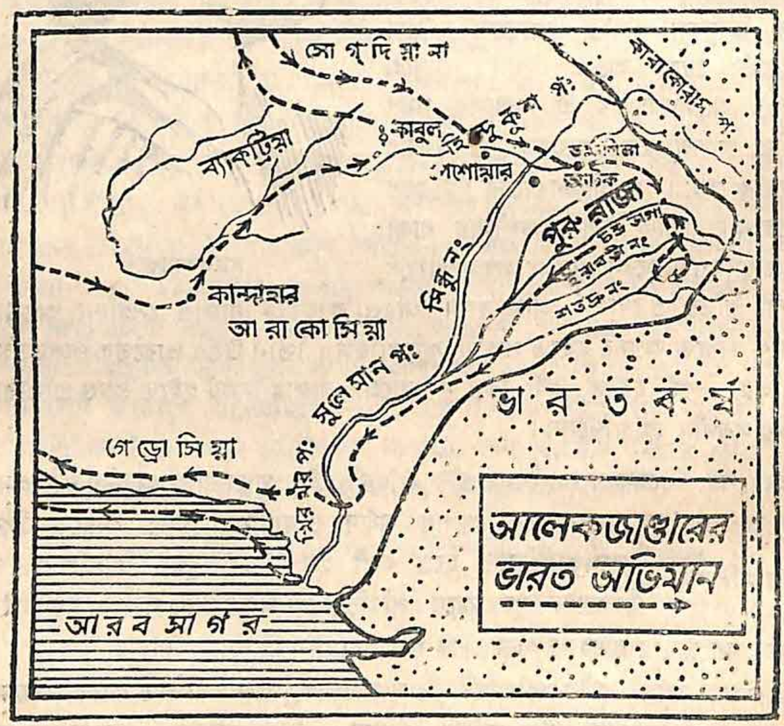
আলেকজাণ্ডারের প্রত্যাবর্তন

ইহার পর রাভি নদীর তীরবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে পরাজিত করিয়া আলেকজাণ্ডারের বাহিনী বিপাশার তীরে আসিয়া পৌঁছায়। কিন্তু আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আর অগ্রসর হইলেন না। তিনি তাঁহার একদল সৈন্যকে সেনাপতি নিয়ার্কোসের নেতৃত্বে সমুদ্রপথে দেশে পাঠাইয়া দিয়া নিজে বাকী সৈন্যদল লইয়া স্থলপথে যাত্রা করেন। ৩২৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তিনি ব্যাবিলনে পৌঁছান এবং ঐ শহরেই দেহত্যাগ করেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল ভারতের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আক্রমণের ফলে গ্রীসের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ সহজতর হয়। ইহার ফলে পরবর্তীকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে।

দ্বিতীয়ত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশ স্থাপিত হইবার ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীক জগতের সম্পর্ক নিবিড় হয়। তৃতীয়ত, এই আক্রমণ ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেতনা শক্তিশালী কয়ে। উত্তর ভারতের অনেক ছোট ছোট রাজ্য ধ্বংস করিয়া আলেকজাণ্ডার সেগুলিকে এক শাসনাধীনে আনিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতে একটি অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনের উপযোগী পরিবেশ পাইয়াছিলেন। চতুর্থত, এই আক্রমণের ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রীস ও ভারতের মধ্যে আদান-প্রদানের সূচনা হয়। সবশেষে, ভারতের সুনির্দিষ্ট কালানুক্রমিক ইতিহাস আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কাল হইতে শুরু হয়।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলাফল



ব্যাকট্রিয়ান বা বাহ্লীক গ্রীক আক্রমণ। সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সিরিয়া ও বাহ্লীক দেশের গ্রীক শাসকগণ হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ২০৬ অব্দে সিরিয়ার অধিপতি আণ্টিয়োকস পাঞ্জাব আক্রমণ করেন। তাঁহার জামাতা ডেমিট্রিয়স পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে রাজ্য স্থাপন করিয়া 'ভারতবাসীদের রাজা' এই উপাধি গ্রহণ করেন। ভারতে যে সকল গ্রীক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে

বাহ্লীক গ্রীকদের ভারত আক্রমণ ও রাজ্য স্থাপন

মিনান্দারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোটে রাজধানী স্থাপন করিয়া একটি বিরাট রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি ভারতে থাকাকালীন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হইয়া পড়েন। 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' বা 'মিলিন্দের প্রশ্ন' নামক পালি-গ্রন্থে বৌদ্ধাচার্য নাগসেনের সঙ্গে তাঁহার কথোপকথনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মিনান্দারের পর কয়েকজন গ্রীক রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে আণ্টিয়ালকিডাসই প্রধান। তিনি বিদিশার রাজা বলভদ্রের সভায় হেলিওডোরস নামক এক দূত প্রেরণ করেন এবং তিনি তথায় একটি গরুড়-স্তম্ভ নির্মাণ করেন। আজিও ইহাকে হেলিওডোরস স্তম্ভ বলা হয়।

ডেমিট্রিয়স, মিনান্দার, আণ্টিয়ালকিডাস

শক শাসন। যে শকজাতির আক্রমণের ফলে ভারতে গ্রীক রাজত্বের পতন ঘটে, সেই জাতির আদিম বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ায়। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউ-চি নামক এক যাযাবর জাতির অগ্রাভিয়ানের ফলে শকগণ পৈতৃক বাসস্থান শকস্থান পরিত্যাগ করিয়া বেলুচিস্তানের ভিতর দিয়া ভারতে প্রবেশ করে। উত্তর ভারতে তাহাদের দুইটি কেন্দ্র গড়িয়া ওঠে—একটি গান্ধার ও পূর্ব-পাঞ্জাবকে কেন্দ্র করিয়া, অপরটি মথুরা অঞ্চলে।

শকদের প্রথম রাজা যিনি গান্ধার অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করেন তিনি ময়েস বা মোগ। কাবুল ও পূর্ব-পাঞ্জাব তাঁহার অধীন ছিল। ময়েসের পর আজেস্ নামধারী দুইজন শকরাজা রাজত্ব করেন। মথুরায় শকক্ষত্রপ বা শাসকদের মধ্যে রাজবুল্ বা রাজুলার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করেন। নাসিককে কেন্দ্র করিয়া শকদের 'ক্ষহরত' শাখা সৌরাষ্ট্র, মালব ও মহারাষ্ট্রের একাংশে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নহপান নাসিক হইতে আজমীড় পর্যন্ত ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

শকদের বিভিন্ন শাখা

উজ্জয়িনীর শকগণ 'কর্দমক' নামে খ্যাত। চস্টন ছিলেন এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা রুদ্রদামন পশ্চিম মালব, উত্তর গুজরাট, কাথিয়াবাড়, নিম্ন-সিন্ধু উপত্যকা, উত্তর কোঙ্কন ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

কুষাণ জাতির আক্রমণের ফলে তক্ষশীলা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে শকাধিকার নষ্ট হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে প্রসিদ্ধ গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পশ্চিম ভারতে শক-আধিপত্যের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করেন।

পহ্লব বা পার্থিয়ান রাজ্য। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণদের আক্রমণের পূর্বে পহ্লব বা পার্থিয়ান নামে একজাতি পাঞ্জাবের কোন কোন অংশ হইতে শকদের বিতাড়িত করিয়া নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। ভারতের পহ্লব বংশীয় রাজাদের মধ্যে গণ্ডোফারনিসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক মুদ্রা হইতে যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় তাঁহার সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত ছিল। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন।

গণ্ডোফারনিস

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

সামাজিক অবস্থা। মৌর্য যুগ হইতে কুষাণ যুগের পূর্ববর্তী সময়ে ভারতীয় সমাজে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। মেগাস্থিনিসের মতে ভারতীয় সমাজ সাতটি জাতিতে বিভক্ত ছিল, যথা দার্শনিক (ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ), কৃষক, পশুপালক, শিকারী, শিল্পী ও কারিগর সম্প্রদায়, যোদ্ধাবাহিনী, পরিদর্শক ও অমাত্য। মেগাস্থিনিসের 'সপ্তজাতি বিভাগ' ভারতের সমাজে প্রচলিত চতুর্বর্ণ সম্পর্কে যে ধারণা তাহার সঙ্গে খাপ খায় না। তিনি বৃত্তির সহিত জাতির পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। তবে ইহা ঠিক যে মৌর্য ভারতে জাতিভেদ প্রথা দিন দিন কঠোর হইয়া উঠিতেছিল এবং পরবর্তী কালে অনেক বৃত্তিই জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। গ্রীক, শক ও পহ্লবদের আগমন ও রাজ্যবিস্তারের ফলে প্রাচীন সমাজব্যবস্থা কতকাংশে ভাঙিয়া পড়ে।

জাতিভেদ প্রথা

অর্থনৈতিক অবস্থা। এই যুগে ভারতীয়দের জীবনযাত্রা তথা সমাজব্যবস্থা একটি আর্থিক বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির মূল স্তম্ভ ছিল ভূমি ব্যবস্থা ও জাতিভেদ প্রথা। ভূমি ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় কৃষকদের জমিতে স্বত্ব কি ধরনের ছিল। এই যুগে জমি বিলি হইত পরিবার হিসাবে। পরিবারই সমগ্রভাবে তাহাদের জমি চাষ করিত। প্রতিটি গ্রামে কিছুটা সাধারণ জমি, সাধারণ গোচারণভূমি থাকিত। কিন্তু মোটামুটি জমি ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাহা পরিবারভিত্তিক বলিয়া গণ্য হইত। কৃষি-শ্রমিককে মজুরি দিয়া চাষ করানোর প্রথা এ যুগে প্রচলিত ছিল। জলসেচ ব্যবস্থা কৃষির উন্নতির জন্য অপরিহার্য তাহা জনসাধারণ জানিত এবং জমিতে সার দেওয়া হইত। ধান, যব, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, তিল, সরিষা, গম, বিভিন্ন প্রকারের ফল ও সব্জির চাষ হইত। চাষ-আবাদে লৌহের ফলাযুক্ত লাঙ্গল ব্যবহার করা হইত। ব্রাহ্মণগণও এ যুগে স্বহস্তে চাষ করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এই যুগে পশুপালনের উপরও জোর দেওয়া হইত এবং পশুদের মধ্যে গরুর স্থান সর্বাগ্রে ছিল।

ভূমিব্যবস্থা ও কৃষিপণ্য

শিল্প। মৌর্যযুগে শিল্পকলায় ভারতবর্ষ যে খুব উন্নত ছিল তাহা মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় সমাজে যে সাতটি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন শিল্পীরা ছিল তাহার মধ্যে একটি শ্রেণী। মেগাস্থিনিস আরও উল্লেখ করিয়াছেন, এই শিল্পীরা যুদ্ধাস্ত্র ও কৃষিকার্যের ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিত। শিল্পোৎপাদন ছিল বহুলাংশে শহরভিত্তিক। রাষ্ট্র শিল্পের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র হস্তক্ষেপই করে নাই, শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানাও স্থাপিত হইয়াছিল। যুদ্ধাস্ত্র ও জাহাজ নির্মাণকারীরা রাজার নিকট হইতে মজুরী ও খাদ্যসামগ্রী পাইত। কতকগুলি শিল্প ছিল সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে। যেমন ধাতুশিল্প, খনিশিল্প, মুক্তা, সূক্ষ্ম, বস্ত্র, পশম, বয়ন প্রভৃতি। রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত শিল্প ছাড়া যে-সব শিল্প ব্যক্তিগত মালিকানায় গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন

শিল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানা

ব্যবস্থা গ্রহণ করিত। মেগাস্থিনিস উল্লেখ করিয়াছেন যে পাটলিপুত্র নগরের শিল্পকার্যের তত্ত্বাবধানের জন্য পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট একটি সভা ছিল।

কারিগরদের অবস্থা

শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না; কারুশিল্পীদের বাদ দিলে অদক্ষ শ্রমিকদের অবস্থা দাসদের চেয়ে কিছুটা ভাল ছিল। অর্থনৈতিক দূরবস্থার জন্যই সমাজে ভাড়াটে শ্রমিকদের উদ্ভব ঘটে। মনু উল্লেখ করিয়াছেন যে দারিদ্র্যের জন্য মানুষ নিজের সন্তান-সন্ততি এবং নিজেকেও বিক্রয় করিত। মৌর্যোত্তর যুগে এরূপ সর্বহারার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

শিল্প সংঘ

ভারতে শিল্প ও কারুশিল্পে যে অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহার জন্য শিল্প-সংঘগুলির ভূমিকা প্রশংসনীয় ছিল। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উচ্চ মানের না হইলে শিল্পসংঘের ন্যায় সংস্থার উদ্ভব ঘটে না। প্রত্যেকটি শিল্পের জন্য এক-একটি সংঘ বা শ্রেণী গড়িয়া উঠে। শিল্প-সংঘগুলি পরিচালনা করিত দক্ষ কারিগরগণ। তাহারা কাজের সুবিধার জন্য শিক্ষানবিস গ্রহণ করিত। কালক্রমে তাহারা দক্ষ শিল্পী হইয়া সংঘের অন্যতম কর্ণধার হইতে পারিত। মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের অর্থনীতি অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করিত বণিক বা শ্রেষ্ঠী-সম্প্রদায়।

মধ্যযুগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্য। ষোড়শ মহাজনপদ যুগে ভারতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং বহির্বাণিজ্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, চম্পা প্রভৃতি স্থানগুলি প্রসিদ্ধি লাভ করে। মৌর্যযুগে বণিক ও ব্যবসায়ীগণ খুবই বিত্তশালী ছিল এবং উহাদের বিপুল ঐশ্বর্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য-যুগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল উন্নত ও সুনিয়ন্ত্রিত। প্রধানত নদীপথ ধরিয়া অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। তাহা ছাড়া দেশের বড় বড় রাজপথ বিভিন্ন দিকে প্রসারিত ছিল। বঙ্গদেশ ও মগধ হইতে সুদূর কাশ্মীর ও গান্ধার পর্যন্ত বণিকগণ পণ্যসম্ভার লইয়া যাতায়াত করিত।

বিদেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক

মৌর্যযুগে ভারতবাসীর বৈষয়িক উন্নতির অন্যতম কারণ ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য। এই যুগে মধ্য এশিয়া, পশ্চিম-এশিয়া, উত্তর আফ্রিকায় গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত এবং পূর্ব এশিয়ার কিছুসংখ্যক রাজ্যের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়। স্থলপথ ও জলপথ এই উভয় পথ ধরিয়াই বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইত। জলপথে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলি হইতে ভারতীয় পণ্যবাহী জাহাজগুলি আরব সাগরের উপর দিয়া পারস্য উপসাগর বাহিয়া পশ্চিম এশিয়া দেশগুলিতে উপস্থিত হইত। আবার লোহিত সাগরের ভিতর দিয়া ভারতীয় বাণিজ্যপোতগুলি মিশর দেশে গমনাগমন করিত। অপরদিকে স্থলপথে পারস্য, এশিয়া মাইনর, মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, তিব্বত ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য পৌঁছাইত।

মৌর্যোত্তর যুগে বহির্জগতের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ

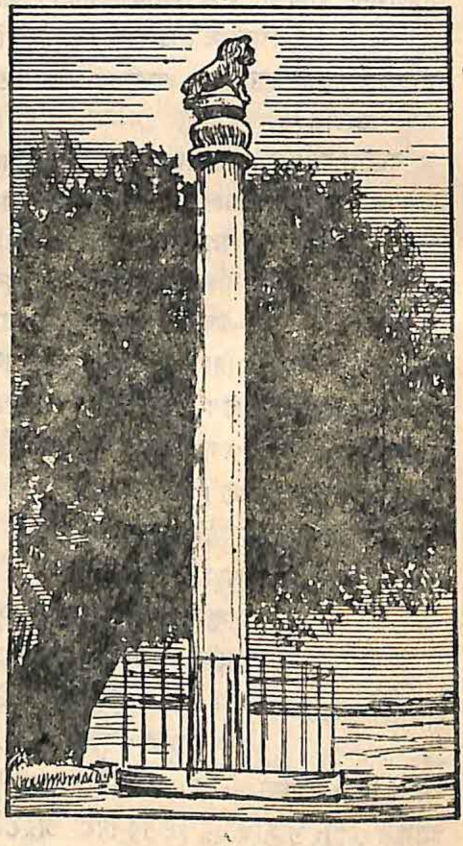
হইয়াছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় ভারতীয় বণিকদের একটি বসতি গড়িয়া ওঠে। এখান হইতে ভারতীয় পণ্যসমূহ রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হইত। এই যুগে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিলেও ব্যবসা বাণিজ্যে উহার প্রভাব পড়ে নাই।

মৌর্যোত্তর যুগ

ভারতীয় জনসমষ্টিতে বিদেশীদের অন্তর্ভুক্তি। বিদেশীরা বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ভারতে আসিয়াছিল। কখনো আক্রমণকারী হিসাবে, কখনো ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদে, আবার কখনো বা বসবাসের জন্য। মৌর্য যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক ও গ্রীকদের সংখ্যা খুব কম ছিল না। এমন কি পাটলিপুত্রে বিদেশীদের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তাহাদের দেখাশুনার জন্য ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ইন্দো-গ্রীক, পার্থিয়ান ও শকগণ ভারতে বেশি সংখ্যায় প্রবেশ করে। ভারতের জনসমষ্টিতে ইহাদের সংখ্যা কম ছিল না। স্বভাবতই ভারতীয় সভ্যতার সহিত এই সমস্ত বিদেশীয় সভ্যতার সংমিশ্রণ ঘটিতে থাকে এবং সমাজের নানা ক্ষেত্রে নূতন কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এই সকল বিদেশী জাতিও ভারতীয় সমাজে স্থান পাইয়াছিল ও কালক্রমে তাহারা পরিপূর্ণভাবে ভারতীয় হইয়া যায়। স্বভাবতই ভারতীয় সমাজে যে আলোড়ন দেখা দেয় তাহা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ সমাজকে সতেজ রাখিবার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রাদির নূতন ব্যাখ্যা করেন। এগুলিকে বলা হয় স্মৃতি-শাস্ত্র। সমাজে জাতিবৈষম্য স্বীকার করিয়া লইয়া বিদেশীদের ভারতীয় সমাজের অংশীদার করিয়া লইবার ব্যবস্থা হয়। বিদেশী জাতির ভারতীয় সমাজে স্থান হইবার ফলে বর্ণাশ্রম প্রথা কিছুটা শিথিল হইয়া পড়ে।

মৌর্যযুগে

বিদেশীদের ভারতীয় সমাজে অন্তর্ভুক্তি


অশোকস্তম্ভ। লৌড়িয়া নন্দনগড়

মৌর্য শিল্পকলা। মৌর্য যুগে শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতে নবযুগের সূচনা হয়।

মৌর্য যুগের শিল্পসম্পদ বলিতে প্রধানত পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, সারনাথের স্তূপ, বোধগয়ায় বোধিসত্ত্ব, গয়া জেলায় বরাবর এবং নাগার্জুন পাহাড়ের গুহাগুলি, বিভিন্ন স্তম্ভ, স্তম্ভশীর্ষে জীবজন্তুর ভাস্কর্য প্রভৃতি। মেগাস্থিনিস তাঁহার বিবরণীতে চন্দ্রগুপ্তের রাজপ্রাসাদের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা হইতে সেই সময়কার ভারতীয় শিল্পকলার উচ্চ মানের পরিচয় পাওয়া যায়। অশোকের নির্মিত স্তম্ভ ও স্তূপগুলি সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এক একটি অখণ্ড পাথর দিয়া স্তম্ভগুলি নির্মিত। এগুলির কারুকার্য ও মসৃণতা আজিও বিস্ময় সৃষ্টি করে। অশোক সন্ন্যাসীদের জন্য অতি কঠিন প্রস্তর কাটিয়া কয়েকটি গুহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। সে সমস্ত গুহার ভিতরকার পাথর এমন পালিশ করা যে মনে হয় যেন কাঁচের দর্পণ। অশেষ পরিশ্রম, অশেষ ধৈর্য ও নিপুণতার এ এক শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

মৌর্যশিল্পকলার নিদর্শন



অশোক-স্তম্ভশীর্ষ। রামপুরব।

এ পর্যন্ত যে কয়টি অশোকস্তম্ভে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ ভাঙা। স্তম্ভের শীর্ষে কোথাও বৃষ, কোথাও সিংহ, কোথাও ধর্মচক্রখচিত ছিল। এই স্তম্ভগুলির বিশেষত্ব এই যে এইগুলি একদিকে যেমন সুঠাম, অন্যদিকে তেমনি অলঙ্কারের বাহুল্য নাই। সারনাথের অশোকস্তম্ভের সিংহ-মূর্তির গঠন দেখিয়া এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, "পৃথিবীর কোন দেশে ইহা হইতে ভালো পশুমূর্তির ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না।"

অশোক স্তম্ভ

কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক মনে করেন মৌর্য যুগের শিল্পকলায় বিদেশী প্রভাব বর্তমান। তাঁহাদের মতে, স্তূপ বা স্তম্ভ নির্মাণে পারসিক ও গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত হইল মৌর্য শিল্পকলায় বিদেশী প্রভাব নাই বলিলেই হয়। বরঞ্চ উহাতে আর্য ও অনার্য শিল্পরীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।

স্বরূপ

কুষাণ সাম্রাজ্য

কুষাণরা ছিল ইউ-চি জাতির একটি শাখা। ইউ-চি জাতির আদি বাসস্থান ছিল চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে কান-সু প্রদেশে। তাহারা তখন ছিল যাযাবর। খ্রীঃ পূঃ

দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে হিয়ুঙ-নু নামক আর এক যাযাবর জাতি ইউ-চিদের আদি বাসস্থান হইতে বিতাড়িত করে। স্বভাবতই ইউ-চিরা বসবাসের স্থান সংগ্রহের জন্য পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা সমগ্র ব্যাকট্রিয়া বা বহ্লীক দেশ অধিকার করে এবং পাঁচটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ইহার পর তাহারা গান্ধার অধিকার করে। হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া তাহারা গ্রীক ও পার্থিয়ানদের ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করে। এই সময় কুষাণদের রাজা ছিলেন কুজুলা কাদ্‌ফিসেস। তিনি ঝিলাম নদীর তীর পর্যন্ত কুষাণ অধিকার বিস্তৃত করেন। তাঁহার সাম্রাজ্যের সহিত সমসাময়িক রোমক ও চীন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। অনেকের মতে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন।

ভারতে ইউ-চি জাতির অনুপ্রবেশ

কুজুলা কাদ্‌ফিসেসের পর রাজা হন তাঁহার পুত্র ভীম কাদ্‌ফিসেস। তাঁহার শাসনকালে সিন্ধুনদের নিম্নাঞ্চলের কিছু কিছু অংশবিশেষ তখনই কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার সাম্রাজ্য বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার প্রচলিত কিছু কিছু মুদ্রায় দেবতা শিবের প্রতিকৃতি মুদ্রিত আছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, তিনি শৈব ছিলেন।

ভীম কাদফিসেস

কণিষ্ক। দ্বিতীয় কাদ্‌ফিসেসের মৃত্যুর পর কণিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুষাণ রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বোত্তম। তাঁহার সঙ্গে দ্বিতীয় কাদ্‌ফিসিসের কি সম্পর্ক ছিল তাহা জানা যায় না। তাঁহার শাসনকালে কুষাণ সাম্রাজ্যের গৌরব শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়।

কণিষ্কের সিংহাসনে আরোহণের তারিখ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়া বিভিন্ন তারিখ বা সনের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন, খ্রীস্টপূর্ব ৫৮, খ্রীস্টাব্দ ৭৮, ১২৫, ২৪৮ এবং ২৭৮। অর্থাৎ এই আনুমানিক তারিখগুলির ব্যাপ্তি হইল প্রায় তিনশত বৎসর। এ কারণেই কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণের তারিখটি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম জটিল সমস্যা। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকগণের অভিমত হইল, কণিষ্ক ৭৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁহার রাজ্যাভিষেকের বৎসর হইতে একটি নূতন অব্দের প্রচলন হয়। এই অব্দই 'শকাব্দ' নামে পরিচিত।

কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণের তারিখ



সম্রাট কণিষ্ক

কণিষ্কের সাম্রাজ্য পূর্বে বিহার হইতে পশ্চিমে খোরাসন এবং উত্তরে খোটান হইতে দক্ষিণে কোঙ্কণ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। অনুশাসন ও মুদ্রার তথ্য হইতে জানা যায় যে, তিনি কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল, রাজপুতনা, মালব, কাথিয়াওবাড়, আফগানিস্তান,

কাবুল উপত্যকা ইত্যাদি অধিকার করিয়াছিলেন। পুরুষপুর বা পেশোয়ার ছিল তাঁহার রাজধানী। তাঁহার শাসনকালের শেষদিকে তিনি তুর্কীস্তান হইতে চীনাদের বিতাড়িত

কণিষ্কের সাম্রাজ্য বিস্তার

করিয়াছিলেন। খোটান, ইয়ারখন্দ ও খাসগড়ে চৈনিক প্রাধান্য দূর করিয়া তিনি ঐ প্রদেশগুলি নিজের অধিকারে লইয়া আসেন। কথিত আছে তিনি চীন সম্রাটের সেনাপতি প্যান চাও-এর সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া বর্তমান চীন-তুর্কীস্তানের কিয়দংশ দখল করিয়া লন। প্রাচীন ভারতে অন্য কোন রাজা ভারতের বাহিরে রাজ্যবিস্তারে কণিষ্কের ন্যায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে তাঁহার প্রধান রাষ্ট্রনীতি ছিল সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা। ইহার প্রমাণ তাঁহার মুদ্রাগুলি হইতে জানা যায়। তাঁহার মুদ্রায় ভারতীয়, গ্রীক ও পারসিক ধর্মের দেবদেবীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত রহিয়াছে। পেশোয়ারে তিনি একটি বিশাল বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মঠ সমসাময়িক

কণিষ্কের অবদান : বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক

ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। নানা দেশ ও ধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তখন হীনযান ও মহাযান, এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই মত দুইটি সম্বন্ধে আলোচনা এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য তিনি কাশ্মীরে বা জলন্ধরে একটি বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করেন। ইহাই শেষ বিখ্যাত বৌদ্ধসঙ্গীতি। এই সভা বৌদ্ধ-ধর্মমত তাম্রফলকে উৎকীর্ণ করার ব্যবস্থা করে। বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থগুলিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইবে বলিয়া স্থির হয়। কণিষ্কের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম মধ্য এশিয়া ও চীন দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।

তাঁহার রাজত্বকালে সাহিত্যিক ও বৌদ্ধধর্মগ্রন্থরচয়িতাগণ তাঁহার রাজসভা অলংকৃত করেন। অশ্বঘোষ ছিলেন একাধারে কবি, দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি 'বুদ্ধচরিত' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিশারদ চরক ছিলেন কণিষ্কের চিকিৎসক। তাঁহার সময় সংস্কৃত ভাষারও ব্যাপক প্রসার ঘটে। তাঁহার সময়েই গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধ

শিল্প ও স্থাপত্যে তাঁহার অবদান

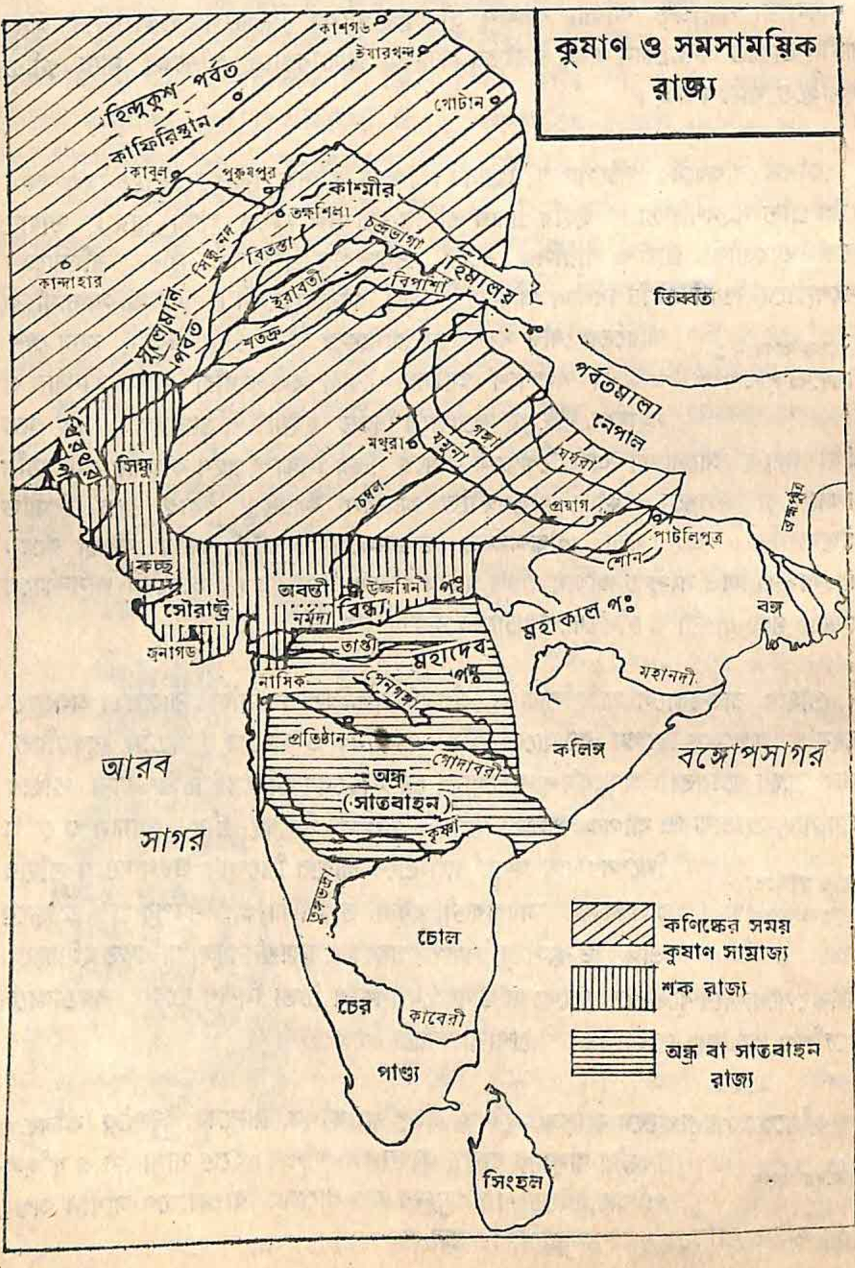
শিল্পের এক অপূর্ব সংমিশ্রণে 'গান্ধার শিল্পে'র উদ্ভব ঘটে। তাঁহার রাজত্বকালের অমরাবতী, মথুরা, তক্ষশীলা ও কণিষ্কপুর প্রভৃতি স্থানে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কণিষ্ক পেশোয়ারে বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর যে বিশাল চৈত্য নির্মাণ করেন পরবর্তীকালে বৈদেশিক পর্যটকরা তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

কণিষ্কের পর যথাক্রমে বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক, বাসুদেব, তৃতীয় কনিষ্ক ও

কুষানদের পতন

দ্বিতীয় বাসুদেব রাজত্ব করেন। পশ্চিম হইতে সাসানীয় ও দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে শক আক্রমণ এবং রাজ্যের বিভিন্নাংশে স্বাধীন অঞ্চল গঠিত হইতে থাকিলে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন হয়।

কুষাণ যুগের গুরুত্ব। কুষাণ রাজগণের একশত বৎসরের শাসনকাল ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়, কুষাণ রাজগণ সেই অস্থিরতা দূর করিয়া এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারত ও ভারতের বাহিরে (মধ্য এশিয়ায়) এক বিরাট



অঞ্চলে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়ত, কুষাণ সাম্রাজ্য ইক্ষু নদীর তীর হইতে গঙ্গা নদী ও মধ্য-এশিয়ার খোটান ও খোরাসান হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার ফলে চীন ও মধ্য-এশিয়া এবং রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি দেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ নিবিড়তর হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের মানুষের ও তাহাদের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিবার এক বিরাট সুযোগও দেখা দিয়াছিল। এক বিরাট অঞ্চলকে একই রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় আনিবার ফলে যে সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটিল তাহা ভারত উপমহাদেশকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তৃতীয়ত, বহির্দেশের সহিত ভারতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। ইহার ফলে মধ্য এশিয়ায় এবং চীনদেশে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। মধ্য এশিয়ার খোটান, তুরফান, খাসগর প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধমঠ ও বিহার গড়িয়া উঠে। চতুর্থত, এই যুগে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন ঘটে। বৌদ্ধধর্মে মহাযান মত শক্তিশালী হইতে থাকে। বুদ্ধদেব যে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সাকার মূর্তিপূজার কোন স্থান ছিল না। মহাযান সম্প্রদায় বুদ্ধকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করে। ইহার ফলে বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান নামে দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। কুষাণ যুগেই ইহা ঘটিয়াছিল। পঞ্চমত, কুষাণ যুগে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন আসে নাই, ব্রাহ্মণ্যধর্মেও পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। শৈবধর্মের প্রসার ঘটিবার ফলে ইহার সহিত যুক্ত কার্তিকেয়র পূজা বা আরাধনা ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। সূর্য এবং বাসুদেব উপাস্য দেবতায় পরিণত হন। এই সময়ে ভাগবত ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার ঘটে। ষষ্ঠত, কুষাণ যুগে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতি ঘটে। শিল্পের মধ্যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যই প্রধান। মন্দির ও বিহারকে কেন্দ্র করিয়া স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি ঘটিয়াছিল। এই যুগে মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদের চাহিদা অনুযায়ী ভাস্করগণ বুদ্ধমূর্তি তৈয়ারী করিতে শুরু করেন এবং তাঁহারা এক নূতন শিল্পরীতির প্রবর্তন করেন। ইহাকেই গান্ধার শিল্পরীতি বলা হয়। গান্ধার দেশে এই রীতির নমুনা বেশী করিয়া পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে 'গান্ধার শিল্প' বলা হয়। ইহার বিষয়বস্তু ভারতের ভাবধারা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সময়ে পালি ও সংস্কৃত ভাষারও উৎকর্ষ ঘটে। এমনকি বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন। নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, বসুমিত্র, পতঞ্জলি, চরক ও সুশ্রুত প্রভৃতি মনীষিগণ ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বহির্বিশ্বের সহিত নিবিড় সম্পর্কের কারণ

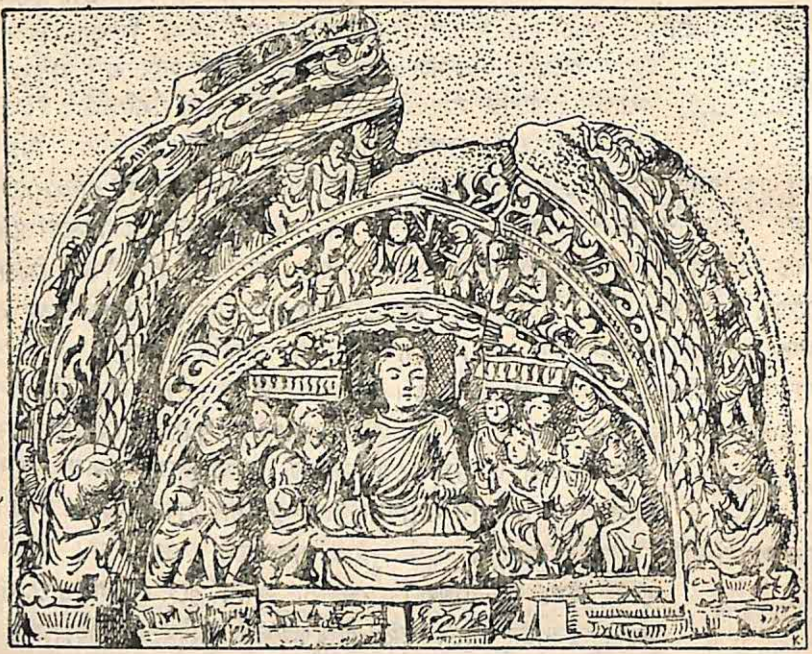
বৌদ্ধধর্মে পরিবর্তন

হিন্দুধর্মে পরিবর্তন

শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উন্নতি

কুষাণ যুগে আর্থিক দিক হইতে ভারত সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই যুগে পারস্য, মিশর ও রোম প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই বৃদ্ধি পায়। ভারতের মসলিন, সূতীবস্ত্র, মশলাপাতি, সুগন্ধি দ্রব্য রোম সাম্রাজ্যে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনি রোম হইতে ভরতে স্বর্ণমুদ্রা নিকাশের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

অর্থনৈতিক উন্নতি



গান্ধার শিল্প। সশিষ্য বুদ্ধদেব

কুষাণ যুগে ভারতীয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। মধ্য এশিয়ার বহু যাযাবর জাতি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলে অনেক ভারতীয় উপনিবেশও স্থাপিত হইয়াছিল। এই যুগেই ভারতের সহিত চীনের বাণিজ্যিক ও কৃষ্টিগত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

সাতবাহন সাম্রাজ্য

নর্মদা নদীর তীর হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ দক্ষিণ ভারত বা দক্ষিণাপথ নামে পরিচিত। এই দক্ষিণাপথকে আবার সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নর্মদা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে দাক্ষিণাত্য এবং কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণাংশকে 'সুদূর দক্ষিণ ভারত' বলা হয়।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থায় যে কয়টি নূতন রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে, তাহার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজবংশ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক মহারাষ্ট্রে যে বংশের প্রতিষ্ঠা করেন তাহা দীর্ঘ তিনশত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যে, পুরাণে, মেগাস্থিনিসের বিবরণে এবং অশোকের শিলালিপিতে সাতবাহনদের 'অন্ধ্র' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাতবাহন বংশের উৎপত্তি

প্রথম সাতকর্ণি

সাতবাহন বংশের তৃতীয় রাজা সাতকর্ণির সময় এই বংশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। তিনি দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী উপত্যকা জয় করেন এবং 'দক্ষিণপথপথি' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজ্যের পূর্বাঞ্চল কলিঙ্গ রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নর্মদা নদীর উত্তরে পূর্ব-মালবও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার সময়ে সাতবাহন রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান বা পৈথান। সাতকর্ণির মৃত্যুর পর শকদের আক্রমণের ফলে কিছুকালের জন্য সাতবাহন বংশের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল এবং সাতবাহনরা মহারাষ্ট্রের দক্ষিণদিকে আশ্রয় লয়।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি

খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথমদিকে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি সাতবাহনদের প্রতিপত্তি আবার বৃদ্ধি করেন। তিনিই হইলেন সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন সে সময় সাতবাহন রাজ্যের সীমা খুবই সংকুচিত হইয়া গিয়াছিল। শক রাজারাই সাতবাহনদের প্রধান শত্রু ছিল। সাতবাহন রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে শকগণ প্রথম সাতকর্ণির যে সব অঞ্চল জয় করিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিল সেসব অঞ্চল তিনি পুনরায় দখল করিয়া লন। নাসিক লিপি হইতে জানা যায় যে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি শকরাজ নহপানকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্র, মালব দেশ ও কাথিয়াওবাড় জয় করেন। ইহা ছাড়া নর্মদা অঞ্চল, পূর্ব বেরার ও পশ্চিম মালবও তিনি অধিকার করেন। কর্ণাটকের কিয়দংশও তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্ধ্র এবং দক্ষিণ কোশল তাঁহার রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে তাঁহার অধিকৃত স্থান-সমূহের মধ্যে মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী পূর্বঘাট পর্বতমালা এবং পূর্বঘাট পর্বতমালার দক্ষিণ ভূভাগ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সাম্রাজ্যের সীমা

নাসিক প্রশস্তিতে গৌতমীপুত্রকে 'শক-যবন-পল্লব-নিসূদন' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জয়লাভকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তিনি 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ১০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কৃতিত্ব

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি হইলেন সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি যে কেবলমাত্র অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তাহা নহে ; সমাজ-সংস্কারক এবং শাস্ত্রজ্ঞ-রূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। নাসিক লিপি পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি ক্ষাত্রিয়দের গর্ব ও অহংকার চূর্ণ করিয়া-ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিঠিত করেন। তিনি চতুর্বর্ণ হিন্দু সমাজে অটুট রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেও তিনি বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি উদার মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুলমায়ী

গৌতমীপুত্রের মৃত্যুর পর বশিষ্টপুত্র পুলমায়ী সাতবাহন রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি প্রায় ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের বহু মুদ্রা ও শিলালিপি অন্ধ্র প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি এই অঞ্চলটি সাতবাহন সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। অমরাবতীতে প্রাপ্ত লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি কৃষ্ণা নদীর মোহনা

পর্যন্ত সাম্রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শক-ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের হস্তে পরাজিত হন। অনেকে অনুমান করেন যে পুলমায়ী রাজ্যের পশ্চিমভাগ শকদের ছাড়িয়া দেন এবং অন্ধ্রদেশে তাঁহার রাজধানী সরাইয়া লইয়া যান। ইহার পর হইতেই সাতবাহনগণ 'অন্ধ্র' নামে পরিচিত হইতে থাকেন।

সাতবাহন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা হইলেন যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি। তিনি শক-ক্ষত্রপদের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ এবং উত্তর অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহার

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি

সময়কার বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কতকগুলি মুদ্রায় জাহাজের প্রতিকৃতি দেখা যায়। ইহা হইতে মনে করা হয় যে তিনি সামুদ্রিক বাণিজ্য ও নৌশক্তির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সাতবাহনদের দ্রুত পতন শুরু হয় এবং বিশাল সাতবাহন রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ইক্ষ্বাকু, বাকাটক, পল্লব, কদম্ব, অভির প্রভৃতি রাজবংশের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

ভারতের ইতিহাসে সাতবাহন বংশের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এই বংশ সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বজায় রাখে এবং বৈদেশিক শক্তিকে এই

সাতবাহন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব

অঞ্চলে প্রবেশে বাধা দেয় এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখে। সাতবাহনদের অন্যতম কীর্তি হইল আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার সমন্বয় সাধন। ঐতিহাসিক পানিক্করের মতে সাতবাহন বংশ দীর্ঘ তিনশত বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত ঐক্যকে সুদৃঢ় করিয়া এই সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধিশালী করে। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগত হইলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তাঁহাদের শাসনের ভিত্তি ছিল শাস্ত্রীয় বিধান। দক্ষিণ ভারতে তাঁহারাই আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্রুত প্রসার ঘটান। তাঁহারা সাহিত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডা সাতবাহনদের কীর্তিচিহ্ন বহন করিতেছে। সাতবাহন যুগের সরকারী ভাষা ছিল প্রাকৃত। কোন কোন সাতবাহন রাজা সম্ভবত প্রাকৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সাতবাহন রাজা হাল 'গাথাসপ্তশতী' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি সংকলন করিয়াছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য

মৌর্য বংশের পতনের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে মগধে গুপ্ত নামে একটি শক্তিশালী রাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে। এই রাজবংশ দীর্ঘকাল পর ভারতে আবার রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে। এই যুগকেই ভারতে 'গুপ্ত যুগ' বলা হয়।

গুপ্ত বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনো ঠিকভাবে কিছু বলা যায় না। তবে মনে করা হয় গুপ্ত বংশীয় রাজাদের আদি বাসস্থান ছিল এলাহাবাদ অঞ্চলে। গুপ্ত পরিবারের

গুপ্ত বংশের অভ্যুত্থান

বংশপঞ্জীতে প্রথম তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই তিনজন হইতেছেন শ্রীগুপ্ত, শ্রীঘটোৎকচগুপ্ত এবং চন্দ্রগুপ্ত। দ্বিতীয় এবং শেষজন যথাক্রমে 'মহারাজ' ও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত

যে স্বাধীন নরপতি ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রথম দুইজন সামন্তরাজ ছিলেন বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।

'মহারাজাধিরাজ' উপাধিধারী প্রথম চন্দ্রগুপ্তই গুপ্ত বংশের প্রাধান্য ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম নরপতি ছিলেন। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করিয়া গুপ্তাব্দ বা গুপ্ত সংবৎ নামে একটি সংবৎ প্রবর্তন করেন।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য

চন্দ্রগুপ্তের সময় উত্তর বিহারের রাজ্য লিচ্ছবী খুবই প্রতাপশালী ছিল। তিনি লিচ্ছবী রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও বংশমর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। পাটলিপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। দীর্ঘকাল পরে পাটলিপুত্রের গৌরব আবার ফিরিয়া আসে। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে প্রয়াগ, অযোধ্যা এবং মগধ অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সামরিক প্রতিভা, অসাধারণ কূটনীতি, বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা এবং মৃত্যুর আগে নিজ পুত্রদের মধ্যে যোগ্যতমকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া যান।

সমুদ্রগুপ্ত। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার মনোনয়নক্রমে তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত আনুমানিক ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি যে শুধু গুপ্ত রাজবংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন তাহা নহে, ভারতে যে সকল সম্রাট নিজেদের প্রতিভা ও ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অবিনশ্বর খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন সমুদ্রগুপ্ত তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার রাজত্বের ঘটনাবলী তাঁহার সভাকবি হরিষেণের প্রশস্তি, তাঁহার আমলের প্রাপ্ত মুদ্রা এবং শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি।

সমুদ্রগুপ্ত যে সব দেশ ও অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন সেগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়— ক) গঙ্গা-যমুনা-দোয়াব অঞ্চলের রাজ্যগুলি, যেগুলি তিনি দখল করিয়া লইয়াছিলেন। (খ) হিমালয়ের পূর্বদিকের রাজ্যগুলি এবং কয়েকটি সীমান্ত রাজ্য, যেগুলি বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বিজিত রাজ্য

(গ) বিন্ধ্য পর্বতের নিকটবর্তী বনরাজ্যগুলি; যেগুলি সমুদ্রগুপ্ত জয় করিয়াছিলেন। (ঘ) পূর্ব দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের ১২ জন শাসক যাঁহারা সমুদ্রগুপ্তের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন কিন্তু যাঁহাদের রাজ্য তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত করেন নাই। (ঙ) শক ও কুষাণ রাজ্যগুলি যেগুলিকে সমুদ্রগুপ্ত বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।



সমুদ্রগুপ্ত

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই উচ্চাকাঙ্ক্ষী সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র ভারতের উপর নিজ আধিপত্য স্থাপন করিতে এবং সমগ্র ভারতকে এক রাজনৈতিক ছত্রতলে আনিতে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হন। তাঁহার দিগ্বিজয়-কাহিনী এলাহাবাদ দুর্গের অভ্যন্তরে সম্রাট অশোকের নির্মিত একটি

প্রস্তরখণ্ডে সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেণের রচিত একটি প্রশস্তিতে উল্লেখ রহিয়াছে। এই প্রশস্তি পাঠে আমরা জানিতে পারি যে সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের নয়জন রাজাকে উচ্ছেদ করিয়া তাঁহাদের রাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই নয়জন রাজা হইলেন রুদ্রদেব (সম্ভবতঃ বাকাটক বংশীয় রাজা রুদ্রসেন), মতিল (উত্তর প্রদেশের বুন্দেলশহরের শাসনকর্তা), নাগদত্ত (জনৈক নাগরাজা), চন্দ্রবর্মণ (বাঁকুড়া জেলার গোকর্নার শাসনকর্তা), গণপতিনাগ (মথুরার শাসনকর্তা), নাগসেন (জনৈক নাগরাজা), অচ্যুত (বেরিলি জেলায় ইহার রাজ্য ছিল), নন্দী (আর একজন নাগরাজা), বলবর্মন (আসামের জনৈক রাজা)। এই রাজাদের পরাজিত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পশ্চিমে পাঞ্জাব ও রাজপুতানা পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়: আর্যাবর্ত বিজয়

আর্যাবর্ত বিজয় শেষ করিয়া তিনি এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার দক্ষিণ ভারত অভিযান উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চল এবং দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে কাঞ্চী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র দাক্ষিণাত্য জয় করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের যে সব রাজ্যকে তিনি পরাজিত করেন তাঁহারা হইতেছেন কোশলের মহেন্দ্র, কেরল রাজ্যের মন্তরাজ, কোট্টুরের রাজা স্বামীদত্ত, পিষ্টপুরের রাজা মহেন্দ্রগিরি, এরণ্ডপল্লের রাজা দমন, কাঞ্চীরাজ বিষ্ণুগোপ, অবিমুক্তের রাজা নীলরাজ, ভেঙ্গীর রাজা হস্তীবর্মণ, পলাক্কার রাজা উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের রাজা কুবের, কুস্থলপুরের রাজা ধনঞ্জয় এবং মহাকান্তারের রাজা ব্যাঘ্ররাজ। দাক্ষিণাত্যের এই সকল রাজ্যগুলিকে সমুদ্রগুপ্ত নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এই রাজগণ তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিলে তিনি তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। অতএব সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণাত্যের বিজয়নীতি তাঁহার উত্তর ভারতের বিজয়নীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। সমুদ্রগুপ্ত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সুদূর পাটলিপুত্র হইতে দক্ষিণ ভারত শাসন করা তখনকার দিনে অসম্ভব হইবে।

দক্ষিণ ভারত: পৃথক নীতি অনুসরণ

সমুদ্রগুপ্ত 'আটবিক' বা অরণ্যরাজ্যসমূহ অধিকার করেন। মনে হয় এই রাজ্যগুলি ছিল নর্মদা ও মহানদীর উপত্যকায় অবস্থিত ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। সমুদ্রগুপ্তের অস্ত্রবলের পরিচয় পাইয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে অবস্থিত সমতট, কামরূপ, দবাক (ঢাকা) এবং নেপাল রাজ্যের রাজগণ স্বেচ্ছায়, তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করেন এবং সাম্রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত পাঞ্জাব ও রাজপুতানার অনেক উপজাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। এই সকল উপজাতির মধ্যে মালব, অর্জুনায়ন, যৌধেয়, ক্ষুদ্রক, অভীর এবং কাকগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আনুগত্য

সমুদ্রগুপ্তের সহিত পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপদের সম্পর্ক ছিল বেশ জটিল। এলাহাবাদ লিপিতে শকক্ষত্রপ ও কুষাণদের উপর সমুদ্রগুপ্তের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। শকদের সহিত তাঁহার যুদ্ধের কথা জানা যায় না। সম্ভবতঃ ক্ষত্রপগণ

সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সময় পশ্চিম ভারতের ক্ষত্রপদের ভূখণ্ডে সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। পরে অবশ্য মহাক্ষত্রপ তৃতীয় রুদ্রসেন তাঁহার পূর্ব ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন।

সমুদ্রগুপ্তের খ্যাতি কেবলমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সিংহল এবং অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসিগণ তাঁহার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার সভায় একজন দূত প্রেরণ করেন এবং সমুদ্রগুপ্তের অনুমতিক্রমে তিনি বুদ্ধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করেন। অনেকের মতে সমুদ্রগুপ্ত মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য দ্বীপের হিন্দু উপনিবেশসমূহের উপর কিছুটা কর্তৃত্ব করিতেন। সমুদ্রগুপ্ত প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা নিজের সার্বভৌম শক্তি ঘোষণা করেন।

বহির্ভারতে প্রভাব

সাম্রাজ্যের যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীন ছিল তাহার উত্তর সীমা হিমালয়ের পাদদেশ, দক্ষিণ সীমা নর্মদা, পূর্বসীমা ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিম সীমা যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সমুদ্রগুপ্তের কীর্তি আলোচনা করিলে স্বভাবতঃই তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। মৌর্যযুগের পর ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছিল সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার অসাধারণ সামরিক প্রতিভার দ্বারা তাহা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। দিগ্বিজয়ের প্রেরণায় তিনি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। 'শতযুদ্ধের বিজয়ী বীর' সমুদ্রগুপ্তকে যথার্থই 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলা হয়। হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হইলেও তিনি অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার সময়ের মুদ্রাগুলি সম্রাটের অপূর্ব শিল্পরুচির পরিচয় বহন করে। তিনি একাধারে সুকবি, সুগায়ক, রাজনীতিবিদ্ এবং একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। একটি মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি দেখা যায়। তিনি সর্বরাজোচ্ছেত্তা', 'ব্যাঘ্রপরাক্রম', 'পরাক্রমাঙ্ক', 'অশ্বমেধ-পরাক্রম' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল।

সমুদ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য'। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তবংশীয় রাজাদের মধ্যে অন্যতম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। সমসাময়িক লিপি হইতে জানা যায়, তিনি ৩৭৫ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সম্ভবতঃ ৪১৩-৪১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পরলোকগমন করেন। তিনি প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি নাগ ও বাকাটক রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সাম্রাজ্যের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি 'কুবেরনাগা' নামক এক নাগ রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। ফলে নাগ রাজবংশের সহিত সখ্যতা স্থাপিত হয়। তিনি নর্মদার দক্ষিণে অবস্থিত শক্তিশালী বাকাটক রাজ্যের অধিপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের

বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি

সঙ্গে তাঁর কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দেন। কিছুকাল পরে দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার শিশুপুত্র সিংহাসনারোহণ করেন। ফলে প্রভাবতীই হন প্রকৃত শাসক।



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বাকাটক রাজ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াই চন্দ্রগুপ্ত শক শাসিত মালব ও গুজরাট দখল করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি দাক্ষিণাত্যের কদম্ব বংশের সহিতও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। যাহা হউক, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সমসাময়িক রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া নিজের ক্ষমতা তথা সাম্রাজ্যের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি বঙ্গের সামন্ত শত্রু-জোটকে পরাজিত করেন এবং সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তিনি বহ্লীকগণকে পরাজিত করেন। তবে তাঁহার সামরিক বিজয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি পশ্চিম ভারতের শক শক্তির নিধন। তিনি আরব সাগরের উপকূলে উপনীত হইয়া সৌরাষ্ট্র ও কাথিওবাড়ের শকক্ষত্রপ রুদ্রসিংহকে পরাজিত ও নিহত করেন। এই বিজয়ের ফলে পশ্চিম ভারতের সম্পদশালী প্রদেশগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সাম্রাজ্যের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হয়। ইহার ফলে একদিকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে, অপরদিকে ভারতে বৈদেশিক শক্তির অবসান হয়। পশ্চিম ভারত বিজয়ের পর তিনি প্রথমে বিদিশা এবং পরে উজ্জয়িনীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। কালক্রমে উজ্জয়িনী গুপ্ত সাম্রাজ্যের তথা ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

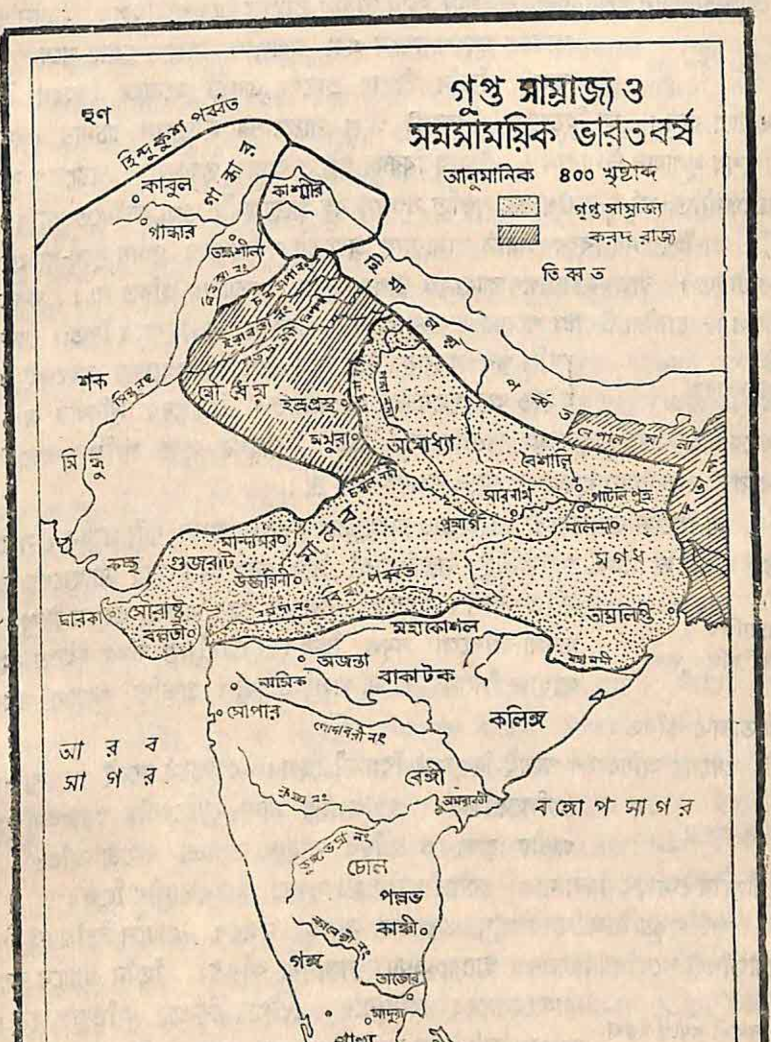
সাম্রাজ্য বিস্তার : শক শক্তির পরাজয়

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পিতার ন্যায় বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। বহু প্রখ্যাত লেখক ও পণ্ডিতের নাম তাঁহার রাজত্বকালের সঙ্গে যুক্ত। তাঁহার রাজত্বকালকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগ বলিয়াও স্বীকার করা হইয়াছে। সমসাময়িক মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে জানা যায় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি এবং কিংবদন্তীর প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। বত্রিশ সিংহাসনের গল্পে এই কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিখ্যাত 'নবরত্ন' সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি উর্জ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন এবং ৫৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে একটি অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাস চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। তবে নবরত্ন গোষ্ঠীর সকলে একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। উজ্জয়িনীতে তিনি দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং 'শকারি' নামে অভিহিত হইতেন। কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যের সহিতও এগুলি জড়িত রহিয়াছে। তবে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন অব্দ প্রচলন করেন নাই। এই অব্দ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য

বিষয়ে অমিল ছাড়া কিংবদন্তীর শকারি বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আর কোন বিশেষ অমিল নাই।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন একজন কৃতী সাম্রাজ্য সংগঠক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথ প্রদর্শক। তাঁহার শাসনকালে সাধারণ মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করিত। তাহাদের



অর্থনৈতিক অবস্থা যে ভাল ছিল এবং দেশের শাসনব্যবস্থা যে দৃঢ় ও সুসংহত ছিল তাহা আধুনিক কালের ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেন।

ফা-হিয়েন ও তাঁহার বিবরণ। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন এবং প্রায় ১৫ বৎসর এ দেশে অবস্থান করেন। বৌদ্ধতীর্থস্থান দর্শন এবং বৌদ্ধশাস্ত্র পঠন তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি স্থলপথে ভারতে প্রবেশ করেন এবং জলপথে সিংহল হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। তিনি তাঁহার ভ্রমণের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ফা-হিয়েনের বিবরণী গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক বিশেষ মূল্যবান উপাদান। তাঁহার বিবরণ হইতে আমরা তৎকালীন ভারতের সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে পারি।

ঐতিহাসিক মূল্য

ফা-হিয়েনের বিবরণ পাঠে জানা যায় ভারতের জনসাধারণ তখন সুখে-শান্তিতে দিন কাটাইত। রাজকর্মচারীগণ কাহারও উপর অন্যায় অত্যাচার করিত না। করভার লঘু ছিল। চাষীরা উৎপন্ন শস্যের সামান্য অংশ রাজাকে খাজনা হিসাবে দিত। অপরাধের শাস্তি খুব কঠোর ছিল না। দেশের লোকেরা সহজেই একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারিত। যাত্রীদের সুবিধার জন্য পথের ধারে ধারে কিছুদূর অন্তর যাত্রীনিবাসও ছিল। দেশের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করিত, দস্যু-তস্করের বিশেষ কোন উপদ্রব ছিল না।

শাসনব্যবস্থা

ফা-হিয়েন ভারতবাসীদের আচার-ব্যবহারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। সমগ্র দেশে চণ্ডাল ব্যতীত সকল অধিবাসীই নিরামিষাশী ছিল এবং অহিংসাই তাহাদের জীবনের নীতি ছিল। সমাজে জাতিভেদ প্রথা অবশ্য কঠোর ছিল। দেশ ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিল। তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে বড় বড় জাহাজ সিংহল, জাভা, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে পণ্য লইয়া যাতায়াত করিত।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা

দেশের অধিকাংশ প্রজাই হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিল। বৌদ্ধধর্ম ক্রমেই প্রাধান্য হারাইয়া ফেলিতেছিল। দেশবাসীরা নানা দেবদেবীর আরাধনা করিত। গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহারা ধর্মচর্চা করিত। ধর্মের গোঁড়ামি কোথাও ছিল না। বৌদ্ধবিহারে জীবনযাত্রা আদর্শস্থানীয় ছিল।

ধর্মীয় অবস্থা

পাটলিপুত্র ছিল তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নগর। এখানে তিনি দুইটি বিরাট বৌদ্ধবিহার দেখিয়াছিলেন। ছাত্ররা এখানে পড়াশুনা করিত। তিনি এখানে অশোকের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হন। এই নগরের ধনী বৈশ্য সম্প্রদায়ের বদান্যতায় তিনি মুগ্ধ হন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সর্বসাধারণের জন্য তাঁহারা চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজধানী সম্বন্ধে মন্তব্য

প্রথম কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য'। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দীর্ঘ ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও গৌরব অক্ষুণ্ণ

থাকে। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি তাঁহার আনুগত্য ছিল সংশয়াতীত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মের প্রতিও তাঁহার ঔদার্য কম ছিল না। অনেকে মনে করেন তাঁহার সুদীর্ঘ শাসনকালে সাহিত্য ও শিল্পকলার চরম বিকাশ ঘটে। তিনি সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকাল ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কার্যের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সুফল তাঁহার রাজত্বকালে পাওয়া যায়। তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে পুষ্যমিত্র নামে দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিবার উপক্রম করে, কিন্তু যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের অক্লান্ত চেষ্টায় গুপ্ত সাম্রাজ্য এই বিপদ হইতে রক্ষা পায়। ৪৫৫ খ্রীস্টাব্দে কুমারগুপ্তের মৃত্যু হয়।

শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ

স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত ৪৫৫ খ্রীস্টাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৪৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনিই গুপ্ত বংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট। পিতার জীবদ্দশাতেই দুর্ধর্ষ পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তিনি প্রভূত সামরিক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার সিংহাসন লাভের কিছুকাল পূর্বে দুর্দান্ত হূন জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ চালাইতে থাকিলে স্কন্দগুপ্ত তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা পুনরাক্রমণ না করিতে পারে, সেইজন্য সীমান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা করেন। স্কন্দগুপ্ত যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন হূনরা পুনরাক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। তাঁহার হূন আক্রমণ প্রতিরোধ এবং হূনদের বিরুদ্ধে তাঁহার সাফল্য তাঁহাকে ভারতের ইতিহাসে এক অক্ষয় স্থান দিয়াছে। তাঁহার সাম্রাজ্য বাঙলাদেশ হইতে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় তিনিও 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন।

হূন আক্রমণ প্রতিরোধ

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর পুরগুপ্ত নরসিংহগুপ্ত ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত যথাক্রমে রাজত্ব করেন। তাঁহারা কেহই পরাক্রমশালী শাসক ছিলেন না। তাহাদের শাসনকালে সৌরাষ্ট্র ও পশ্চিম মালব স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইহার পর বুধগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন (৪৭৭-৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে)। এই সময় হইতে হূনরা পুনরায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আক্রমণ চালাইতে থাকে। হূন নেতা মিহিরকুলের নিকট গুপ্ত সম্রাট নরসিংহগুপ্ত পরাজিত হন। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমে মগধে 'পরবর্তী গুপ্ত' নামে পরিচিত এক স্বতন্ত্র রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হঠাৎ ঘটে নাই। ইহার অধঃপতন বহুদিন ধরিয়া ঘটিয়াছিল এবং এই অধঃপতনের কারণও ছিল বহু। প্রথমত, গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত পর্যন্ত সকল সম্রাটই সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ

শান্তি-শৃঙ্খলা মোটের উপর অক্ষুণ্ণ ছিল। স্কন্দগুপ্তের বংশধররা সকলেই দুর্বল অকর্মণ্য ছিলেন। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষার ক্ষমতা ও আগ্রহ তাঁহাদের ছিল না।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন পার্বত্য জাতির আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনের অন্যতম কারণ। কুমারগুপ্তের আমলেই পুষ্যমিত্র নামক দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। যদিও এই আক্রমণ স্কন্দগুপ্ত প্রতিহত করেন তবুও ইহা ঠিক যে পুষ্যমিত্রদের উদাহরণ পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতি অনুসরণ করে। হুন আক্রমণও গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য করা হয়। এই আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

হুন ও বিভিন্ন পার্বত্য জাতির আক্রমণ

তৃতীয়ত, গৃহবিবাদের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে সামন্ত রাজারা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার সুযোগ পায়। চতুর্থত, বুধগুপ্তের শাসনকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও আঞ্চলিক নায়কদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মৈত্রক, পরিব্রাজক, মহারাজা, পাণ্ডু বংশ ইত্যাদি পরিবারও বাংলার শাসনকর্তারা স্বাধীন রাজা হিসাবে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। বুধগুপ্তের শাসনকালেই নর্মদা অঞ্চল হইতে বাকাটকরা আক্রমণ শুরু করে। ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হয়। মালবরাজ যশোবর্ধন হুনদের পরাজিত করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসাবে ঘোষণা করেন। তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন কনৌজের মৌখরীগণ, সৌরাষ্ট্রের মৈত্রকগণ এবং বাংলার সামন্তগণ।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা ও গৃহবিবাদ

পঞ্চমত, কোন কোন ঐতিহাসিক পরবর্তী গুপ্তরাজাদের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে করেন। কথিত আছে, গুপ্তরাজ বালাদিত্য হুন নেতা মিহিরকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে ভীত হন এবং জলাভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয় না।

বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

পরিশেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক দুরবস্থা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলা যায়। একদিকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং অপরদিকে হুন আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় স্কন্দগুপ্ত ও তাঁহার পরবর্তী গুপ্ত রাজাদের মুদ্রার নিকৃষ্টতায়। দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে সামন্ত রাজারা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কেন্দ্রীয় রাজকোষে অর্থ পাঠান বন্ধ করিয়া দেয়। রাজস্ব আদায়ে গাফিলতি দেখা দেয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে যে অর্থ রাজকোষে আসিত তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপে রোমক সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। আর প্রায় একই সময়ে গুপ্তদের পতনের সূচনা। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য বহির্বাণিজ্যের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। অর্থনৈতিক দৈন্যদশা চরম সীমায় পৌঁছায় এবং সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে।

রাজকোষে অর্থাভাব

গুপ্ত যুগে সমাজ ও সংস্কৃতি। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুপ্ত শাসনকাল একটি গৌরবময় যুগ। গুপ্ত-সম্রাটদেব সর্বশেষ বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। গুপ্ত যুগ শুধু সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য স্মরণীয় নয়, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য ইহা সমধিক প্রসিদ্ধ।

গুপ্ত যুগে সমাজ পিতৃতান্ত্রিক ছিল এবং পিতাই পরিবারের কর্তা ছিলেন। সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা লক্ষ্য করা যায়। জাতিভেদ প্রথা সমাজ জীবনে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিল এবং সমাজ চারিটি শ্রেণীতে (বর্ণে) বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সামাজিক অবস্থা

প্রত্যেক শ্রেণীই নিজ নিজ সাংস্কৃতিক মানে পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা সমাজের শিরোমণি ছিলেন। সমাজে নারীর স্থান উন্নত ছিল। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার দেখা যায়। দেশের নানা স্থানে অনেক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলসমূহে সুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা যায় এবং এই অর্থনৈতিক উন্নতিই গুপ্তযুগে সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ করিয়া দেয়। এই যুগে কৃষির উন্নতি বিশেষভাবে দেখা যায়। খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত বলিয়া দেশের লোকের খাদ্যের কখনও অভাব হইত না। গুপ্ত যুগে শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ প্রসার ঘটে।

কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে গুপ্ত যুগ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির নবজাগরণের যুগ। এই মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ মৌর্যোত্তর যুগে ব্রাহ্মণ্য-

হিন্দুধর্মের পুনর্জন্ম কিনা

ধর্মের ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। বৈদেশিক কুষাণ রাজারা পর্যন্ত হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। সুতরাং গুপ্ত যুগে হিন্দুধর্মের পুনর্জন্ম ঘটে—এই ধারণা ভ্রমাত্মক। তবে ইহা সত্য যে গুপ্তদের আনুকূল্যে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকাল ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ। সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত উভয়েই সাহিত্যরসিক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের সভাসদ হরিষেণ বিখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। হরিষেণ-রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি'র ভাষা সত্যিই

সাহিত্যের উৎকর্ষ

অপূর্ব। এই যুগে সংস্কৃত সাহিত্যের বহুল প্রসার ঘটে। নাটক ও কবিতা রচনায় এই যুগের তুলনা আর ভারতের ইতিহাসে মেলে না। মহাকবি কালিদাস এই যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নাটক, কাব্য ও গীতিকাব্যে কালিদাসের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। শকুন্তলা ছাড়া বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কালিদাসের পর বিখ্যাত নাট্যকার শূদ্রকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'মৃচ্ছকটিক' নাটক রচনা করেন। 'মুদ্রারাক্ষস' নামক ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতা বিশাখদত্ত ও গুপ্তযুগের নাট্যকার।

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলি গুপ্তযুগেই বর্তমান আকার ধারণ করে। এই সময়ে 'পুরাণ' ও

'স্মৃতি'শাস্ত্রগুলি পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করা হয়। এই সকল শাস্ত্রে গুপ্তযুগের ঐতিহ্য, রীতিনীতি, ধর্মমত ও দার্শনিক চিন্তাধারার অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়।

গুপ্ত যুগে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পায়। গুপ্ত সম্রাটগণ বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা করিতেন। তবে তাঁহারা ধর্মীয় সহনশীলতার নীতিই অনুসরণ করিতেন। গুপ্ত যুগে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যধর্মে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম এই সময় ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়ে। বিষ্ণু, নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত হন। স্ত্রী দেবতা শক্তির নামে পূজাও এই যুগে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ইহা ছাড়া কার্তিক, সূর্য, লক্ষ্মী, পার্বতী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজাও প্রচলিত হয়। মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপর হিন্দুধর্ম প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে এবং বৌদ্ধমঠগুলিতে হিন্দু দেবদেবীরা স্থান পান। এই যুগে বুদ্ধ বিষ্ণুর দশাবতারের অন্যতম বলিয়া গণ্য হন।

ধর্মীয় জীবন

গুপ্ত যুগে কাব্য ও দর্শনের ন্যায় বিজ্ঞানের চরম উন্নতি দেখা দেয়। পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষ, রসায়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই গুপ্ত যুগে ভারতীয়রা উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পাটিগণিত ভারতীয় বিজ্ঞান। হিন্দুদের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব ১ হইতে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও শূন্যের আবিষ্কার। বীজগণিতেও হিন্দুদের কৃতিত্ব যথেষ্ট। আর্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্ত বীজগণিতে এমন সব প্রশ্নের সমাধান করিয়াছিলেন যাহা ইউরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনরায় সেগুলি আবিষ্কৃত হয়। ব্রহ্মগুপ্ত ছিলেন অসামান্য গণিতজ্ঞ ও পণ্ডিত। তিনি বলিয়াছেন যে বস্তুসমূহ পার্থিব অভিকর্ষের টানেই মাটিতে পড়ে। এই সময় ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের গভীর যোগাযোগ ছিল বলিয়া জ্যোতির্বিদ্যার প্রসার হয় বেশী। এই বিষয়ে আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে দিন-রাত্রির ভেদ হয়, আর্যভট্টই প্রথম সেই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ জানিতেন। রসায়ন শাস্ত্রেরও এই সময় বিরাট উন্নতি ঘটে। এই যুগে ধাতুবিদ্যার অগ্রগতিও অব্যাহত ছিল। এই যুগের ভারতীয়রা ইস্পাত গালাই, পাকা রঙ তৈয়ারী, কাপড় বোনা, চামড়ার কাজ এবং নানাবিধ ভেষজ তৈয়ারীতে দক্ষ ছিল। পারদের ব্যবহারও তাঁহারা জানিতেন। হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রও গুপ্ত যুগে খুব উন্নত ছিল। সে সময় শবব্যবচ্ছেদ প্রত্যেক চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নরত ছাত্রদের অবশ্য শিক্ষণীয় বলিয়া গণ্য হইত। তাহা ছাড়া চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা যেমন শিশুরোগ, স্নায়বিক রোগ, কর্ণ ও স্বরযন্ত্র প্রদাহের চিকিৎসা এবং ঔষধ প্রস্তুত বিজ্ঞান পৃথক পৃথক চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসাবে পরিচিত ছিল। করোটির অস্ত্রোপচার, হাত ও পায়ের ব্যবচ্ছেদ ও চোখের ছানি কাটার মতন জটিল ধরনের শল্য চিকিৎসারও উল্লেখ এই যুগের চিকিৎসা-সংক্রান্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানের উন্নতি

শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতের তখন গৌরবময় যুগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই যুগকে ভারতীয় শিল্পকলার চরম উৎকর্ষের যুগ বলা যায়। সমসাময়িক জগতে গুপ্ত যুগের

শিল্পীদের তুলনা অন্য কোন দেশে ছিল না। এই যুগের বহু কীর্তি বৈদেশিক আক্রমণে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সামান্য যাহা কিছু আছে, তাহাই ভূয়সী প্রশংসা পাইবার যোগ্য। গুপ্ত যুগের স্থাপত্যের নিদর্শনস্বরূপ শোলাপুর জেলার তার নামক স্থানের মন্দির, কৃষ্ণা জেলার কোটেশ্বর মন্দির, রাজগৃহে মণিনাগের মন্দির, সাঁচীর মন্দির, ভূমরার শিবমন্দির, আইহোলের মন্দির, ঝাঁসির অন্তর্গত দেওগড়ের দশাবতার মন্দির রহিয়াছে। মন্দির ব্যতীত গুপ্ত যুগের বহু মঠ, স্তূপ এবং চৈত্যগুহা নির্মিত হইয়াছিল। চৈত্যগুহার মধ্যে ইলোরার ইন্দ্রসভা ও জগন্নাথ সভা চৈত্যগুহা, মধ্য ভারতের বাগ নামক স্থানে পর্বতোপরি বিহার, বাদামী ও অজন্তার চৈত্যগুহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের চিত্রশিল্প অজন্তায় পূর্ণতা লাভ করে।

গুপ্তযুগের স্থাপত্য ও শিল্পকলা

পার্থিব আর আধ্যাত্মিক জীবনের এক সুন্দর সামঞ্জস্য এখানকার বিভিন্ন চিত্রে দেখা যায়। অজন্তার অঙ্কিত 'মা ও ছেলে', 'বোধিসত্ত্ব' প্রভৃতি চিত্রকে এই যুগের শিল্প-কলার অপূর্ব নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা হয়। গুপ্তরাজাদের যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে সেগুলিও শিল্পরুচির পরিচায়ক। গুপ্ত যুগের ভাস্কর্য উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়াছিল। এই যুগের ভাস্কর্যের দিক হইতে সারনাথের বুদ্ধমূর্তি অপূর্ব। পরবর্তী যুগের ভারতীয় শিল্পীরা এবং জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের শিল্পীরা গুপ্ত যুগের আদর্শকে অনুসরণ করিয়াছিল। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ গুপ্ত যুগের। এই স্তম্ভটি দেড় হাজার বৎসর পূর্বে তৈয়ারী। এতকাল রৌদ্র, বৃষ্টি ও বাতাসে থাকিয়াও ইহাতে বিন্দুমাত্র মরিচা ধরে নাই।



বোধিসত্ত্ব। অজন্তা চিত্রশিল্প

এইসব কারণে ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া আছে। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান উন্নত ছিল বলিয়া এই যুগকে বলা হয় সুবর্ণযুগ এবং ইহাই ভারতীয় সভ্যতার চরম উন্নতির সময়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রাধান্য স্থাপনের সংগ্রাম

উত্তর ভারত

যশোধর্মন ও হূন আক্রমণ। হূনরা ছিল মধ্য এশিয়ার এক যাযাবর জাতি। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইহারা খুব শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে একটি দল ইউরোপে প্রবেশ করে এবং আর একটি দল শ্বেত হূন গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত ইহাদের পরাজিত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যকে সাময়িকভাবে রক্ষা করেন। হূনরা কিন্তু ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যায় নাই। তাহারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকিয়া যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে তাহারা তোরমানের নেতৃত্বে ভারতের ভিতরে প্রবেশ করে এবং সিন্ধুদেশ, রাজস্থান ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করিতে সমর্থ হয়। তোরমানের উত্তরাধিকারী মিহিরকুল গুপ্তরাজাদের পরাজিত করিয়া এক বিরাট অঞ্চলের অধীশ্বর হন। এমন কি শিয়ালকোটে তিনি রাজধানীও স্থাপন করেন। গুপ্ত বংশ হীনবল হইয়া পড়িলে মালবের যশোধর্মন ক্ষমতাশালী হন। যশোধর্মনের বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ভারতের ইতিহাসে তাঁহার অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটে। হূনরাজ মিহিরকুলকে তিনি চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। পশ্চিম মালবের অন্তর্গত মান্দোশোর ছিল তাঁহার রাজধানী। হূনদের বিরুদ্ধে তাঁহার বিজয় কাহিনী দুইটি প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া তিনি যে সব রাজ্য জয় করিয়াছিলেন সেগুলির উল্লেখ রহিয়াছে। যশোধর্মনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মালবের গৌরবসূর্য অস্তমিত হয়।

যশোধর্মনের কৃতিত্ব

গৌড় রাজ্যের উত্থান

প্রাচীন বাংলাদেশ গৌড়, বঙ্গ, সমতট, বরেন্দ্রভূমি প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বর্তমান স্বাধীন বাঙলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অংশকে বাঙলা, ইহার উত্তর অংশকে পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রভূমি বলা হইত। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলকে রাঢ়া দেশ বলা হইত। আর সমতট ছিল দক্ষিণ ও পূর্ব বাঙলায়। প্রাচীনকালে উত্তর-পশ্চিম বাঙলায় গৌড় রাজ্যের নাম আমরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখ পাই।

প্রাচীন বাংলা

প্রাক্-গুপ্তযুগের বাঙলার ইতিহাস অজ্ঞাত। গুপ্ত আমলে বাঙলাদেশের কিছুটা অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলাদেশের রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়া যায়। ইহার মধ্যে গৌড় রাজ্য ছিল প্রধান। গৌড়ের রাজা গোপচন্দ্র খুব পরাক্রমশালী ছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলা জুড়িয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

শশাঙ্ক। সপ্তম শতকে শশাঙ্ক নামে এক রাজা গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার 'কর্ণসুবর্ণ' ছিল তাঁহার রাজধানী। শশাঙ্কই সর্বপ্রথম বাঙালী যিনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশ ও বাল্যজীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' ও হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ হইতে তাঁহার রাজ্যবিস্তারের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি বাঙলাদেশ ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। পশ্চিমে তিনি মগধ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এইভাবে শশাঙ্ক তাঁহার সিংহাসনে বসিবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলেন। তাঁহার পূর্বে আর কোন বাঙালী রাজা এত বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই।

শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের সীমা

শশাঙ্কের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল কনৌজের মৌখরী রাজাদের আক্রমণ হইতে নিজের রাজ্যকে রক্ষা করা। এই কারণে তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তাঁহার সহযোগিতায় মৌখরীরাজ গ্রহবর্মণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। পরে রাজ্যবর্ধনও তাঁহার হস্তে প্রাণ হারান। বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। কিন্তু এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। তবে শশাঙ্ক কনৌজ বেশীদিন নিজের অধিকারে রাখিতে পারেন নাই।

কনৌজ আক্রমণ

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি শশাঙ্ককে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। শশাঙ্কের সহিত কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সম্পর্ক ভাল ছিল না। শশাঙ্কের নেতৃত্বে গৌড়ের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তিনি শঙ্কিত হন এবং হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইতে দ্বিধা করেন নাই। হর্ষের পক্ষেও এই মৈত্রী লাভজনক হইয়াছিল। ইহার ফলে পূর্বদিক হইতে ভাস্করবর্মন এবং পশ্চিমদিক হইতে হর্ষবর্ধন শশাঙ্ককে আক্রমণ করেন। কিন্তু শশাঙ্কের জীবদ্দশায় তাঁহারা শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে পারে নাই। শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি স্বাধীন নরপতি হিসাবেই গৌড় শাসন করিয়াছিলেন। ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার পর গৌড় রাজ্য হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মা ভাগ করিয়া লন।

ভাস্করবর্মন ও হর্ষবর্ধনের সহিত সংঘর্ষ

শশাঙ্ক ছিলেন শৈব। তাঁহার সময়কার লেখকেরা তাঁহাকে বৌদ্ধ-বিরোধী ও বৌদ্ধ-ধর্মের নিগ্রহকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকেরা ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া মনে করেন, কারণ হিউয়েন সাঙ তাঁহার বিবরণীতে গৌড় রাজ্যে বৌদ্ধদের শ্রীবৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কনৌজের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের চেষ্টা

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইলে উত্তর ভারতে পুনরায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে উত্তর ভারতে দুইটি শক্তিশালী

রাজ্যের উদ্ভব ঘটে—একটি থানেশ্বর রাজ্য, অপরটি গৌড় রাজ্য। ইহা ব্যতীত কনৌজের মৌখরী বংশ, মালবের গুপ্ত বংশ, কামরূপের বর্মন বংশ উল্লেখযোগ্য স্বাধীন রাজ্য যেগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-ভারতে গড়িয়া ওঠে।

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ

হূন শক্তির হঠাৎ পতনের ফলে থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজবংশ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া ওঠে। এই বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক হইতেছেন প্রভাকরবর্ধন। তিনি গুর্জর প্রমুখ বৈদেশিক আক্রমণকারীদের পরাজিত করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং মালব ও গুজরাট পর্যন্ত নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি কনৌজের মৌখরী বংশীয় গ্রহবর্মনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধন (শিলাদিত্য)। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন ৬০৫ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই কনৌজের গ্রহবর্মন মালবরাজ দেবগুপ্ত ও গৌড়রাজ শশাঙ্কের আক্রমণে নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রী শত্রুহস্তে বন্দিনী হন। এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্ধন সসৈন্যে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তিনি প্রথমে মালবরাজ দেবগুপ্তকে পরাজিত করেন, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি শশাঙ্কের হস্তে নিহত হন। এইভাবে একসঙ্গে কনৌজ ও থানেশ্বর রাজ্য দুইটির সিংহাসন শূন্য হইয়া পড়ে। ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে থানেশ্বর রাজ্যের অমাত্যদের অনুরোধে হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬১২ খ্রীস্টাব্দে হর্ষবর্ধন 'রাজপুত্র' উপাধি গ্রহণ করিয়া কনৌজের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং থানেশ্বর ও কনৌজ রাজ্য দুইটিকে সংযুক্ত করিয়া গাঙ্গেয় উপত্যকায় একটি বিরাট শক্তিশালী রাজ্যের পত্তন ঘটান। থানেশ্বর হইতে তিনি কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং এই সময় হইতে কনৌজ আর্যাবর্তের প্রধান নগর ও সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হয়।



হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ : থানেশ্বর ও কনৌজের সংযুক্তি

হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। হিউয়েন সাঙ তাঁহার

বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে, হর্ষবর্ধনের ৬০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও এক লক্ষ হস্তী ছিল। হর্ষবর্ধন ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর রাজ্যজয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই রাজ্যজয়ের কোন

হর্ষবর্ধনের রাজ্য বিস্তার

প্রমাণসিদ্ধ বিবরণ নাই। তিনি গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অবশ্য শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) হর্ষ মগধ ও উত্তর বাংলা জয় করিয়াছিলেন। তিনি ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত কোঙ্গদ এলাকা জয় করেন। বলা হইয়া থাকে যে পশ্চিমদিকে হর্ষবর্ধন বর্তমান কথিয়াওবাড়ের অন্তর্গত বলভী রাজ্যের রাজা ধ্রুবসেনকে পরাজিত করিয়া নিজ আধিপত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। কিন্তু অধুনা ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে, ধ্রুবসেন কিছুদিনের মধ্যে হর্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হন। ইহা ছাড়া হর্ষবর্ধন মগধ, মালব এবং গুজরাটও জয় করিতে পারেন নাই। এই রাজ্যগুলির উপর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রভাব ছিল। সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাইয়া হর্ষবর্ধন ব্যর্থ হন। কাশ্মীর ও হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে তিনি একাধিক সামরিক অভিযান চালাইয়াছিলেন। কিন্তু এগুলিও ব্যর্থ হইয়াছিল।

হর্ষবর্ধন দাক্ষিণাত্যেও প্রভাব বিস্তার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার আক্রমণ প্রতিরোধ করেন।

হর্ষবর্ধনের রাজ্যের সীমা

৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। হর্ষবর্ধন নর্মদা নদীর দক্ষিণে নিজ আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। শিলালিপিতে হর্ষবর্ধনকে সমগ্র উত্তরাপথের প্রভু বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহা কোনক্রমেই গ্রহণ করা যায় না। পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যার কিছু অংশ লইয়া হর্ষের সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতের সহিত চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন চীনের তাঙ বংশীয় সম্রাট তাই-সুঙের নিকট এক দূত পাঠান। চীন সম্রাট পরে হর্ষবর্ধনের রাজসভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধন অদম্য উৎসাহ লইয়া শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের অবস্থা নিজে দেখিবার জন্য তিনি প্রায়ই নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। হর্ষের

হর্ষবর্ধনের কৃতিত্ব

নিজের সাহিত্য প্রতিভাও ছিল। তিনি তিনটি নাটক রচনা করেন—রত্নাবলী, প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দ। হর্ষের সময় নালন্দা বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এশিয়ার তৎকালীন এই সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রকে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন।

রাজ্যজয় ও শান্তি স্থাপনের পর হর্ষ অশোকের ন্যায় ধর্মের আদর্শকে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষ শৈব ছিলেন কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হন এবং

হর্ষবর্ধনের ধর্মীয় নীতি

বৌদ্ধধর্মের উন্নতিসাধনে মনোযোগী হন। তিনি অবশ্য শিব ও সূর্যের উপাসনা করিতেন। তিনি নানাস্থানে স্তূপ, সঙ্ঘারাম বা বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকের ন্যায় তিনি, জীবহত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যে

বিবিধ আইনও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পথিকদের সুবিধার জন্য দেশের সর্বত্র তিনি পান্থশালা নির্মাণ করেন। এই সকল পান্থশালায় চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় হর্ষ প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগে একটি মহামেলা আহ্বান করিতেন এবং সকল ধর্মের অনুরাগীদের অর্থাদি বিতরণে সন্তুষ্ট করিতেন। এই সময় তিনি একদিন বুদ্ধ, একদিন শিব ও একদিন সূর্যের উপাসনা করিতেন।

হর্ষবর্ধন ছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁহার সামরিক প্রতিভা, সংগঠন-শক্তি, বিদ্যানুরাগ, প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি সকলেই স্বীকার করেন। হুন আক্রমণে বিধ্বস্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, হর্ষ নিজ প্রতিভাবলে সেই অবস্থা হইতে উত্তর ভারতকে মুক্ত করিতে সমর্থ হন।

হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করিয়া চীনদেশে ফিরিয়া যান। তিনি ভারত সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া বিবরণী লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতের ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে ইহা একটি অমূল্য গ্রন্থ।



হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙ প্রায় আট বৎসর হর্ষের রাজ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত সম্রাটের সৌহার্দ্য জন্মিয়াছিল। হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা এবং ধর্মনীতি সম্বন্ধে তিনি খুঁটিনাটিভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। শাসন ব্যাপারে তিনি হর্ষের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হর্ষকে পরামর্শ দিবার জন্য তাঁহার একটি মন্ত্রিসভা ছিল। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল কিন্তু রাস্তাঘাট, দস্যু-তস্করের উপদ্রব হইতে নিরাপদ ছিল না। ভূমি-রাজস্ব উৎপন্ন ফসলের মাত্র এক-ষষ্ঠাংশ ধার্য ছিল। অন্যান্য করের হারও বেশী ছিল না। রাজকর্মচারীদের মধ্যে অনেকে বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগ করিতেন। কৃষকরা তাহাদের প্রয়োজনে সরকারের নিকট হইতে কৃষিকাজের জিনিসপত্র পাইত।

হিউয়েন সাঙ লিখিয়াছেন যে হর্ষ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে ছাত্ররা এখানে পড়াশুনা করিতে আসিত। হিউয়েন

সাঙ প্রথমে এখানে অধ্যয়ন করেন এবং পরে অধ্যাপনার কাজ করিয়াছিলেন। তখন শীলভদ্র নামে বাঙালি মহাপণ্ডিত নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন।

হিউয়েন সাঙ ভারতীয়দের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ভারতীয়রা অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ করিত না এবং তাহাদের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি তাহারা পালন করিত। তাহারা আইন মানিয়া চলিত এবং তাহাদের নৈতিক চরিত্রের মান বেশ উঁচু ছিল। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার আদর্শ মজ্জাগত ছিল। তবে সমাজে জাতিভেদ প্রথা বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছিল।

হিউয়েন সাঙ হর্ষবর্ধনের ধর্মীয় নীতি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। কনৌজের ধর্মসভা, প্রয়াগের মেলা, হর্ষবর্ধনের দানশীলতা সবকিছু তাঁহার বিবরণীতে আলোচিত হইয়াছে। হর্ষবর্ধন বুদ্ধ, সূর্য ও শিবের উপাসনা করিতেন এবং সমস্ত ধর্মমতের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে তিনি জীবহত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। হর্ষ নিজে অতীব অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন।

হর্ষের মৃত্যুর পূর্বে হিউয়েন সাঙ চীন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

প্রতিহার ও পাল সাম্রাজ্যের উত্থান

প্রতিহার সাম্রাজ্য। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রতিহার বংশ কনৌজে আধিপত্য বিস্তার করিয়া একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের রাজ্যের সীমা হর্ষের সাম্রাজ্যের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না।

উৎপত্তি ও বিস্তার

ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজপুতানায় মান্দোরে গুর্জর প্রতিহারদের উত্থান হইয়াছিল। পরে তাঁহারা মালবে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে বেশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। অষ্টম শতকের প্রথম ভাগে প্রতিহার-রাজ প্রথম নাগভট্ট সিন্ধুদেশের আরবদের পরাজিত করিয়া প্রভূত সামরিক খ্যাতি অর্জন করেন। নাগভট্ট উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করেন। প্রথম নাগভট্টের পর বৎসরাজ (৭৩৯-৭৯৪ খ্রীঃ) এই বংশের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নৃপতি। তিনি বাংলার পালরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু নিজে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের নিকট পরাজিত হন। এই সময় হইতে পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট সংঘর্ষ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত জয়ী হন প্রতিহারগণ।

প্রথম নাগভট্ট ও বৎসরাজ

প্রতিহার বংশের পঞ্চম রাজা দ্বিতীয় নাগভট্ট (৮০৫-৮৩৬ খ্রীঃ) অন্যতম পরাক্রান্ত-শালী নৃপতি ছিলেন। তিনি গৌড়াধিপতি ধর্মপাল ও তাঁহার আশ্রিত কনৌজরাজ চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। মিহিরভোজ বা ভোজদেব (৮৩৬-৮৮৭ খ্রীঃ) প্রতিহার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তিনি কনৌজ পুনরুদ্ধার করেন এবং এই বংশের শেষ পর্যন্ত কনৌজ প্রতিহারদের রাজধানী ছিল। মধ্য ও পূর্ব রাজস্থানের উপরও তিনি আধিপত্য স্থাপন করেন। মালব ও গুজরাটের কিছু অংশ তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। শতদ্রু নদীর পূর্বপারে কয়েকটি রাজ্যও তিনি জয় করিয়াছিলেন। পালবংশীয় রাজা দেবপালের নিকট তিনি পরাজিত

নাগভট্ট ও মিহিরভোজ

হইয়াছিলেন। কিন্তু দেবপালের মৃত্যুর পর ভোজদেব পূর্বদিকেও তাঁহার রাজ্য বিস্তার করেন। রাজা ভোজ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এবং 'আদিবরাহ' উপাধি গ্রহণ করেন।

সম্ভবতঃ ৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে রাজা ভোজের মৃত্যু হয়। ইহার পর তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৯০৮-৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার সাম্রাজ্যই কেবল অটুট রাখেন নাই, মগধ ও উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত তাহা বিস্তৃত করেন।

মহেন্দ্রপাল

মহেন্দ্রপালের মৃত্যুর পর প্রতিহারদের পতন শুরু হয়। মহেন্দ্রপালের পরবর্তী রাজা মহীপাল রাষ্ট্রকূট তৃতীয় ইন্দ্রের নিকট পরাজিত হন। প্রতিহারদের এই ভাগ্যবিপর্যয়ের সুযোগে চন্দেল্ল, পারমার, চৌলুক্য প্রভৃতি সামন্তরাজারা একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে প্রতিহার সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। এই বংশের শেষ রাজা রাজ্যপাল ১০১৮ খ্রীস্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদের নিকট পরাজিত হন।

পাল সাম্রাজ্যের উত্থান। গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলা-দেশে ঘোরতর অরাজকতা দেখা দেয়। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলার একশত বৎসরের ইতিহাস খুবই অস্পষ্ট। এই যুগটি ছিল নৈরাজ্যের যুগ, মাৎস্যন্যায়ের যুগ। রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি বাংলাদেশ আক্রমণ করে। ক্রমান্বয়ে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা, কনৌজের রাজা যশোবর্মন, কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় বাংলার উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। বারংবার বিদেশী আক্রমণ বাংলার জীবনীশক্তি নষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। এই অসহনীয় অবস্থার অবসানকল্পে বাংলার প্রজাপুঞ্জ এক মহাসভায় মিলিত হইয়া গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে তাহাদের রাজা নির্বাচন করে। সে যুগে এইভাবে রাজা নির্বাচন সত্যই এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। গোপাল যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশের ইতিহাসে তাহা 'পাল বংশ' নামে খ্যাত। আর এই পাল বংশের আমলেই বাংলাদেশের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় রচিত হয়।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের রাজপদে নির্বাচন

গোপাল স্থানীয় সামন্ত রাজাদের সমর্থন পাইয়াছিলেন এবং এই সমর্থন তাঁহার পদমর্যাদাকে সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে তাঁহার প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

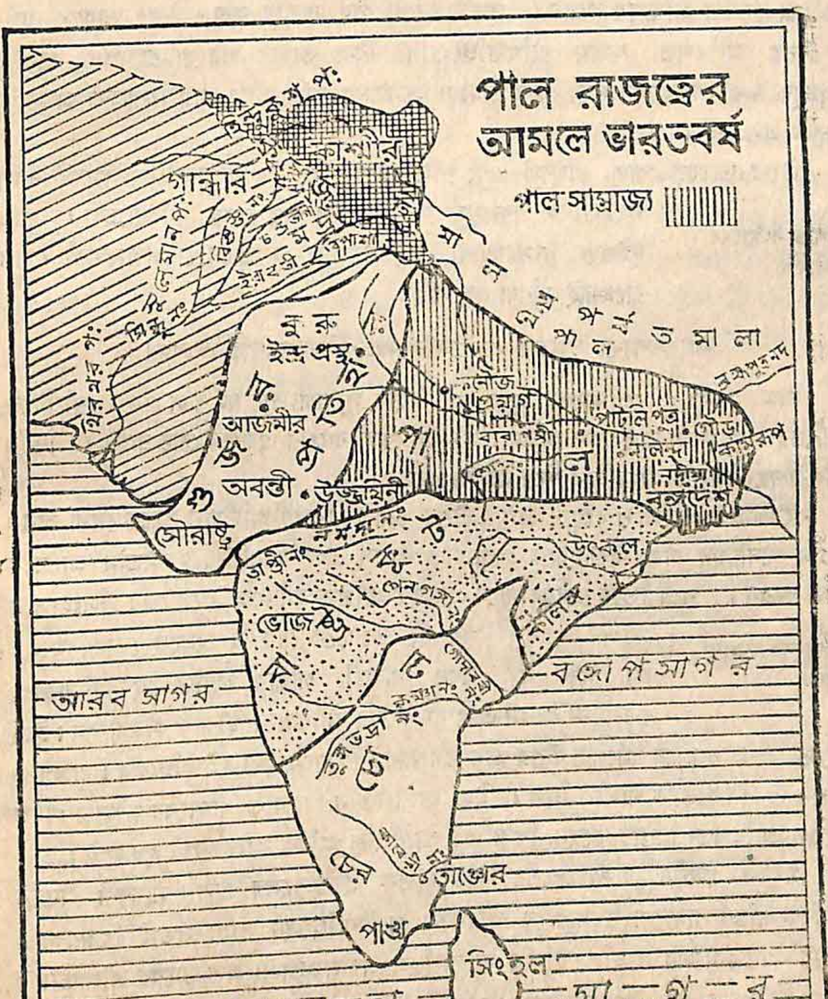
গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ধর্মপাল রাজা হন। তিনি পালরাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যের স্তরে উন্নীত করেন। তাঁহার সময় হইতে কনৌজে প্রভুত্ব লাভের ত্রিশক্তি সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

ত্রিশক্তি সংগ্রাম। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। ঐ সব রাজ্যের রাজারা কনৌজ অধিকার লইয়া যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। সংক্ষেপে কনৌজ ছিল উত্তর ভারতের রাজনৈতিক শক্তির প্রাণকেন্দ্র। প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট এবং পালরাজারা কনৌজ লাভের জন্য এক ত্রিপাক্ষিক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ফলে গুর্জর-প্রতিহার-পাল

ত্রিশক্তি সংগ্রাম কাহাকে বলে?

রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল ঘটনায় পরিণত হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল লক্ষ্য ছিল উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন করা। একই সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ, রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহারগণ এবং বাংলার পালরাজগণ উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট হইয়াছিল বলিয়া ত্রিশক্তি সংগ্রামের সূত্রপাত হয়।

সর্বপ্রথম ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলে প্রতিহার বংশীয় বৎসরাজের হস্তে পরাজিত হন। কিন্তু অনতিকালের মধ্যে বৎসরাজ নিজেই রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের হস্তে দারুণভাবে পরাজিত হন। ধ্রুব নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গেলে ধর্মপাল



এই সুযোগে কনৌজ অধিকার করেন। ইহার কিছুদিন পর প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া পুনরায় কনৌজ দখল করেন। ঠিক এই সময় রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। তিনি নাগভট্টকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। তিনি উত্তর ভারতে বেশীদিন থাকিতে পারেন নাই। নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিহারগণ পুনরায় উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন। ৯১২ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হন। তিনি প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। তৃতীয় ইন্দ্রের পর তৃতীয় কৃষ্ণও উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকূটদের আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর প্রতিহারগণ কনৌজ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহারা কনৌজের পূর্ব গৌরব আর ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হন নাই।

পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূটদের উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার

উত্তর ভারতে পাল, রাষ্ট্রকূট এবং প্রতিহারদের ত্রিশক্তি সংগ্রাম তিনপক্ষকেই দুর্বল করিয়াছিল এবং মুসলমান বিজয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। প্রায় দুইশত বৎসরব্যাপী এই ত্রিশক্তি সংগ্রামে যোগদানকারী কোন রাজ্যেরই সুবিধা হয় নাই।

ত্রিশক্তি সংগ্রামের ফলাফল

বাংলার পাল ও সেনবংশীয় নৃপতিগণ

ধর্মপাল। গোপালের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র ধর্মপাল ৭৭০ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পাল বংশের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি পালরাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যের স্তরে উন্নীত করেন।

কয়েকটি শিলালিপি হইতে তাঁহার উত্তর ভারত বিজয় অভিযান সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করেন এবং কনৌজের সার্বভৌম অধিকার লাভ করেন। পরে তিনি চক্রায়ুধ নামে একজন আশ্রিত ব্যক্তিকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। খুব সম্ভবতঃ চক্রায়ুধের অভিষেকে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা যোগদান করেন এবং ধর্মপালের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লন। ইহা হইতে বোঝা যায় যে ধর্মপাল উত্তর ভারতের সম্রাট হিসাবে গণ্য হইয়াছিলেন। বাংলা ও বিহার তাঁহার প্রত্যক্ষ শাসনে ছিল। ইহা ছাড়া তিনি মালব ও পাঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন, কিন্তু এই আধিপত্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই।

ধর্মপালের সাম্রাজ্য বিস্তার

ধর্মপাল প্রাচীন বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রধান নায়ক। তিনি সামরিক শক্তির সাহায্যে বাংলার যে পরিবর্তন আনিয়াছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়কর। তাঁহার রাজত্বকালের কিছুদিন পূর্বেও বাংলা ছিল অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি। তাঁহার নেতৃত্বে বাঙলা উত্তর ভারতে প্রভূত্ব স্থাপনে সফল হইয়াছিল। ইহা কম কৃতিত্বের কথা নয়। এ কারণে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁহার রাজত্বকালকে বাঙালীর জীবন

প্রভাত বলিয়াছেন। খলিমপুর লিপিতে তাঁহার বাঙলার জনগণের অধিনায়ক হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ধর্মপাল কেবলমাত্র বীর যোদ্ধা ছিলেন না, একজন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট হিসাবেও তাঁহার নাম ছিল। ধর্মপাল বিহারের অন্তর্গত বিক্রমশীলায় একটি বিহার স্থাপন করেন। কালক্রমে ইহা একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তিনি বর্তমান রাজসাহী জেলায় সোমপুরী বিহারটি স্থাপন করেন। পাহাড়পুরে মাটি খুঁড়িয়া এই বিহারের ধ্বংসস্তূপ পাওয়া গিয়াছে। ধর্মপাল বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মপালের শাসনকালে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। পাহাড়পুরের বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে উহা বোঝা যায়। ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মানুরাগী হইলেও তিনি অন্য ধর্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাব পোষণ করিতেন। আনুমানিক ৮১০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ধর্মপালের কৃতিত্ব

দেবপাল। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের আমলে পালরাজাদের গৌরব আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি এক দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। তাঁহার মুঙ্গের লিপি হইতে জানা যায় যে "একদিকে হিমালয় অপরদিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তিচিহ্ন, একদিকে বরুণনিকেতন, অপরদিকে ক্ষীরোদ সমুদ্র—এই বিরাট সাম্রাজ্য তিনি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করিয়াছিলেন।" মুঙ্গের লিপি কল্পনা-প্রসূত হইলেও ইহাতে দেবপাল তথা বাঙালী জাতির অন্তর্নিহিত অখণ্ড ভারত স্থাপনের অভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে। দেবপাল এই অভিলাষ পূরণে সমর্থ না হইলেও ইহার কিছুটা বাস্তবে পরিণত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক তারানাথের মতে, দেবপাল বিন্ধ্য ও হিমালয়ের সমুদয় ভূভাগ বাহুবলে অধিকার করেন। বিভিন্ন প্রাচীন লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি কামরূপ, উড়িষ্যা ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর জয় করেন। কথিত আছে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দেবপালের সহিত মৈত্রী স্থাপনে বাধ্য হন এবং উড়িষ্যার রাজা দেবপালের নাম শুনিয়াই রাজধানী হইতে পলায়ন করেন। দেবপাল কম্বোজ দেশ জয় করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। দেবপাল মালব দেশের হূনদের পরাজিত করেন। বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত দেবপালের বিজয়ী সেনাবাহিনী অগ্রসর হইলে গুর্জর ও রাষ্ট্রকূট নৃপতিদের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধে দেবপাল জয়ী হন এবং এই দুই রাজ্যের রাজা করদানে বাধ্য হন।

দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তার

দেবপাল সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিও প্রভৃতি রাষ্ট্রের নরপতিদের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে সুমাত্রা দ্বীপের রাজা বলিপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন।

দেবপালকেই অনেকে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার সময়েই পাল সাম্রাজ্য ক্ষমতা ও গৌরবে শীর্ষস্থানে উপনীত হয়। পালরাজ্যের খ্যাতি ভারতের বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। আরব দেশীয় পর্যটক সুলেমান লিখিয়াছিলেন যে, দেবপালের সৈন্যবাহিনী প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট-রাজগণের সৈন্যদল অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী ছিল। দেবপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি শিল্প ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক

দেবপালের কৃতিত্ব

ছিলেন। মগধকে তিনি নূতনভাবে তৈয়ারী করেন এবং কয়েকটি বৌদ্ধবিহার নালন্দায় স্থাপন করেন। দেবপাল ৮১০ হইতে ৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পরবর্তী পালরাজগণ। দেবপালের মৃত্যুর পর হইতে পাল বংশের প্রভাব ক্রমে কমিতে থাকে। দেড়শত বৎসরের অধিক সময় ধরিয়া এই পতনের গতি অব্যাহত ছিল। ইহার ফলে পাল সাম্রাজ্যের সীমানা সঙ্কুচিত হয়।

দশম শতকের শেষভাগে পাল রাজ্যের অধিপতি ছিলেন প্রথম মহীপাল। তিনি বিভিন্ন অঞ্চল পুনরূদ্ধার করিয়া পালবংশের গৌরব কিছুটা ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় মহীপাল খুব অত্যাচারী ছিলেন। উত্তরবঙ্গের প্রজারা তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন দিব্যোক। ইনি জাতিতে কৈবর্ত ছিলেন বলিয়া এই বিদ্রোহকে 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' বলা হয়। বরেন্দ্রভূমি বা উত্তরবঙ্গে কৈবর্তগণ স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তোলে।

কৈবর্ত বিদ্রোহ

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর রামপাল পালরাজ্যের রাজা হন। তিনি বরেন্দ্রী রাজ্য আক্রমণ করেন। ভীম তখন বরেন্দ্রী রাজ্যের রাজা। ভীম বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হন। তখন বরেন্দ্রভূমি পাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রামপাল পালরাজ্যের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেকখানি পুনরুদ্ধার করেন। বিক্রমপুর এবং রাঢ়ার শাসনকর্তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। বাংলাদেশের বাহিরেও তিনি কয়েকটি সামরিক অভিযান করিয়াছিলেন। কথিত আছে অঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ এবং কামরূপের রাজারা রামপালের প্রভুত্ব মানিয়া লইয়াছিল। রামপাল কেবলমাত্র যোদ্ধাই ছিলেন না, সুশাসক হিসাবেও তাঁহার সুনাম ছিল। তিনি রাজ্যের সর্বত্র শান্তি অটুট রাখিয়াছিলেন। রামপালই পালবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা। তাঁহার পর কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল পালরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা খুবই দুর্বল রাজা ছিলেন। দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে সেন বংশের অধিকার স্থাপিত হয়।

রামপাল

সেন রাজবংশ। পাল বংশের সাম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গদেশে সেন-রাজবংশের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন সামন্তসেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন পালরাজাদের অধীনে সামন্তরাজা ছিলেন। হেমন্তসেনের পর ক্ষমতালাভ করেন বিজয়সেন (১০৯৫-১১৬০ খ্রীঃ)। ইনি ছিলেন সেন রাজবংশের প্রথম স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা। তিনি বাংলাদেশে সেনবংশের প্রাধান্য স্থাপন করেন। রাঢ়, উত্তর এবং পূর্ববঙ্গ ছাড়াও কামরূপ-মিথিলা এবং কলিঙ্গ রাজাদেরও তিনি পরাজিত করিয়াছিলেন। এইভাবে বিজয়সেন বাংলার বাহিরেও তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। দেওপাড়া লিপিতে তাঁহার রাজ্যজয়ের কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিজয়সেনের পর রাজা হন তাঁহার পুত্র বল্লালসেন (১১৬৮-১১৭৯ খ্রীঃ)। কথিত আছে তিনি মগধ এবং মিথিলা জয় করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত

ছিল—রাঢ়া, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা। জনশ্রুতি আছে যে তিনি রাঢ়াদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রচলন করেন। বল্লালসেন সুপণ্ডিতও ছিলেন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেন। এগুলি হইল যথাক্রমে ব্রতসাগর, আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর। শেষ গ্রন্থটি তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন বইখানি সম্পূর্ণ করেন।

বল্লালসেন

লক্ষ্মণসেন (১১৭৯-১২০৫ খ্রীঃ) ছিলেন সেনবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি রণনিপুণ ছিলেন। তিনি বাঙলার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বিভিন্ন দিকে সময় অভিযান পাঠান। তাঁহার সময় বাঙলা উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তিনি কামরূপ, গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী, মগধ প্রভৃতি জয় করেন এবং চেদী ও ম্লেচ্ছ রাজাকে পরাজিত করেন। তিনি কাণ্ডীর রাজা জয়চন্দ্রকেও পরাজিত করেন। বারাণসী ও প্রয়াগে তিনি দুইটি জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তাঁহার আর একটি জয়স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে পুরীধামে।

লক্ষ্মণসেন পরম বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন। জয়দেব, ধোয়ী, হলায়ুধ, শ্রীধরদাস প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকরা তাঁহার রাজত্বকালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের শেষ জীবন শান্তিতে কাটে নাই। তিনি যখন রাজধানী নদীয়ায় বাস করিতেছিলেন এমন সময় সংবাদ আসে যে তুর্কীবাহিনী হঠাৎ রাজধানী আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই বাহিনীতে কত সৈন্য ছিল তাহা জানিবার পূর্বেই বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন রাজধানী ছাড়িয়া নদীপথে পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অবশ্য তিনি পূর্ববঙ্গে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস

বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলকে আর্যাবর্ত ও দক্ষিণে অবস্থিত অঞ্চলকে দাক্ষিণাত্য বলা হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিতে এ পর্যন্ত উত্তর ভারতের ইতিহাসই আমরা আলোচনা করিয়াছি। অবশ্য সাতবাহন বংশের ইতিহাস পড়িবার সময় আমরা দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে কিছুটা জানিয়াছি। সাতবাহন সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পর বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাজবংশের উদ্ভব ঘটে। এই রাজবংশগুলি তাহাদের কার্যকলাপ কেবলমাত্র দক্ষিণ ভারতেই সীমাবদ্ধ রাখে নাই, উত্তর ভারতেও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই রাজবংশগুলির মধ্যে চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পল্লব এবং চোল বংশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার মত।

দক্ষিণ ভারত রাজনৈতিক অবস্থা

বাদামীর চালুক্য বংশ। গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে যখন উত্তর ভারতে শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন, যশোবর্মন প্রমুখ রাজারা সার্বভৌম আধিপত্য স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রে চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। চালুক্যরা নিজেদের মনু বা চন্দ্রদেবের প্রত্যক্ষ বংশোদ্ভব বলিয়া দাবি করিত। কিন্তু আসলে চালুক্যরা ছিল স্থানীয় বংশোদ্ভূত। কথিত আছে (৫৪৩-৫৪৪ খ্রীস্টাব্দ)

উৎপত্তি

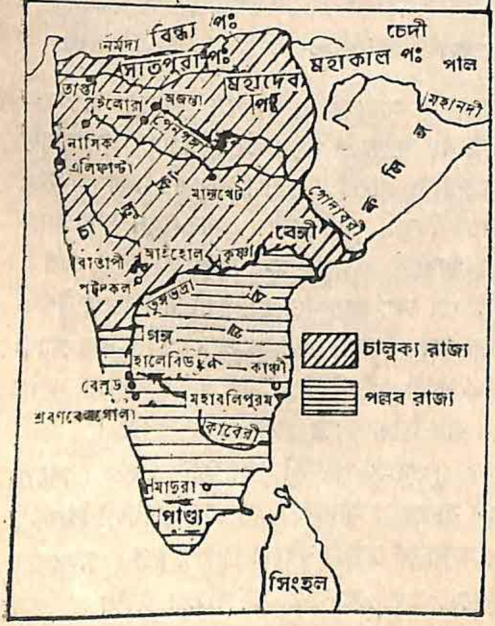
পুলকেশী নামে এক রাজপুত ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি কোন এক সময়ে বাতাপিতে (বর্তমান বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাদামী) এক রাজ্য স্থাপন করেন। পরে বেঙ্গী ও কল্যাণে চালুক্য বংশের দুইটি শাখা রাজত্ব করিয়াছিল।

প্রথম পুলকেশীর রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় তিনি একটি রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। প্রথম পুলকেশীর পুত্র কীর্তিবর্মন কোঙ্কন অঞ্চল চালুক্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে গোয়া বন্দরটি চালুক্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে চালুক্য রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম হয়। কীর্তিবর্মনের পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী ৬০৯ খ্রীস্টাব্দে চালুক্য রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি হইলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ৬৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন একজন দিগ্বিজয়ী রাজা। দ্বিতীয় পুলকেশীর অনুগ্রহভাজন রবিকীর্তি নামক জনৈক জৈন কবি কর্তৃক রচিত আইহোল শিলালিপিতে দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। এই শিলালিপিটি আইহোল প্রশস্তি নামেও পরিচিত। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তারে বাধা প্রদান করা। কথিত আছে নর্মদা নদীর তীরে এই যুদ্ধ (৬২০ খ্রীঃ) হয় এবং যুদ্ধে পুলকেশী জয়ী হন। হর্ষবর্ধনের বহু রণ-হস্তী তিনি হস্তগত করেন। ইহার পর তিনি পূর্বাঞ্চলে রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট হন। দক্ষিণ কোশল, কলিঙ্গ, পিষ্টপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলি তিনি তাঁহার সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন। পল্লবদের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের সূচনা তাঁহার রাজত্বকালে হইয়াছিল। দ্বিতীয় পুলকেশী বেঙ্গীর উপর পল্লবদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধা দেন। তিনি পল্লব রাজধানী কাঞ্চীপুরমের নিকটবর্তী পল্ললুর পর্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন পরাজিত হন এবং তাঁহার রাজ্যের উত্তরাংশ পুলকেশীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় পুলকেশী

দ্বিতীয় পুলকেশী

হর্ষবর্ধনের সহিত সংঘর্ষ

চালুক্য ও পল্লব রাজ্য



তাঁহার ভ্রাতা বিষ্ণুবর্ধনকে অন্ধ্রদেশের (কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) বিজিত অঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন (৬৩১ খ্রীঃ) এবং এই সময় হইতেই বেঙ্গীর পূর্বাংশে চালুক্য বংশের শাসন শুরু হয়। দ্বিতীয় পুলকেশী পারস্য সম্রাটের সহিত দূত বিনিময় করিয়াছিলেন। অজন্তা গুহায় একখানি প্রাচীন চিত্রে ইহা অঙ্কিত আছে। হিউয়েন সাঙ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন এবং পুলকেশীর বীরত্ব ও গুণাবলীর প্রশংসা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই বিখ্যাত রাজা পল্লব বংশীয় রাজা নরসিংহবর্মনের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন (৬৪২ খ্রীঃ)।

পল্লব-চালুক্য সংগ্রামের সূত্রপাত

দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর বাদামীর চালুক্য বংশ সামরিক দিক দিয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু পুলকেশীর এক পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য সত্যশ্রেয় এই বংশের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি পল্লবদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যান এবং পল্লবদের কবল হইতে হারান রাজ্য ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। তাঁহার দুই উত্তরাধিকারী প্রথম বিনয়াদিত্য ও বিজয়াদিত্য শক্তিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহাদের পর সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। তিনি এই বংশের শেষ পরাক্রান্ত রাজা। তিনি পল্লব রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন। চোল, পাণ্ড্য ও মালাবার অঞ্চল তিনি দখল করেন। সিন্ধুর আরবরা লাট (গুজরাটের দক্ষিণাঞ্চল) আক্রমণ করিলে তাহাদের হটাইয়া দেন এবং এইভাবে দক্ষিণ ভারতকে আরবদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাদামীর চালুক্য বংশের পতন ঘটে। রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজা দন্তিদুর্গ শেষ চালুক্য রাজাকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

বেঙ্গীর চালুক্য বংশ। দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর বিষ্ণুবর্ধন বেঙ্গীতে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার বংশধরগণ পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া এই অঞ্চল শাসন করিয়াছিলেন। ইহারা পূর্ব-চালুক্য নামে পরিচিত। একাদশ শতাব্দীতে চোল-রাজারা বেঙ্গী দখল করেন। এবং পূর্ব চালুক্য বংশের সহিত চোল বংশের বৈবাহিক সূত্রে মিলন ঘটে। তাহার ফলে চোলদের ঐশ্বর্যের সঙ্গে পূর্ব-চালুক্যদের ঐশ্বর্য যুক্ত হয় এবং চোল বংশীয় রাজার বদলে চালুক্য-চোল রাজবংশ চোল সাম্রাজ্য শাসন করিতে থাকে।

কল্যাণের চালুক্য বংশ। খ্রীস্টীয় দশম শতকের শেষভাগে বাদামী বা বাতাপীর চালুক্য বংশের বংশধর দ্বিতীয় তৈলপ বর্তমান অন্ধ্র রাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাষ্ট্রকূট ও পরমার রাজগণকে পরাজিত করিয়া নিজের রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। পরে তিনি কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সীমান্তের আধিপত্য লইয়া চোল রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ বহুদিন চলিয়াছিল। শেষে চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য চোলদের পরাজিত করেন। তিনিই কল্যাণের চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ১০৭৬ হইতে ১১২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং চালুক্য—বিক্রমাদিত্য অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। প্রসিদ্ধ কবি বিহ্লন এবং স্মৃতি-

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

শাস্ত্রবিদ বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। তিনি নিজেই মহাপণ্ডিত ছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিচারব্যবস্থা, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা, অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সিংহলের রাজার সহিত তাঁহার দূত বিনিময় হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই বংশের পতন ঘটে এবং দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি ও বরঙ্গল নামে দুইটি নূতন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

রাষ্ট্রকূট বংশ। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দুইশত বৎসর অধিককাল দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজগণ এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। রাষ্ট্রকূটগণ উত্তর ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

উৎপত্তি—বিভিন্ন মত

এই বংশের উৎপত্তি লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। রাষ্ট্রকূটগণ কিন্তু নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের অনুচর যাদব বংশীয় সাত্যকির বংশধর বলিয়া গর্ববোধ করিত। কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক রাষ্ট্রকূটদের তেলেগু রেড্ডিদের বংশধর, আবার কিছু সংখ্যক তাঁহাদের ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের নামানুসারে তাহাদের শাসিত অঞ্চলের নাম মহারাষ্ট্র হইয়াছে বলিয়া এইসব ঐতিহাসিক মনে করেন সুতরাং রাষ্ট্রকূটদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা শক্ত।

রাষ্ট্রকূট রাজাদের মধ্যে ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ, অমোঘবর্ষ, তৃতীয় ইন্দ্র এবং তৃতীয় কৃষ্ণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা প্রত্যেকেই বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং প্রত্যেকেই

উল্লেখযোগ্য নৃপতিগণ

বাহুবলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশ্য উত্তর ভারতে তাঁহারা কখনো স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হন নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিহার ও পালরাজাদের বিপর্যস্ত করাই ছিল তাঁহাদের উত্তর ভারত আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের পল্লব, চোল, কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের তাঁহারা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের দন্তিবর্মন, প্রথম ইন্দ্র, প্রথম গোবিন্দ প্রভৃতি রাজাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। মনে হয় তাঁহারা সামন্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহারা কোথায় রাজত্ব করিতেন তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না। রাষ্ট্রকূট বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন

দন্তিদুর্গ

দন্তিদুর্গ। তিনি কলিঙ্গ, কোশল, কাঞ্চি, মালব, দক্ষিণ গুজরাট এবং টঙ্ক রাজ্য জয় করিয়া উজ্জয়িনীতে 'হিরণ্যগর্ভ' অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তিনি চালুক্য রাজাকেও পরাজিত করেন এবং আরবদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি 'পৃথ্বীবল্লভ' উপাধি গ্রহণ করেন। পরিশেষে তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে পরাজিত করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্রের অধীশ্বর হন। রাষ্ট্রকূট রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রথমে নাসিকে, পরে শোলাপুরের নিকটে মানখেট্র বা মান্যক্ষেত্র নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা ধ্রুবের (৭৮৯-৯৪) আমল হইতে রাষ্ট্রকূটদের প্রতিপত্তি দক্ষিণ ভারতের সীমা ছাড়াইয়া উত্তর ভারতে বিস্তৃত হয়। তিনি প্রতিহার বংশীয় বৎস-রাজকে পরাজিত করেন এবং বঙ্গদেশের রাজা ধর্মপালও তাঁহার নিকট পরাজিত হন। উত্তর ভারতে তিনি অবশ্য বেশীদিন অবস্থান করেন নাই। নিজ রাজ্যে

প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি বেঙ্গির চালুক্যরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেন।

ধ্রুবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ (৭০৫—৮১৫ খ্রীঃ) রাষ্ট্রকূট রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁহাকে এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলা হয়। তাঁহার রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটরা সর্বাধিক প্রতিপত্তি লাভ করে। তিনি উত্তর ভারতে দিগ্বিজয়ে বাহির হন এবং মালব দেশ অধিকার করেন। আরও উত্তরে অগ্রসর হইলে কনৌজের রাজা চক্রায়ুধ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। পাল সম্রাট ধর্মপালও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে বেশীদিন থাকেন নাই। তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিয়াই পল্লব রাজ্য আক্রমণ করিয়া পল্লবরাজ দন্তীবর্মনকে পরাজিত করেন। রাজধানী কাঞ্চীতে তিনি সসৈন্যে প্রবেশ করেন। সেখানে সিংহলের রাজা দূতের মাধ্যমে তাঁহার বশ্যতা স্বীকারের কথা জানাইয়া দেন। বেঙ্গীর রাজা চালুক্য বংশীয় দ্বিতীয় নরেন্দ্রম্রিগরাজ গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করেন।

তৃতীয় গোবিন্দ

তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অমোঘবর্ষ রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি দীর্ঘ ৬৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথমদিকে তাঁহাকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের সামন্তগণ বিদ্রোহ করে। তিনি কঠোরহস্তে তাহা দমন করেন। তিনি ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গীর চালুক্যরাজকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। তিনি প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজের দাক্ষিণাত্যে অভিযান প্রতিহত করিয়াছিলেন। তবে তিনি যুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি বেশী অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া রাজধানীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় নানা মূল্যবান গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল। জৈন পণ্ডিত জীনসেন রচিত 'পার্শ্ব অভ্যুদয়' তাহার মধ্যে অন্যতম। অমোঘবর্ষ নিজে ছিলেন সুসাহিত্যিক। তাঁহার রচিত 'রত্নমালিকা' ও 'কবিরাজমার্গ' উল্লেখ করিবার মত। তিনি জৈনধর্মের প্রতি বেশি অনুরাগী ছিলেন। আরব পর্যটক সুলেমান তাঁহার বিবরণে অমোঘবর্ষকে পৃথিবীর চারিজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের মধ্যে অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অপর তিনজন হইলেন চীনের সম্রাট, বাগদাদের খলিফা ও কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট।

অমোঘবর্ষ

অমোঘবর্ষের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ রাজা হন। তাঁহার পরবর্তী রাজা তৃতীয় ইন্দ্র প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রতিহাররাজ প্রথম মহীপালকে পরাজিত করেন ও কনৌজ অধিকার করেন। এই সময় তৃতীয় ইন্দ্র ছিলেন তাঁহার সময়কার সবচেয়ে পরাক্রান্ত নরপতি। সমসাময়িক ভারত পর্যটক অল্ মসূদী লিখিয়াছেন রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র ছিলেন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি।

তৃতীয় ইন্দ্র

তৃতীয় ইন্দ্রের পুত্র তৃতীয় কৃষ্ণ ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ শক্তিশালী রাজা। তিনি মালবের পরমার এবং বেঙ্গীর চালুক্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাঞ্জোরের চোল

রাজাদের বিরুদ্ধেও তিনি অভিযান প্রেরণ করেন। এই চোলেরা কাঞ্চীর পল্লবদের উৎখাত করিয়াছিল। ৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় কৃষ্ণ চোলরাজ প্রথম পরান্তককে পরাজিত করিয়া চোলরাজ্যের উত্তরাংশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তারপর তিনি রামেশ্বরম্ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং সেখানে একটি বিজয়স্তম্ভ ও একটি মন্দির স্থাপন করেন।

তৃতীয় কৃষ্ণ

তৃতীয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট বংশের পতন শুরু হয়। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ দেখা দেয়। মালবের পরমারগণ এই সুযোগে রাষ্ট্রকূট রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া লুণ্ঠন করে। রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের সামন্তগণও নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে। এই সুযোগে দশম শতকের শেষভাগে চালুক্য বংশীয় তৈলপ শেষ রাষ্ট্রকূট রাজাকে পরাজিত করিয়া কল্যাণে চালুক্য বংশের প্রাধান্য স্থাপন করেন।

রাষ্ট্রকূটদের পতন

দুইশত বৎসরের অধিককাল রাষ্ট্রকূট বংশ দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে সার্বভৌম রাজশক্তি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। উত্তর ভারত পর্যন্ত তাহাদের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাহাদের রাজ্যে অভাবনীয় উন্নতি ঘটিয়াছিল। আরবদের সহিত তাঁহাদের বাণিজ্য সম্পর্ক নিবিড় ছিল। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

সুদূর দক্ষিণ ভারত

কাঞ্চীর পল্লব বংশ। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী নগরীকে কেন্দ্র করিয়া পল্লবগণ এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেন। পল্লবদের বংশ-পরিচয় আজও রহস্যাবৃত। কেহ বলেন পল্লবরা পারস্যের পহ্লব জাতির বংশধর, কেহ বলেন পল্লবরা ব্রাহ্মণ্যধর্মী বাকাটক বংশের শাখা, কেহ বলেন তাঁহারা ছিলেন সাতবাহনদের সামন্ত, আবার কেহ বলেন তাঁহারা দক্ষিণ ভারতের কুরুম্ব জাতির সমগোত্রীয়। সুতরাং পল্লবদের উদ্ভব এখনও অন্ধকারাচ্ছন্নই রহিয়াছে।

উৎপত্তি

সাতবাহন রাজ্যের পতনের পর পল্লব রাজ্য শক্তিশালী হইয়া উঠে। শিবস্কন্দবর্মণ নামে এক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমদিকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের হাতে পরাজিত হন বলিয়া এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে। ইহার পর বেশ কিছুকাল পল্লবদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পল্লবদের ইতিহাসে মহাপল্লব যুগ শুরু হয় সিংহবিষ্ণুর রাজত্বকাল হইতে। ৬০০ বা ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্ব শেষ হইয়াছিল। তিনি সত্য, ত্যাগ, বিনয় এবং ক্ষাত্রতেজের প্রতিমূর্তি ছিলেন বলিয়া বিভিন্ন লিপি বা পট্টে উল্লেখ আছে। কথিত আছে তিনি চোল, পাণ্ড্য, মালব, সিংহল ও কেরলের রাজগণকে পরাজিত করেন। সিংহবিষ্ণুর রাজত্বকালেই বাদামির চালুক্যরাজ্যের উত্থান ঘটে। সিংহবিষ্ণুর সহিত চালুক্যরাজ মঙ্গলেশের সম্পর্ক ভাল ছিল না। দুইটি রাজ্যের আগ্রাসী নীতিই ইহার কারণ ছিল।

সিংহবিষ্ণু

সিংহবিষ্ণুর পরে তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রবর্মন রাজা হন। রাজা মহেন্দ্রবর্মণ (৬১০-৬৩০ খ্রীঃ) পল্লব বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার সময় হইতেই চালুক্য-পল্লব সংগ্রাম শুরু হয়। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হন। তিনি কেবলমাত্র একজন শক্তিশালী রাজাই ছিলেন না, তিনি নিজে একজন সুলেখক ছিলেন এবং তাঁহার রচিত 'মত্তবিলাস প্রহসন' একটি উচ্চশ্রেণীর তামিল নাটক। তিনি প্রথম জীবনে জৈন ছিলেন, কিন্তু পরে শিবের উপাসক হন।

মহেন্দ্রবর্মণ

মহেন্দ্রবর্মণের পর নরসিংহবর্মণ, দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মণ, প্রথম পরমেশ্বরবর্মণ, দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ (৬৩০-৬৬৮ খ্রীঃ) কাঞ্চীর সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ একজন কৃতী রাজা ছিলেন। তিনিই এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি বাহুবলে দক্ষিণে চোল, কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি তামিল রাজ্য এবং সিংহলের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরদিকে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তাঁহার রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল পল্লব ইতিহাসে এক অতি উজ্জ্বল অধ্যায়। শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম ও বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপনে তাঁহার রাজত্বকাল স্মরণীয় হইয়া আছে। তিনি চীনের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে শৈবধর্মের বিশেষ অগ্রগতি ঘটে। কৈলাসনাথ মন্দির, মহাবলিপুরমের মন্দির ইহার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। পরম শৈব হইলেও তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না। নেগপত্তমে তিনি একটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন। দক্ষিণ ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের চরম বিকাশ তাঁহার আমলেই ঘটিয়াছিল। নরসিংহবর্মণের পর হইতেই পল্লবদের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং নবম শতাব্দীতে তাহাদের আধিপত্য একেবারে লোপ পায়। পল্লবদের শেষ চিহ্ন মুছিয়া দেয় পাণ্ড্য ও চোল শক্তি। চোলরাজ আদিত্য ৮৯১ খ্রীস্টাব্দে পল্লব বংশের শেষ রাজা অপরাজিতকে পরাজিত করিয়া পল্লব রাজ্য চোল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মণ

পল্লব-চালুক্য সংঘর্ষ। দক্ষিণ ভারতের (৬০০-৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) দুই শত বৎসরের ইতিহাসের মূল কথা হইল পল্লব ও বাদামীর চালুক্যদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ। ইহা রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই ছিল। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যবর্তী অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনে উভয় রাজ্যই সচেষ্ট হয়। তাহা ছাড়া গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর উপর উভয় রাজ্য পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপের মাঝখানে অবস্থিত বেঙ্গী দখল করিতে উভয় রাজাই চেষ্টা করে। ইহার জন্যই এই সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। কোন এক রাজার মৃত্যুতে এই সংঘর্ষের অবসান হয় নাই, কারণ ব্যক্তিগত রেষারেষির জন্য এই বিরোধের উৎপত্তি ঘটে নাই। অর্থনৈতিক স্বার্থই ছিল এই সংগ্রামের মূলে। এই সংঘর্ষ শুরু করিয়াছিল বাদামীর চালুক্যরা। দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবদের নিকট

সংঘর্ষের কারণ

হইতে কৃষ্ণা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটি কাড়িয়া লন। এই অঞ্চলই বেঙ্গী রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যরা এখানে রাজ্য স্থাপন করে। তাহারা প্রায় পাঁচশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। পল্লবরাজ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের নিকট দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত হন (৬৪২ খ্রীঃ)। নরসিংহবর্মণ বাদামী অধিকার করেন এবং 'বাদামীকুণ্ড' বা 'বাদামীবিজেতা' পদবী গ্রহণ করেন। পল্লবরা কতদিন বাদামী অধিকারে রাখিয়াছিল তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। তবে দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন পল্লব-চালুক্য সংঘর্ষ স্তিমিত থাকে। অষ্টম শতকে এই সংঘর্ষ পুনরায় তীব্র হয় এবং কল্যাণীর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৩-৭৪৫ খ্রীঃ) পল্লবদের রাজধানী কাঞ্চী বারবার আক্রমণ করেন। কথিত আছে তিনি ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে পল্লব শক্তি খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু চালুক্যরাও বেশিদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারে নাই। রাষ্ট্রকূটদের হাতে তাহারাও পরাজিত হয়। অতএব চালুক্য-পল্লব সংঘর্ষ দুইটি শক্তিকেই ধ্বংসের কিনারায় লইয়া গিয়াছিল। এই সংঘর্ষের ফলে কেহই লাভবান হয় নাই।

সংঘর্ষের স্বরূপ ও ফলাফল

কাঞ্চীর পল্লবরা ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সময়ে হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটে এবং বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের উন্নতি দেখা যায়। অবশ্য অন্যান্য ধর্মেরও প্রসার ঘটিয়াছিল। পল্লবদের সময়ে উচ্চশিক্ষার বিশেষ উন্নতি ঘটে। কাঞ্চী ও রাহুল সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। তামিল সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। মহাকবি ভারবি ও বিখ্যাত পণ্ডিত দণ্ডী পল্লব রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন।

পল্লব বংশের কৃতিত্ব

চোল বংশ। পল্লবদের পরে দক্ষিণ ভারতে চোল জাতি পুনরায় পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। চোলরা খুব প্রাচীন জাতি। মৌর্যযুগে সুদূর দক্ষিণে চোল, কেরল ও পাণ্ড্য রাজ্য তিনটিই শক্তিশালী ছিল। বর্তমান তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী লইয়া ছিল চোল রাজ্য। মৌর্যযুগেও চোলরা স্বাধীন ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে চোলদের উল্লেখ রহিয়াছে। জনৈক গ্রীক নাবিকের লেখা পুস্তক 'প্যারিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী' ও টলেমির ভূগোলে চোলদের কথা বর্ণিত আছে। কালক্রমে চোলরাজ্য পাণ্ড্য ও পল্লবদের অবিরাম আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। হিউয়েন-সাঙ যখন দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে যান তখন চোলরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখেন। কিন্তু চোল রাজারা নবম শতকের মাঝামাঝি হইতে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়। চোলবংশের রাজা বিজয়ালয় তাঞ্জোর নগর দখল করিয়া পল্লব রাজাদের অধীনে এক রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র প্রথম আদিত্য (৮৮০-৯০০ খ্রীঃ) শেষ পল্লবরাজাকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন রাজ্যের ভিত্তি রচনা করেন। তিনি পশ্চিম গাঙ্গেয়দেরও পরাজিত করেন। তাঁহার সময়ে চোলরাজ্য উত্তরে মাদ্রাজ হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আদিত্যের পুত্র প্রথম পরন্তক (৯০৭-৯৫৩ খ্রীঃ) পাণ্ড্যরাজ্য অধিকার করিয়া সিংহল আক্রমণ করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। তিনি তাঁহার রাজ্যসীমানা

বিজয়ালয়

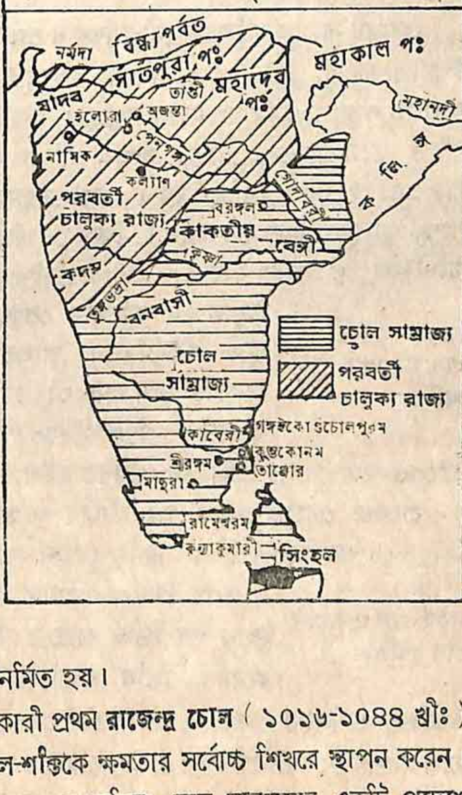
উত্তরে নেলোর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। চোলশক্তির এই দ্রুত প্রসারে রাষ্ট্রকূটরাজারা ভীত হন এবং পরান্তকের রাজত্বের শেষভাগে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ তাঞ্জোর ও কাঞ্চী দখল করিয়া লন। ইহার ফলে চোল শক্তি সামরিক দিক দিয়া হীনবল হইয়া পড়ে।

প্রথম পরন্তক

প্রথম রাজরাজই (৯৮৫-১০১৬ খ্রীঃ) চোল বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি এই বংশকে দক্ষিণ ভারতের অধিপতি করিয়া তোলেন। তাঁহার ৩০ বৎসর শাসনকালকে চোল রাজ্যের গঠনকাল বলিয়া মনে করা হয়। তিনি সিংহলের (শ্রীলঙ্কার) রাজধানী অনুরাধাপুর দখল করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সমগ্র সিংহল জয় করা। তাঁহার সিংহল জয়ের ঘটনাকে স্মরণীয় করিবার জন্য নূতন রাজধানী পোলিন্নরুবতে একাধিক পাথরের শিবমন্দির নির্মাণ করেন। উড়িষ্যার গঙ্গ রাজ্যের উপরও তিনি তাঁহার অধিকার স্থাপন করেন। তিনি কল্যাণের চালুক্য ও বেঙ্গীর চালুক্যদের সহিত যুদ্ধ করেন। বেঙ্গীর চালুক্যরাজ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে, তিনি কলিঙ্গরাজ্যটিও তাঁহার অধিকারে আনয়ন করেন।

প্রথম রাজরাজ

চোল সাম্রাজ্য ও পরবর্তী চালুক্য রাজ্য



তাঁহার শেষ উল্লেখযোগ্য সামরিক অভিযান হইল মালদ্বীপ জয়। মালদ্বীপ ছিল আরব বাণিজ্যের কেন্দ্র। সিংহল করোমণ্ডল উপকূল, মালাবার অঞ্চল এবং সবশেষে মালদ্বীপ জয় করিয়া তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান নিজ নিয়ন্ত্রণে আনিতে সক্ষম হন। তিনি কেবলমাত্র বীর যোদ্ধাই ছিলেন না, সাহিত্য ও শিল্পেরও তিনি ছিলেন অকৃত্রিম পৃষ্ঠপোষক। তাঁহার রাজত্বকালেই তাঞ্জোরে বিখ্যাত রাজরাজেশ্বর মন্দির নির্মিত হয়।

রাজরাজের উপযুক্ত পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম **রাজেন্দ্র চোল** (১০১৬-১০৪৪ খ্রীঃ) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি চোল-শক্তিকে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপন করেন। প্রথমেই তিনি সিংহল দ্বীপ সম্পূর্ণভাবে জয় করিয়া চোল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে

পরিণত করেন। পঞ্চাশ বৎসরের অধিককাল শ্রীলঙ্কা চোল সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। ইহার ফলেই শ্রীলঙ্কার বর্তমান জনসংখ্যার একটি অংশ তামিল রহিয়া গিয়াছে। ইহার পর রাজেন্দ্র দিগ্বিজয়ে বাহির হন এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনী পরপর পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য জয় করেন। তিনি পাণ্ড্য এবং কেরল রাজ্য দুইটি একত্রিত করিয়া একটি প্রদেশে পরিণত করেন। মাদুরা হইল এই নূতন প্রদেশের রাজধানী। একজন রাজকুমার এই প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ইহার পর পশ্চিম চালুক্যদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তিনি বেঙ্গি দখল করেন কিন্তু সমগ্র পশ্চিম চালুক্য রাজ্য দখল না করিয়া কলিঙ্গের পূর্ব গঙ্গ বংশীয় শাসকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কলিঙ্গ অতিক্রম করিয়া তিনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। চোল সেনাবাহিনী গঙ্গা নদী অতিক্রম করিয়া বাংলার পালরাজ মহীপাল, পূর্ব বাংলায় গোবিন্দচন্দ্র এবং দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় রণশূরকে পরাজিত করে। ১০২২ খ্রীস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। তবে উত্তর ভারতে তিনি আধিপত্য বজায় রাখেন নাই। গঙ্গার তটভূমি পর্যন্ত তাঁহার বিজয় অভিযান চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি 'গঙ্গাইকোণ্ড' উপাধি গ্রহণ করেন এবং ত্রিচিনপল্লীতে 'গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম' নামে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

রাজেন্দ্র চোল

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান প্রথম রাজেন্দ্রের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, জাভা এবং অন্যান্য দ্বীপগুলি এই সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই সাম্রাজ্য ভারত ও চীনের মধ্যে সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণ করিত। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের সহিত চোল রাজাদের প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ইতিমধ্যে চীনের সহিত চোল সাম্রাজ্যের সম্পর্কও নিবিড় হয়। রাজেন্দ্র-চোল চীনের সহিত সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য সমুদ্রপথে চীনের সহিত বহির্বাণিজ্যিক পথ নিয়ন্ত্রণ করিত। এই কারণেই বোধ হয় রাজেন্দ্র চোল শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এই নৌ-অভিযান সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল। রাজেন্দ্র চোল মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার কয়েকটি স্থান জয় করেন। এই নৌ-অভিযানের সাফল্য চোল-রাজ্যকে সামুদ্রিক শক্তিতে পরিণত করিয়াছিল। স্বল্পকালের জন্য হইলেও বঙ্গোপসাগর চোল হ্রদে পরিণত হইয়াছিল।

ভারতের বাহিরে চোল সাম্রাজ্যের আধিপত্য

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র প্রথম রাজাধিরাজ (১০৪৪-১০৫২ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন কৃতী শাসক ছিলেন। পাণ্ড্য, কেরল ও সিংহলে যে-সব বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল তাহা তিনি দমন করেন। ইহার পর তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাঁহার বিজয়-উৎসব শেষ করেন। তিনি কল্যাণের চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। ১০৫২ খ্রীস্টাব্দে কোপ্পাম নামক স্থানে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। চোল বংশের শেষ প্রসিদ্ধ রাজা প্রথম কুলোত্তুঙ্গ (১০৭০-১১২২ খ্রীঃ) চোল এবং বেঙ্গী রাজ্যের সংযুক্তি ঘটান এবং পাণ্ড্য ও কেরলে বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি মালবের

রাজাধিরাজ ও অন্যান্য চোল নৃপতিগণ

পরমারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং দুই কলিংগ রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁহার সময়েই হোয়সলরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকাল চোল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। তিনি রাজ্যজয়ের অপেক্ষা তাঁহার রাজ্যে সুশাসন প্রবর্তনে অধিক আগ্রহী ছিলেন। তিনি চীন ও শ্রীবিজয় রাজ্যের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। চীনদেশে তিনি বাণিজ্য প্রতিনিধিও পাঠান।

প্রথম কুলোত্তুঙ্গের মৃত্যুর পরও চোল বংশের আটজন রাজা প্রায় দেড়শত বৎসরের বেশি সময় চোল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। চোল বংশের শেষ রাজা তৃতীয় রাজেন্দ্র পাণ্ড্যরাজ কুলশেখরের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন এবং চোল রাজ্য পাণ্ড্য সাম্রাজ্যের সহিত মিশিয়া যায়। তবে আজও চোলমণ্ডল বা কোরমণ্ডল নামটি চোলদের কথাই স্মরণ করায়। তাহাদের নামানুসারেই ইহার নাম হইয়াছে কোরমণ্ডল।

চোল শাসনের বৈশিষ্ট্য

কেন্দ্রীয় শাসনে রাজাই প্রধান ছিলেন। রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যাপারে তিনি নজর রাখতেন। রাষ্ট্রের প্রধান আয় ছিল ভূমিরাজস্ব। দেশে সমস্ত জমি জরিপ করিয়া কর বসান হইত। সমগ্র চোল সাম্রাজ্য বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। যেমন মণ্ডলম, বলনাডু, নাড্ড ইত্যাদি। চোল শিলালিপি ও তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে গ্রামে পঞ্চায়েত প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর জনপরিষদ ছিল চোলদের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। প্রাদেশিক জনপরিষদ, জেলা এবং গ্রামগুলি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের পরিষদগুলি ছিল দুই রকমের 'উর' এবং 'সভা'। জমির মালিকরাই উর-এর বৈঠকে যোগ দিতে পারিত। সভাই ভূমিকর আদায় করিত। ছোট ছোট ফৌজদারী মামলার বিচার এবং প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব সভার উপর দেওয়া হইয়াছিল। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ-এর মতে শাসন-পদ্ধতি খুবই সুচিন্তিত ও যুক্তিসঙ্গত রূপেই কার্যকর ছিল।

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এই পাঁচশত বৎসরের ইতিহাস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই সুদীর্ঘ কালে ভারতে মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের ন্যায় বৃহৎ রাজ্যের উদ্ভব ঘটে নাই। তাহার পরিবর্তে ছোট ছোট রাজ্যের রাজাদের মধ্যে রেষারেষি ও প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং তাহার পরিণতিতে রাজনৈতিক অস্থিরতাই সমগ্র দেশে দেখা দিয়াছিল।

রাজনৈতিক অবস্থা

ভারতে তখন কয়েকটি মাঝারি ও ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। এইসব রাজ্যগুলি পরস্পরের হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না সত্য, তবে প্রত্যেক রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। যেমন পাল-সেন শাসনাধীনে বঙ্গদেশ, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পল্লব, চোল ও গঙ্গদের শাসনাধীনে দাক্ষিণাত্য ও সুদূর দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চল এবং উত্তর ভারতে চন্দেল্লদের নেতৃত্বে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল। এই অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। তবে সমাজ ও সংস্কৃতিতে স্বকীয়তা থাকিলেও অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে একটি অঞ্চলের সহিত অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব

ভারতীয় সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব পড়িয়াছিল। তবে ইউরোপে সামন্ততন্ত্রে যেমন 'নাইট' বা যোদ্ধৃশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, ভারতে তাহা ঘটে নাই। ভারতে ম্যানোরিয়াল প্রথারও উদ্ভব ঘটে নাই।

অর্থনৈতিক অবস্থা

এই যুগে শিল্পকারিগরগণ শিল্পকর্মের ও জীবিকার উপযোগী নিজেদের যন্ত্রপাতির অধিকারী ছিল এবং কৃষকেরা নিজ নিজ লাঙল ও বলদ লইয়া চাষ-আবাদ করিত। কৃষকেরা জমি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিত। তাহারা ভূমিদাস ছিল না।

ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা

সপ্তম শতাব্দী হইতে উত্তর ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতি ঘটিতে থাকে। দক্ষিণ ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য অবশ্য বিশেষ কমে নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ায় শহরগুলির দৈন্যদশা শুরু হয়; লোকসংখ্যাও হ্রাস পাইতে থাকে। উত্তর ভারতের বহু শহর এই সময় ধ্বংস হইয়া যায়।

এই যুগে ভারত উপমহাদেশে বেশ কয়েকটি বিশেষত্ব দেখা দিয়াছিল যাহাকে 'জাতীয়' বলা না গেলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলা যায়। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে, সমসাময়িক বৌদ্ধ, জৈন গ্রন্থাবলীতে ও সংস্কৃত সাহিত্যে এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। এই বিশেষত্ব বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভাষায়

প্রকাশিত হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দী হইতেই বাংলা, অসমীয়া, মৈথিলী ও হিন্দী ভাষার সূচনা হয়। গুজরাটী ও রাজস্থানী ভাষারও শুরু এই সময় হইতে। ভাস্কর্য ও মন্দির নির্মাণেও এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতে ইহা বিশেষভাবে দেখা দেয়। সমগ্র দেশে একই দেবদেবীর পূজা প্রচলিত থাকিলেও এইসব দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে আঞ্চলিক বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে। এই যুগে জনপ্রিয় উপাস্য দেবতা ছিলেন বিষ্ণু ও শিব। শিবপত্নী—কালী, উমা, পার্বতী, শক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত হইতেন। শিবপত্নীর পূজাও ব্যাপক ছিল। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে বন্দরগুলিতে জৈনধর্মের প্রভাব ব্যাপক ছিল।

আঞ্চলিক ভাষা ও শিল্পরীতির উৎপত্তি

এই যুগে দক্ষিণ ভারতের শহরগুলি কিছুটা স্বাধীন ছিল। নগর পরিষদগুলি শহরের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করিত। ধনী ও বণিকদের প্রতিনিধিরা এইগুলি পরিচালনা করিতেন। বণিক সংঘের ক্ষমতাও এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। এক একটি বণিক সংঘ এক একটি অঞ্চলের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত। আইহোলের বণিক সংঘের প্রভাব দক্ষিণ ভারতের বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। এমনকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বণিকদের বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রও নিয়ন্ত্রণ করিত এই সংঘটি। ৫০০ স্বামী লইয়া ইহার পরিষদ গঠিত ছিল। মনিগ্রামম নামক সংঘটির কেন্দ্র ছিল বর্তমান কেরল রাজ্যে। মিশর, আরব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।

বণিক সংঘগুলির অবদান

পাল ও সেন যুগে বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণে প্রাচীন বাঙলার সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি হইতে বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতি যেমন স্বতন্ত্র তেমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

পাল ও সেনযুগে বাংলায় সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত। ফলে জনসাধারণ নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে তাহাদের সৃজনকর্মে ব্যস্ত থাকিত। পাল ও সেনযুগে অর্থনৈতিক বুনিয়াদও শক্ত ছিল। কৃষির সমৃদ্ধির পাশাপাশি নানারকম শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। এই সময়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্য চলিতে থাকে।

পালরাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙলা ও বিহার অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম শক্তিশালী হয়। অবশ্য এই যুগে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতার প্রভাব দেখা দেয় এবং মুদ্রা, মণ্ডল, ক্রিয়াকাণ্ড, ব্রত, নিয়ম, জপ, মন্ত্র, হোম প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মে স্থানলাভ করে। এই যুগে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহজিয়া এবং বজ্রযান সম্প্রদায়ই প্রধান ছিল। সহজিয়া সম্প্রদায়ের আচার্যদের বলা হইত সিদ্ধাচার্য। পালরাজারা বৌদ্ধধর্মের অনুগামী হইলেও অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহাদের সময় বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্ম লইয়া তেমন বিরোধ ছিল না।

পালযুগে ধর্মীয় জীবন

সেনযুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেন রাজাদের মধ্যে অনেকে শৈব ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেন ছিলেন পরম বৈষ্ণব। এই সময় শৈব ও বৈষ্ণব দুই ধর্মীয়

মতবাদই প্রবল হইয়া উঠে। সেন যুগেও পরমতসহিষ্ণুতা বাঙালী জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। সেনযুগে বর্তমান বাঙালী সমাজের গোড়াপত্তন হয়। সেনরাজারা কোন নূতন ধর্ম স্থাপন করেন নাই, তাঁহারা নূতন সমাজ স্থাপন করেন। এই সমাজে চতুর্বর্ণের আভিজাত্য ভেদ ছিল না। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য জাতিগত ছিল না, ছিল বৃত্তিগত। এই বৃত্তিই ছিল বাঙালী সমাজ বিন্যাসের প্রধান নীতি। বাঙলায় বহুরকমের জাতি ছিল।

সেন যুগে ধর্মীয় ও সমাজ জীবন

পাল ও সেনযুগে বাংলার শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। এই যুগে বাঙলার আধিপত্য বাঙলার বাহিরেও প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র রাজ্যকে ভুক্তি-বিষয়-মণ্ডল-পাটকে বিভক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করা হইত। পাল ও সেন রাজারা নামের পূর্বে 'পরমেশ্বর','পরমভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করিতেন। প্রধান রাজকর্মচারীদের মধ্যে মন্ত্রী, মহামাণ্ডলিক, মহাপ্রতিহার, উপরিক, মহাসন্ধিবিগ্রহিক, মহাকুমারামাত্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভূমি-রাজস্বই সরকারের প্রধান আয় ছিল। উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর হিসাবে লওয়া হইত।

শাসনব্যবস্থা

সন্ধ্যাকর নন্দী, ধোয়ী ও জয়দেব প্রমুখ লেখকদের রচনা এবং সেকালের মূর্তি, ছবি প্রভৃতি হইতে পাল ও সেনযুগের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যায়। লাঙ্গলকাঁধে কৃষক, ধনুর্বাণ হাতে পুরুষ, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাদনরতা নারীর দল, নৃত্যরতা নারী প্রভৃতি ভাস্কর্য ও চিত্রকলার নানা নিদর্শনের মধ্যে সে যুগের বাঙালীদের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। পাল ও সেন যুগের বাঙালীরা ছিল ভোজনবিলাসী। জনসাধারণের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাকসব্জী, ফলমূল, দুধ এবং দুধের তৈয়ারী নানারকম জিনিস। গব্য ঘৃত সহকারে সফেন গরম ভাতের বর্ণনা পাওয়া যায় 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' গ্রন্থে। 'লিপিমালা'য় বহু ফলের উল্লেখ রহিয়াছে। এই যুগের ভাস্কর্যে আর চিত্রে কদলীভারাবনত কলাগাছের বাস্তব চিত্র দেখা যায়। হেমন্তে নলেন গুড়ের গন্ধে ভরপুর গ্রামের বর্ণনা 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে রহিয়াছে।

জনসাধারণের জীবন যাত্রা

পাল ও সেনযুগে বাঙলা কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। অতএব এই যুগে বাঙলার অর্থনৈতিক জীবন কৃষিকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। ধানই ছিল প্রধান ফসল। তখন প্রচুর আখেরও চাষ হইত। আখের রস হইতে চিনি ও গুড় তৈয়ারী হইয়া বিদেশে চালান যাইত। তূলা, পাট এবং সরিষার চাষও হইত। কৃষি ছাড়া এ যুগে বাঙলার নানারকম শিল্পদ্রব্যও তৈয়ারী হইত। বস্ত্রশিল্প, কাষ্ঠশিল্প ইত্যাদি শিল্প হইতে বহুলোকের জীবিকা নির্বাহ হইত। সেই সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি হইতে দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত। স্বর্ণকার, মণিকার, কর্মকার প্রভৃতি ধাতুশিল্পীদের এবং গন্ধবণিক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট প্রসার ছিল।

অর্থনৈতিক জীবন

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি হইয়াছিল। বাণিজ্যের উন্নতির ফলে বাংলায় নূতন নূতন হাট, গঞ্জ ও নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। একস্থান

হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে পাল্‌কি, গরুর গাড়ী, ঘোড়া ও নৌকা প্রভৃতি প্রধান বাহন ছিল। স্থলপথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য বড় বড় রাজপথ তৈয়ারী হইয়াছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে আমরা রামাবতীর (রামপালের রাজধানী) রাজপথের সুন্দর বর্ণনা পাই। এই যুগে বাঙালীরা বেশীর ভাগই গ্রামে বাস করিত। তাহারা অনাড়ম্বর সহজ জীবন-যাপন করিত।

পাল ও সেন যুগে বাংলাদেশে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এক অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়াছিল। পালরাজারা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসে এই যুগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগে বাঙলার নিজস্ব জাতীয় ভাষার সৃষ্টি হয়। পাল যুগেই বাঙলা বর্ণমালার আভাস ফুটিয়া উঠে। সেন যুগে বাঙলা বর্ণমালা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। বিজয়সেনের একটি লিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালার মধ্যে ২২টি বর্ণ প্রায় বাঙলা অক্ষরের রূপ পাইয়াছে দেখা যায়।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি

পাল ও সেনযুগে বাঙলাদেশ সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্ররূপে খ্যাতি অর্জন করে। পাল ও সেন রাজাদের অসংখ্য তাম্রশাসনে যে সব শ্লোক লিখিত আছে সেগুলি সবই সংস্কৃত ভাষায়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই যুগে সংস্কৃত ভাষা রাজভাষা ছিল। সেযুগে নবদ্বীপ সংস্কৃত ভাষা চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। পাল যুগে বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থগুলিও সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়। পণ্ডিত ধর্মপাল, শীলভদ্র, অভয়াঙ্কর গুপ্ত ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এ যুগের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ ও গ্রন্থকার। সন্ধ্যাকর নন্দী পাল-যুগের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি। সেনযুগেও বহু সাহিত্যিক ও কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সর্বানন্দ পুরুষোত্তম, ধোয়ী, হলায়ুধ, শ্রীধর দাস, উমাপতি ধর প্রমুখ কবি ও সাহিত্যিকগণ সেনযুগের গৌরব। হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' 'মীমাংসাসর্বস্ব' 'পণ্ডিতসর্বস্ব' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা। ধোয়ীর রচিত 'পবনদূত' সেনযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি। সেনযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব। তিনি লক্ষ্মণসেনের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার খ্যাতি ছিল সর্বভারতীয়। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর মত শ্রুতিমধুর কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল।

সংস্কৃত ভাষার উন্নতি



দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

রাজা বল্লালসেন নিজেই 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুইখানি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেন।

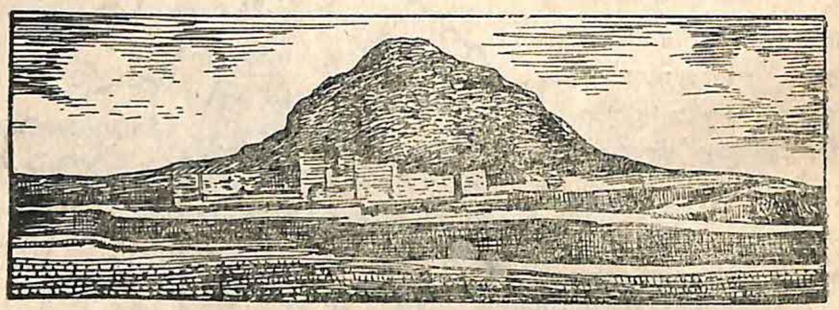
শিক্ষার প্রসার ও কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র

শিক্ষা বিস্তারের দিক হইতে এই যুগের গুরুত্ব অপরিসীম। পাল-রাজাদের আমলে ওদন্তপুরী, জগদ্দল, সোমপুর, পাহাড়পুর ও বিক্রমশীলা প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ওদন্তপুরীতে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা হইত। বিক্রমশীলা এ যুগের আরও একটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে ১২৫ জন অধ্যাপক শিক্ষাদান করিতেন। ধর্মপাল ইহা স্থাপন করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিক্রমশীলায় সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্র এখানে পড়ান হইত। ধর্মপাল ও দেবপাল উভয়েই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে নালন্দা তখনও বিশ্ববিখ্যাত ছিল।

শিল্প

স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্রকলা শিল্পের এই তিনটি বিভাগেই বাঙালী শিল্পীরা কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তিব্বতীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় ধীমান ও তাঁহার পুত্র বীতপাল ছিলেন পালযুগের বিখ্যাত শিল্পী, স্থপতি ও ভাস্কর। ইহারা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে যে নূতন নূতন রীতির প্রবর্তন করেন তাহা সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি দেশে অনুসরণ করা হইয়াছিল।

পাথরের অভাবে এ যুগে বাঙলার মন্দির কাঠ ও ইট দিয়াই বেশি তৈয়ারী হইত। সে কারণে তখনকার বহু শিল্পকীর্তি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। তবে যাহা বর্তমান রহিয়াছে তাহা হইতেই এই যুগের শিল্পীদের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।



পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষ

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

পাহাড়পুর, সোমপুরী বিহারের ধ্বংসাবশেষ, মহাস্থানগড়, পৌণ্ড্র নগরীর ধ্বংসাবশেষ, কোটিবর্ষের ধ্বংসাবশেষ হইতে এই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া বরাকরের মন্দির, বাঁকুড়া জেলার সিদ্ধেশ্বরের মন্দির এবং বেড়াচাঁপায় চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ এই যুগের স্থাপত্য উৎকর্ষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুরের একটি বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাকী অংশের উপরের অংশের উচ্চতা ৭০ ফুট। এই মন্দিরটি ইট-কাদার গাঁথুনিতে তৈরী।

পাল ও সেনযুগে বাঙলার সঙ্গে বহির্ভারতীয় বিভিন্ন দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাঙালী ধর্মপ্রচারক, বণিক, সাংস্কৃতিক দূতগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে বাঙলার তথা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তারলাভ করে এবং এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাঙলার অবদান অসামান্য। শান্তরক্ষিত এবং পদ্মসম্ভব নামে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া তিব্বতে যান এবং সেখানে ধর্মপ্রচার করেন। ইহার পর বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে যান। তাঁহার চেষ্টায় তিব্বতের বৌদ্ধ-ধর্মের মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চারিত হয়। তিনি তের বৎসর তিব্বতবাসীদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়া সেখানেই দেহরক্ষা করেন। কুমারঘোষ নামক একজন বাঙালী পণ্ডিত শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাদের গুরু ছিলেন। সেনরাজারা বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে, দেশে ও বিদেশে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন।

বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ

মধ্য ভারতে চন্দেল্লদের শাসনকাল। সেই সুদূর অষ্টম শতাব্দীতে রাজপুতগণ গঙ্গা উপত্যকার সমৃদ্ধ এলাকায় ও মধ্যভারতে অনুপ্রবেশ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁহাদের অবদান বিশেষ করিয়া মনে রাখিবার মত। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে প্রতিহার রাজ্যের অবনতি ঘটিলে তাহাদের অধীনস্থ অপেক্ষাকৃত ছোট সামন্তরাজ্যগুলির শক্তি বৃদ্ধি পায়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ প্রতিহারদের অধিকৃত ভূখণ্ডে চন্দেল্ল রাজবংশ শাসিত রাজ্যটি গড়িয়া উঠে। চন্দেল্ল রাজ্যের পরিসর ছিল বুন্দেলখণ্ড, দোয়াবের কিছু অংশ এবং বারাণসী ও বিহারের অল্প অংশ। সর্বপ্রথম আধুনিক বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্লরা একটি রাজ্য স্থাপন করে। এই বংশের কয়েকজন রাজা শক্তিশালী ছিলেন। ধঙ্গ (৯৫৪-১০০২ খ্রীঃ) ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি এলাহাবাদ, কালিঞ্জর ও গোয়ালিয়র সহ উত্তর ভারতের বিস্তৃত অংশে রাজত্ব করিতেন।

চন্দেল্ল শাসনাধীন অঞ্চল

চন্দেল্লরা রাজপুত ছিলেন। ছাত্তরপুর, মাহোবা, কালিঞ্জর এবং খাজুরাহো ছিল এই রাজ্যের কয়েকটি বিখ্যাত নগর। মন্দির-শোভিত এই নগরগুলি মধ্য ভারতের দ্রষ্টব্যস্থল হিসাবে আজিও চিহ্নিত। চন্দেল্ল রাজারা বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও মন্দির নির্মাণ করিয়া চন্দেল্ল রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। চন্দেল্ল সমাজের ভিত্তি ছিল গোষ্ঠী। প্রত্যেকটি গোষ্ঠীর বাস্তব বা কাল্পনিক একজন পূর্বপুরুষ হইতে উৎপত্তি বলিয়া ধরা হইত। গোষ্ঠীগুলি সাধারণতঃ এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে আধিপত্য করিত। এক একটি গোষ্ঠীর অধীন ৮৪টি পর্যন্ত গ্রাম থাকিত। এই রাজ্যে সামন্ত প্রথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রাজপুত যোদ্ধারা বেতনের পরিবর্তে জমি পাইত। প্রত্যেক যোদ্ধা ভূমি, পরিবার ও নিজের আত্মমর্যাদার প্রতি অনুগত ছিল।

চন্দেল্ল শাসনব্যবস্থা

চন্দেল্ল শাসনকালে মন্দির-নির্মাণকার্যে চরম উন্নতি দেখা যায়। মন্দির-নির্মাণে 'নাগর' রীতির চরম বিকাশ খাজুরাহোর মন্দিরগুলিতে ঘটিয়াছিল। খাজুরাহোর মন্দিরগুলি নির্মিত হয় আনুমানিক ৯৫৪ হইতে ১০৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এই মন্দিরগুলিই তৎকালীন ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়া গণ্য হয়। কেননা মন্দিরগুলির চূড়া পর্যন্ত সমস্ত স্থান বহুবিধ ভাস্কর্য মূর্তি ও নানারূপ চিত্রে পরিপূর্ণ। এত বেশি চিত্র আছে যে দর্শকের চোখে পৃথক পৃথক দৃশ্য বা ভাস্কর্য মূর্তিগুলি ধরা পড়ে না। খাজুরাহোর পার্শ্বনাথ মন্দির, বিশ্বনাথ মন্দির ও কন্দরিয়া মন্দির নাগর স্থাপত্য শিল্পের নিখুঁত উদাহরণ বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এই মন্দিরগুলির গাত্রে যে সব মূর্তি খোদিত রহিয়াছে সেগুলি দেখিয়া মনে হয় ভাস্কর্য শিল্পেরও সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

চান্দল্লদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

উড়িষ্যার গঙ্গদের শাসনকাল। উড়িষ্যা প্রাচীনকালে কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। নবম শতকে রণভঞ্জ ছিলেন একজন শক্তিশালী রাজা। একাদশ শতকে প্রাচ্যগঙ্গ বা বৃহৎগঙ্গ বংশ উড়িষ্যায় শাসন শুরু করেন। এই বংশের একটি শাখা মহীশূরেও রাজত্ব করিতেন এবং এই বংশটিকে পশ্চিম গঙ্গ বংশ বলা হইত।

বৃহৎগঙ্গ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হইলেন অনন্তবর্মন চোডগঙ্গ। তিনি চোল ও বাংলার পালরাজাদের পরাজিত করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের মন্দিরটি নির্মিত হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির ও কোনারকের সূর্যমন্দির এই বংশের আমলেই নির্মিত হইয়াছিল। কোনারকের মন্দিরগাত্র ভিত্তিস্থল হইতে ছাদ পর্যন্ত এমন সূক্ষ্ম ও জটিল ভাস্কর্য শিল্পের অলংকারে মণ্ডিত যে মন্দিরগাত্রের প্রতিটি প্রস্তর এক এক খণ্ড রত্নালংকারের মত অপূর্ব কারুকার্যময়! এগুলি ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই মন্দিরগুলিও নাগর স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত।

গঙ্গদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি। উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসও অখণ্ড ভারত ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাচীন যুগের দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর ভারতে গুপ্ত রাজবংশের ক্ষমতা ও প্রভাবের অবসানের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের উত্থানের ইতিহাস যুক্ত রহিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে উর্বর বৃহৎ সমভূমির অভাব থাকায় বড় সাম্রাজ্য কখনই গড়িয়া ওঠে নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রায় ৫০০ বৎসর ধরিয়া চারিটি রাজ্য দাক্ষিণাত্যে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। রাজ্যগুলি ছিল চালুক্য রাজবংশ, পল্লব রাজবংশ, রাষ্ট্রকূট রাজবংশ এবং চোল রাজবংশ। প্রধানতঃ এই রাজ্যগুলির শাসনকালেই দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা বিকাশ লাভ করে।

এই যুগের ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত দক্ষিণ ভারতেও রাজতন্ত্র বিশেষভাবে শক্তি-শালী হইতে দেখা যায়। রাজারাই ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান ব্যক্তি। তাঁহারা রাষ্ট্রের সমস্ত বিষয়ে নজর রাখিতেন। রাজারা 'পরমেশ্বর', 'মহারাজ', 'মহারাজাধিরাজ',

'পরমেশ্বর', পরমভট্টারক' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন। এই যুগে দাক্ষিণাত্যে রাজতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও স্বেচ্ছাচারতন্ত্র দেখা যায় নাই। কারণ হিসাবে দাক্ষিণাত্যে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাজা প্রজাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ ভূমিকর হিসাবে গ্রহণ করিতেন।

রাজনৈতিক জীবন

অভিজাত সম্প্রদায় অত্যন্ত জাঁকজমক ও সমারোহের মধ্যে বাস করিতেন। রাজাদের অনুকরণে তাঁহারা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করিতেন। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও রাজকীয় জীবন যাপন করিতেন। চালুক্য সাম্রাজ্যের কোটি-পতিদের জীবযাত্রার বিবরণ তৎকালীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে দেশের সকলেই সুখ-সমৃদ্ধিতে ছিল ভাবিলে ভুল হইবে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

শিলালিপি, সাহিত্য, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ ইত্যাদি উপাদান হইতে দাক্ষিণাত্যের সাধারণ মানুষের জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে জাতিভেদ প্রথার তেমন উল্লেখ নাই। কিন্তু আর্য প্রভাব বিস্তারের ফলে জাতিভেদ প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দাক্ষিণাত্যে সমাজ মূলতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—একদিকে ব্রাহ্মণ-শ্রেণী ও অপরদিকে শূদ্র শ্রেণী। শূদ্র শ্রেণীও কর্মের ভিত্তিতে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য শ্রেণীর জনসংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। সমাজে নারীর বিশেষ কোন মর্যাদা ছিল না। বাল্যবিবাহ এ যুগে প্রবর্তিত হয়। সতীদাহ প্রথা এ যুগে একটি বহুল প্রচলিত প্রথা হিসাবে গণ্য হইত। তবে ধর্মচর্চায় নারীরা যে যোগ দিতে পারিতেন তাহা বৈষ্ণব সাধিকা আন্দোলনের প্রভাব হইতে বোঝা যায়। মাতৃতন্ত্রের প্রভাব চোল সমাজব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

দক্ষিণ ভারতে সমাজ জীবন

দক্ষিণ ভারতে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দুধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বিভিন্ন রাজবংশের অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। সপ্তম শতাব্দীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট বৈদিক ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তবে দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তিবাদ ও অবতারবাদ হিন্দুধর্মকে নূতন বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। এই ভক্তিবাদ হইতে উদ্ভূত শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাবল্য দক্ষিণ ভারতের ধর্মজীবনে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পল্লব ও চোল বংশীয় অনেক সম্রাট শৈব বা বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। শৈব ধর্মের প্রচারে সর্বাধিক সাহায্য করিয়াছিলেন আচার্য শঙ্কর। বৈষ্ণব ধর্মের আচার্যদের মধ্যে যমুনাচার্য, রামানুজ ও মধ্বাচার্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ ভারতে ধর্ম

দক্ষিণ ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের আনুকূল্যে দক্ষিণ ভারতে বিদ্যাচর্চার অনেক-গুলি কেন্দ্র গড়িয়া উঠে। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ পল্লব রাজধানী কাঞ্চীপুরমের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং তিনি নিজে কিছুদিন সেখানে থাকিয়া বিদ্যাচর্চা করেন।

শিক্ষা

ভারতীয় সাহিত্যের ঐকতানে দক্ষিণ ভারতও বিচিত্র সাহিত্যের ধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। তামিল, তেলেগু, মালয়ালম প্রভৃতি ভাষায় অজস্র ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া সমগ্র দাক্ষিণাত্যে উচ্চস্তরের চিন্তাধারা ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষাকে দক্ষিণ ভারত আরও সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল।

সাহিত্য

বৈদিক সাহিত্যের প্রভাবে দক্ষিণ ভারতে এক বিপুল ধর্মীয় সাহিত্য রচনা শুরু হয়। গোদাবরী উপত্যকায় আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে আপস্তম্ভ আবির্ভূত হন। তিনি শ্রৌত, গৃহ্য আর ধর্মসূত্রের রচয়িতা। রম্যরচনার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রচনা হইল মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা হালের 'গাথাসপ্তশতী'। গুণাঢ্যের 'বৃহৎ-কথা'ও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যের রচয়িতা মহাকবি ভারবী ছিলেন পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর সভাকবি। বিখ্যাত আলঙ্কারিক দণ্ডী-রচিত 'কাব্যাদর্শ' প্রাচীন সাহিত্য সমালোচনার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে।

সংস্কৃত সাহিত্য

বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তদের রচনা যেমন সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল তেমনি ধর্মীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। 'নালিয়ারাপ্রবম্' ও 'তিমুরাই' যথাক্রমে বৈষ্ণব ও শৈব ভক্তদের নিকট বেদস্বরূপ। দর্শন ও বিজ্ঞান রচনায় এই যুগের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছিল। শঙ্কর, রামানুজ ও মধ্বাচার্য তাঁহাদের দার্শনিক রচনা দ্বারা সাহিত্যকে পুষ্ট করেন।

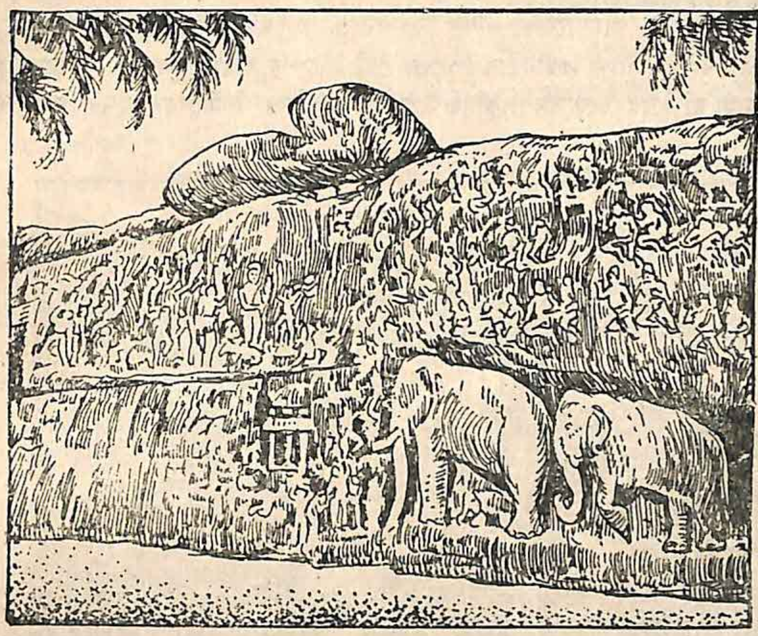
এই যুগে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। তামিল সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ মহাত্মা তিরুবল্লমের রচিত 'কুরল'। ইহাকে তামিল 'বেদ'ও বলা হয়। এই গ্রন্থের সর্বজনীন আবেদন অনস্বীকার্য। 'শিল্পাদিকরম' এই যুগের একটি বিখ্যাত তামিল নাটক।

প্রাদেশিক সাহিত্য

স্থাপত্য শিল্প। এই যুগে দক্ষিণ ভারত মন্দিরময় হয়। সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী হইল দক্ষিণ ভারতে স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের উন্নতির চরম যুগ। পাথর আর ইট ছিল স্থাপত্যের উপাদান। পাথর, পিতল, তামা ও কাঠ ছিল ভাস্কর্যের প্রধান উপাদান। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং নৃত্যগীতের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। মন্দির প্রাঙ্গণে বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা ছিল। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য শিল্পের রীতি হইল, মন্দিরের শিখর কোণাচে হইয়া থাকে থাকে উপরে উঠিয়া যায়। মন্দিরের তলদেশে স্তম্ভের সারি। এই রীতি প্রথম দেখা যায় কাঞ্চীর পল্লব শাসনকালে। শিল্পকীর্তিতে পল্লব যুগ অবিস্মরণীয়। সে যুগের পর্বতগাত্র কাটিয়া যে মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল তাহা শিল্পসৌন্দর্যে অদ্বিতীয়। পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণ নির্মিত মহাবলীপুরমের সপ্তরথের আকারে রচিত মন্দিরগুলি স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ভীমরথ, দ্রৌপদী রথ, ধর্মরাজ রথ ইত্যাদি প্রত্যেকটি রথ বিভিন্ন আকারে নির্মিত হয়। মহাবলী-পুরমের সমুদ্রসৈকতে রচিত মন্দিরটিও স্থাপত্য শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। শুধু

পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

স্থাপত্য নহে, ভাস্কর্যেও পল্লবদের অবদান স্মরণীয়। কেবলমাত্র মানবমূর্তিই নহে, প্রকৃতি ও জীবজন্তুর মূর্তিগুলিও পল্লব শিল্পের বৈশিষ্ট্য বহন করে।



পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য : মহাবলীপুরম।

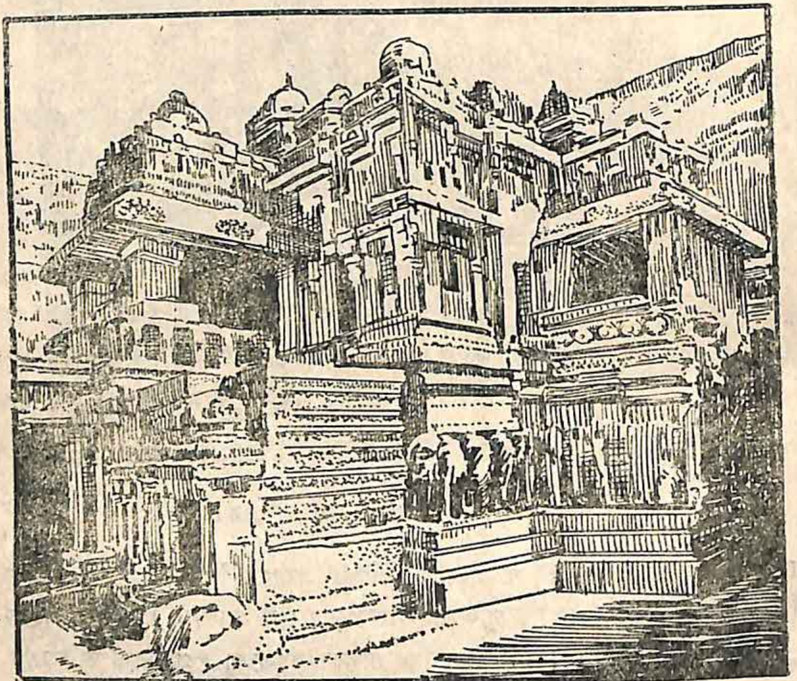
বাতাপির চালুক্য বংশের শাসনকালে দক্ষিণ ভারতে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। অজন্তার গুহাচিত্রগুলি এই রাজবংশের শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রথম গুহার অনেকগুলি বিখ্যাত চিত্র চালুক্য আমলের প্রথমদিকে অঙ্কিত। এই চিত্রগুলিতে বর্ণের সুসমঞ্জস বিন্যাস, রেখার লালিত্য, ছন্দোময় ভঙ্গী চালুক্য যুগের চিত্রকলাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। শিল্প-কীর্তিতে রাষ্ট্রকূটগণও দাক্ষিণাত্যের শিল্প ঐতিহ্য বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের আমলে নির্মিত ইলোরার গুহামন্দিরগুলি সে যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই বংশের রাজা প্রথম কৃষ্ণের আমলে নির্মিত ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির বিশালতায় ও শিল্পসৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। বিশাল পর্বতপার্শ্বকে খোদিত করিয়া এই মন্দির নির্মাণ করা হয়। এই মন্দিরে দেবতা ও প্রাণীর মূর্তিগুলির ভাস্কর্য শিল্পের অক্ষয় কীর্তি। অষ্টম শতাব্দীতে ইলোরার মন্দিরগুলির অনুকরণে বোম্বাই-এর নিকটে এলিফ্যান্টায় মন্দির নির্মিত হয় এবং ইহার অর্ধনারীশ্বর ও ত্রিমূর্তি শিল্পক্ষেত্রে অমরত্ব দাবি করিতে পারে।

চালুক্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

রাষ্ট্রকূট স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

স্থাপত্য শিল্পে চোলরাজগণের কীর্তি ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঞ্জোর ও গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমের শিল্পমন্দিরগুলি শিল্প সৌন্দর্যে সকল সমালোচকের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। চোল সম্রাট রাজরাজ-নির্মিত তাঞ্জোরে রাজরাজেশ্বর মন্দির বিশালতায়, সুকুমার কারুকার্যে, গঠনপ্রণালীর সামঞ্জস্যে এবং মূর্তিগুলির সজীবতায় জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পের সহিত তুলনীয়। চোলযুগে পাহাড়কাটা মন্দিরের চেয়ে সমতলভূমির উপর সুউচ্চ মন্দির নির্মাণের ঝোঁক বেশী দেখা

চোল শিল্প ও স্থাপত্য



ইলোরার কৈলাসনাথ মন্দির

যায়। কিছু কিছু ভাস্কর্যের মধ্যেও স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মূল মন্দিরের মত ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। মন্দিরের শীর্ষে অলঙ্করণের জন্য ভাস্কর্যের ব্যবহার হইত। চোলযুগে ধাতুশিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে। শিবের নটরাজ মূর্তি চোলযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পাণ্ড্য ও চালুক্য আমলেও দক্ষিণের এই শিল্পপ্রতিভার স্ফূর্তি বজায় থাকে। দক্ষিণ ভারতে এই যুগে সঙ্গীত ও নৃত্যের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। ভারতনাট্যমের প্রবর্তন এই যুগেই ঘটে। অজন্তা ও ইলোরার মন্দিরে এই নৃত্য-ভঙ্গিমার পরিচয় পাওয়া যায়।

জৈন ও বৌদ্ধধর্ম উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিল। ইলোরার বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু গুহামন্দিরগুলি দাক্ষিণাত্যে এইসব

ধর্মের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। অজন্তা চিত্রশিল্পে বৌদ্ধ প্রভাবই বেশী দেখা যায়। চালুক্য, পল্লব, রাষ্ট্রকূট, চোল ও পাণ্ড্য রাজবংশের আনুকূল্যে হিন্দুধর্ম দক্ষিণ ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পকর্মে প্রভাব বিস্তার করে।

বহির্ভারতের সহিত ব্যবসায়িক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

ভারত কোনকালেই বহির্বিশ্বের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন রাখিয়া আত্মসমাহিত জীবনযাপন করে নাই। হাজার রকমের বাধাবিঘ্ন ঝড়ঝঞ্ঝাকে জয় করিয়া ভারতবাসী নিজেকে বিকশিত করিয়াছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের অবদান

ভারতীয় উপনিবেশের স্বরূপ। সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, জাপানের সঙ্গে ভারতের নিবিড় সম্পর্কে ব্যবসা-বাণিজ্য বিরাট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। বাণিজ্যিক প্রসারের ফলে কেবলমাত্র ব্যবসায়িক লেনদেন নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল। ভারত বিভিন্ন দেশের শিল্প, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

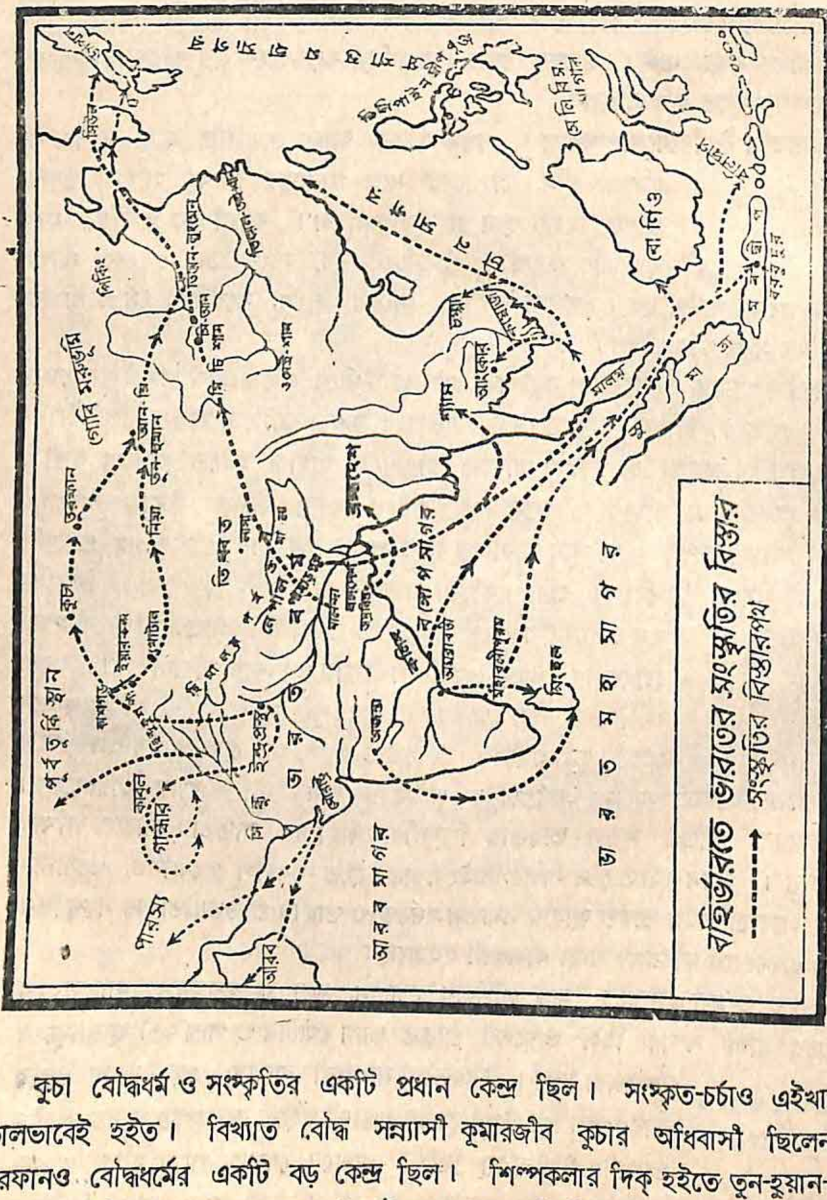
প্রাচীন ভারতে ভারতীয়গণ সমুদ্রবাহী জাহাজ নির্মাণে এবং জাহাজ চালাইবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। ইহার ফলে বহির্ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারত বিরাট উন্নতি সাধন করে। অজন্তা চিত্র শিল্পে অঙ্কিত রহিয়াছে জাহাজ হইতে অসংখ্য হস্তী ও অশ্বের অবতরণ। দক্ষিণ ভারতের মালাবার এবং করমণ্ডল উপকূল, উত্তরে ভৃগুকচ্ছ ও ভারু, পশ্চিমে সোপারা এবং পূর্বে তাম্রলিপ্ত ছিল প্রধান বন্দর। এই যুগের ভারতীয় বণিকরা অসংখ্য বিপদাপদ অগ্রাহ্য করিয়া অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়াছিল। উহাদের সাহসিকতার এবং সম্পদশালী হইবার প্রেরণায় ভারত তৎকালীন আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা ভারত তাহার শুধু সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বীর যোদ্ধারা বিভিন্ন দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বহু ধর্মপ্রচারক ভারতীয় ধর্মের নীতি প্রচার করিয়াছেন। বহির্ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় শিল্পীরা তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইরান হইতে চীন সাগর, সাইবেরিয়া হইতে যবদ্বীপ ও বোর্নিও, ওসেনিয়া হইতে সকোত্রা পর্যন্ত ভারত তাহার সনাতন ধর্মমত ও তাহার প্রতিভা, তাহার সংস্কৃতির বিস্তার এমনভাবে করিয়াছে যাহা কালজয়ী হইয়াছে।

সাহসী বণিককুলের অবদান

ভারত ও মধ্য-এশিয়া। মধ্য এশিয়ায় খোটান, কুচা ও তুরফানের সহিত যে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ভারতের প্রাকৃত ভাষা খোটান ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের কথ্যভাষা ছিল। ভারতীয় নামধারী রাজারা এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে কয়েকশত বৎসর খোটান ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। এখানে যেসব পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে সেইগুলি হইতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। হিউয়েন

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার

সাঙ এই পথেই ভারতে আসিয়াছিলেন ও নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণ হইতেও মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। একমাত্র খোটানেই তখন একশতটি বৌদ্ধবিহার ছিল। দশম শতাব্দীতে মুসলমান বিজয়ের ফলে খোটানে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ক্ষুণ্ন হয়।



বহির্ভারতে ভারতের সংস্কৃতির বিস্তার

কুচা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। সংস্কৃত-চর্চাও এইখানে ভালভাবেই হইত। বিখ্যাত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কুমারজীব কুচার অধিবাসী ছিলেন। তুরফানও বৌদ্ধধর্মের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। শিল্পকলার দিক্ হইতে তুন-হুয়ান-এ অবস্থিত প্রাচীন 'হাজার বুদ্ধের গুহা' হইতে পাওয়া চিত্রশিল্পের কথা বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধধর্মই এই শিল্পের উৎস। ইহাকে মধ্য এশিয়ার 'অজন্তা' বলা হইয়া থাকে।

ভারত ও দূরপ্রাচ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ভারতের সহিত চীনদেশের সম্পর্ক বহুকাল আগেই গড়িয়া ওঠে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে কিছু কিছু চীনা জিনিসপত্র ভারতে ব্যবহৃত হইতে শুরু করে। এগুলির নামকরণ হইয়াছিল চীনা নামের অনুকরণেই। চীনাকাপড়কে বলা হইত চীনপট্টী। বাঁশকে বলা হইত কীচক। ইহার পর আরও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল প্রথম শতকে যখন বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকগণ চীনদেশে যাইতে থাকেন। তাঁহারা চীনের বিখ্যাত শ্বেত অশ্বমঠে বসবাস শুরু করেন। কথিত আছে যে চীনদেশের ক্যান্টন ও সাংহাই নামক স্থানে ভারতীয়দের বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কুমারজীব, সংঘভূমি, গৌতম, সংঘদেব, বুদ্ধযশ, কাশ্যপ, মাতঙ্গ, ধর্মরক্ষিত, প্রভাকর মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ভারত হইতে চীনদেশে গিয়াছিলেন। অধিকাংশ স্থানে ব্রাহ্মণগণই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটান।

ভারত ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

চীনের শিল্পকলার উপর ভারতীয় প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। ভারতীয় মন্দিরের অনুকরণে চীনদেশেও ঐরকম মন্দির নির্মাণ শুরু হইল। ভারতীয় শিল্পীদের চাহিদা স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পায়। পরে চীনা শিল্পীরা ঐ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তবে তাহারা ভারতীয় রীতি ত্যাগ করে নাই। চীনে পাথর কাটিয়া মন্দির নির্মাণ করিবার পদ্ধতিটি একেবারে ভারতীয়। চীনের য়ুন কাং গুহায় বৌদ্ধ চিত্রাবলী ও ভাস্কর্যে ভারতীয় প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও আয়ুর্বেদশাস্ত্র চীনে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া ওঠে। চীন হইতে বৌদ্ধধর্ম জাপান, কোরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে। জাপানী শিল্প ও ভাস্কর্যে ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়।

চীনা শিল্প ও ভাস্কর্যে ভারতীয় প্রভাব

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। দূরপ্রাচ্য অপেক্ষা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সহিত ভারতের যোগাযোগ নিবিড়তর ছিল। এই যোগাযোগ কেবলমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছিল। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। উপনিবেশগুলিকে ভারতবাসীরা কখনো শোষণ করে নাই। উপনিবেশের সমৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনই ছিল তাহাদের ব্রত।

কম্বোজ। কোন্ যুগে হিন্দুরা কম্বোজ বা বর্তমান কাম্পুচিয়ায় রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ঠিক করিয়া বলা শক্ত। প্রথমে যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাকে চীনা ভাষায় ফু-নান বা বনরাজ্য বলা হইত। অবশ্য খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কম্বোজে হিন্দু সভ্যতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। কম্বোজের রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব ও বৌদ্ধমতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অধিকাংশ লোক শৈব ছিল। কম্বোজ-রাজ ঈষাণবর্মার সভাপণ্ডিত বিদ্যাবিশেষ সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও বৌদ্ধধর্মে সুপণ্ডিত ছিলেন। কম্বোজ রাজ্যে যে সব প্রাচীন 'শাসন' পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার

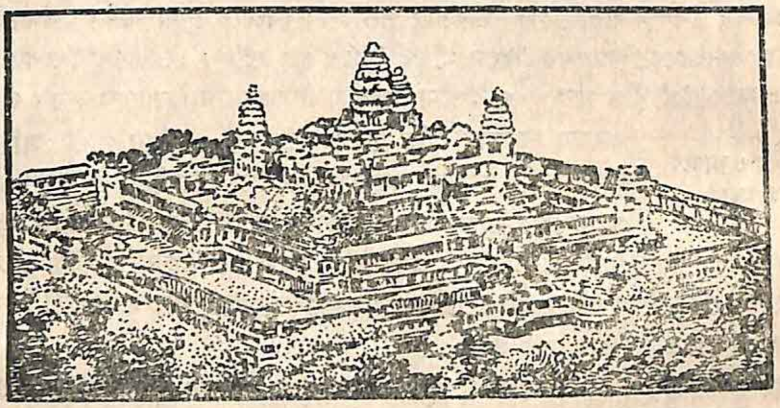
কম্বোজে ভারতীয় সভ্যতা

বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। এদেশে লিপিও ছিল ভারতীয়। রামায়ণের কম্বোজীয় সংস্করণও আছে।

দ্বাদশ শতকের শেষভাগে সপ্তম জয়বর্মণের রাজত্বকালে কাম্বোজ সাম্রাজ্যের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি যশোধরপুরে (বর্তমান আঙ্কোরথোম) একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। রোম, বাগদাদ প্রভৃতি তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীর অন্যতম ছিল যশোধরপুর। পল্লবদের শিল্পরীতি অনুসারে এই নগরী নির্মিত হইয়াছিল। ইহার ধ্বংসাবশেষ আজিও দর্শকের মনে গভীর বিস্ময় সঞ্চার করে। এখানকার বেয়ন মন্দির স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের জন্য জগৎবিখ্যাত। এই মন্দিরটি বৌদ্ধ দেবতা অবলোকিতেশ্বরের।

আঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির

যশোধরপুরের দক্ষিণে দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত অঙ্কোরভাট মন্দির অবস্থিত। বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবর্মন ইহা নির্মাণ করেন। মন্দিরটি আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সৌন্দর্যে অনুপম। এত বড় মন্দির আর কোন দেশে নাই। শিব, বিষ্ণু, রাম,



আঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির

কৃষ্ণ ও অর্জুনের উপাখ্যান লইয়া এই মন্দিরের বিখ্যাত চিত্রগুলি অঙ্কিত। মন্দিরটি ঘিরিয়া চারদিকে পাথরের প্রাচীর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ৬৫০ ফুট প্রশস্ত পরিখা। এই পরিখা অতিক্রম করিবার জন্য যে পাথরের সেতু আছে তাহার প্রস্থ ৩৬ ফুট। এই মন্দিরের শিখরটি ২১০ ফুট উচ্চ। আঙ্কোরভাটের বিশালতা, নির্মাণ কৌশল ও কারুকার্য একসঙ্গে এই তিনের সমন্বয় পৃথিবীতে অপর কোন মন্দিরের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। কাম্বোডিয়ার বর্তমান দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন মনুস্মৃতির ভিত্তির উপর রচিত।

চম্পা। কম্বোজের প্রতিবেশী ছিল চম্পা রাজ্যটি। এখনকার দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং উত্তর ভিয়েতনামের কিছু অংশ লইয়া ইহা গঠিত ছিল। এখানে ভারতীয় বণিকগণ বেশ কিছু বসতি স্থাপন করিয়াছিল। কথিত আছে, তাম্রলিপ্তের বণিকেরা দ্বিতীয়

শতাব্দীতে চম্পা রাজ্য স্থাপন করেন। প্রায় বারোশত বৎসর ধরিয়া হিন্দুরাজারা এখানে রাজত্ব করেন। এখানেও সংস্কৃতের চর্চা খুব ভালভাবেই হইত। চম্পায় চম্পাপুর, ইন্দ্রপুর ও বিজয় প্রভৃতি প্রধান শহর ছিল। খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে চম্পায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে মৈত্রীভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

শ্যামদেশ। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে শ্যামদেশে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। কালক্রমে এই দেশে বহু উপনিবেশ গড়িয়া ওঠে। দ্বারাবতী ছিল এই উপনিবেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী। পরবর্তীকালে ইহার নাম শ্যামদেশ হয়। কম্বোজ হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এই রাজ্যের সীমা ছিল। ব্রহ্মদেশ হইতে শ্যামদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় এবং সুখোদয় ও অযোধ্যা নামে দুইটি রাজ্য গড়িয়া ওঠে। এই দুই রাজ্যের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন এবং পালি ছিল প্রধান ভাষা। শ্যামদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব খুবই স্পষ্ট। তবে শ্যামদেশের অধিবাসীগণ পুরোপুরিভাবে বৌদ্ধ হইয়া যান নাই। তাঁহারা হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণ এবং দেবদেবীদের নিজেদের সমাজ-জীবন হইতে অপসারিত করেন নাই।

বৌদ্ধধর্মের প্রসার

সুবর্ণদ্বীপ। সুবর্ণদ্বীপ বলিতে মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বর্নিও প্রভৃতি দ্বীপগুলিকে বোঝায়। প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতের সহিত সুবর্ণভূমির বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও সুবর্ণভূমির উল্লেখ রহিয়াছে।

এই সকল স্থানে যে-সব 'শাসন' পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি হইতে জানা যায় যে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সুবর্ণদ্বীপে সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। এইসব স্থানে ভারতীয় লিপির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত চর্চাও খুব ভালভাবে হইত। শ্রীবিজয় সংস্কৃত চর্চার একটি বড় কেন্দ্র ছিল।

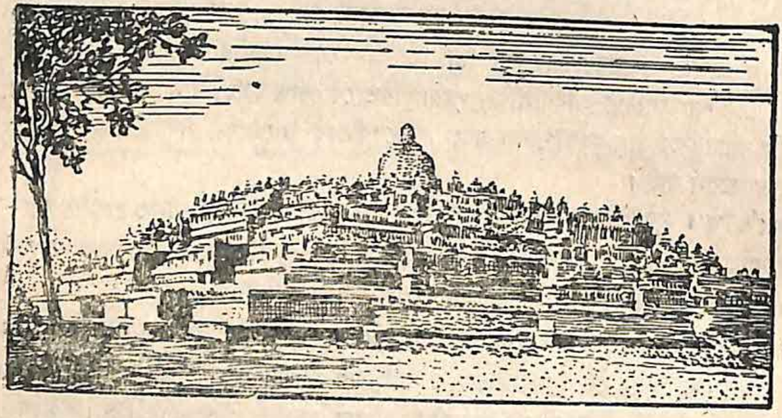
এইসব জায়গাতে প্রথমে হিন্দুধর্ম ও পরে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। তবে বলিদ্বীপে হিন্দুধর্মই থাকিয়া যায়। প্রথমে সুবর্ণদ্বীপে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রাজা রাজত্ব করিতেন। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রায় সমস্ত সুবর্ণদ্বীপ শৈলেন্দ্র বংশের অধীনে আসে। সম্ভবতঃ কম্বোজ ও চম্পা শৈলেন্দ্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শৈলেন্দ্র বংশের রাজাদের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্যের কথা আরব দেশীয় বণিকরাও বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শৈলেন্দ্র রাজ্যের মূল শক্তিকেন্দ্র ছিল মালয় উপদ্বীপে। শৈলেন্দ্র রাজ্যের এক শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজত্ব

শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া সেখানে একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠন করেন। তাঁহারা এই অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তারে বিশেষ সাহায্য করেন। মহাযান বৌদ্ধধর্ম এই অঞ্চলে প্রচারিত হয়। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা বাংলাদেশের পাল বংশীয় রাজাদের সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। কুমারঘোষ নামে জনৈক বাঙালী বৌদ্ধভিক্ষু শৈলেন্দ্র রাজ্যে গিয়া রাজগুরুর মর্যাদা লাভ করেন। শিল্পকলায় শৈলেন্দ্র বংশের বিশেষ আগ্রহ ছিল। যবদ্বীপে বিশ্ববিখ্যাত

বরবুদর স্তূপ এবং কয়েকটি সুন্দর ও বিশাল বৌদ্ধ মন্দির তাঁহাদের শিল্পানুরাগের নিদর্শন। কথিত আছে বাঙলাদেশ হইতে বীতপাল ও ধীমান যবদ্বীপে গিয়া এই মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। শিল্পকলার দিক্ হইতে বিচার করিলে বরবুদরের মন্দির জগতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তিগুলির অন্যতম। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে চারিশত ফুট পরিধিসম্পন্ন এই মন্দিরটি স্তরে স্তরে উঠিয়া গিয়াছে। প্রতি স্তরে চারিশত ছত্রিশটি সজ্জিত বুদ্ধমূর্তি রহিয়াছে। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রধান স্তূপকে ৭৩টি স্তূপ চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। মন্দিরগাত্রে জাতকের কাহিনীগুলি খোদিত রহিয়াছে। এই

স্থাপত্য ও শিল্পকলা : বরবুদর মন্দির



বরবুদর মন্দির

মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ বৌদ্ধ দেবতা তারাদেবী। এত বড় বৌদ্ধ মন্দির পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ইহা তৈয়ারী হইয়াছিল খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে নবম শতাব্দীর মাঝামাঝির মধ্যে।

সুমাত্রা, জাভা, বর্নিও প্রভৃতি দেশের সমাজব্যবস্থায় চতুর্বর্ণের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বলিদ্বীপের জনসাধারণ এখনো হিন্দু বলিতে গর্ব অনুভব করে। এই দ্বীপে ইসলাম ধর্ম প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ হয়। দুর্গা, কালিকা ও অন্যান্য দেবদেবীর অসংখ্য মন্দির বলিদ্বীপে চোখে পড়ে।

সুলতানী যুগে ভারত

প্রথম অধ্যায়

মুসলমান যুগ, না মধ্যযুগ ?

ইতিহাসকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়—প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। ইতিহাস এক এবং অবিভাজ্য, কিন্তু ইতিহাস পাঠের সুবিধার জন্যই ইতিহাসে যুগবিভাগ করা হয়। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এক ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসকে অন্যভাবে ভাগ করিয়াছিলেন—হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ এবং ব্রিটিশ যুগ। শাসক শ্রেণীর কাহিনীই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। স্বভাবতই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল রাজত্বের অবসান পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মুসলমান যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছিল। কারণ হিসাবে দেখান হয় যে এই সময় ভারত ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে নায়করূপে ছিলেন মুসলমান শাসকগণ ও ইসলাম ধর্ম। কিন্তু এইভাবে কোন দেশের ইতিহাসকে ভাগ করা ঠিক নয়, বিশেষ করিয়া ভারতের ন্যায় নানা জাতি নানা ভাষা লইয়া গঠিত দেশের ইতিহাসকে। এরূপভাবে ভাগ করিলে বুঝাইবে মধ্যযুগে মুসলমানগণই সবকিছু করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই ছিলেন ঐ যুগের চালিকাশক্তি। কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। জনজীবনের সত্যনিষ্ঠ কাহিনীই হইল প্রকৃত ইতিহাস। তাহা ছাড়া তথাকথিত মুসলমান যুগে শাসক সম্প্রদায় প্রধানতঃ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইলেও দেশের অধিকাংশ অধিবাসীই ছিলেন অ-মুসলমান। এই যুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাহাদের অবদান অনস্বীকার্য। কেবলমাত্র মুসলমান যুগ বলিয়া চিহ্নিত করিলে ইতিহাসকে বিকৃত করা হইবে।

ইতিহাসে যুগবিভাগ

মধ্যযুগ কেন বলা হইবে

অতএব ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল শাসনের অবসান পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে 'মধ্যযুগে ভারত' বলিয়া চিহ্নিত করাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে ইতিহাসে কোন যুগকেই বছরের গণ্ডিতে অবদ্ধ করা যায় না। এই যুগের যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে সেগুলি হইল যথাক্রমে শাসনব্যবস্থায় মুসলমান শাসক ও অভিজাতবৃন্দের প্রাধান্য, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, সামাজিক কুসংস্কার ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, বহির্বাণিজ্যে ভারতীয়দের নগণ্য ভূমিকা এবং অর্থনীতিতে ইকতা ও জায়গীরদারী ব্যবস্থা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংস্কারকামী ভক্তিবাদী ও সুফিবাদী আন্দোলন এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের গতি কখনো থামিয়া থাকে না। স্বাভাবিক নিয়মেই সুলতানী শাসনের পতন ঘটে এবং মুঘল যুগ শুরু হয়। এই যুগে সামন্ত সমাজের পতন ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে

আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে। স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে এবং বিদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিবিড় হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় | সুলতানী যুগের ঐতিহাসিক উপাদান

প্রাচীন যুগের তুলনায় সুলতানী যুগের ইতিহাস অনেক স্পষ্ট। কারণ এই যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপাদানের কোন অভাব নাই। বিশেষ করিয়া লিখিত বিবরণ প্রচুর। এ যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানসমূহকে সাধারণতঃ চারিভাগে ভাগ করা যায়—(ক) সরকারী দলিলপত্র, (খ) ঐতিহাসিক সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ (গ) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, (ঘ) মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন।

চারিটি উৎস

সুলতানী যুগে সরকারী দলিলপত্র সযত্নে রক্ষিত হইত। তবে এই যুগের অনেক দলিলপত্র পরবর্তী যুদ্ধবিগ্রহের ফলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে যেগুলি আছে সেগুলি হইতে এই যুগের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে।

সরকারী দলিল ইত্যাদি

সুলতানী যুগে অনেক ঐতিহাসিক সাহিত্য পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান পণ্ডিতগণ ইতিহাস রচনার দিকে বিশেষ নজর দিয়াছিলেন বলিয়াই এই যুগের ইতিহাস রচনা সহজ হইয়াছে। সুলতানী যুগের ইতিহাসের প্রধান উৎস হইল মিনহাজউদ্দিন সিরাজ লিখিত 'তবকাৎ-ই-নাসিরী', আমীর খসরুর 'খাজাইন-উল-ফুতু', জিয়াউদ্দিন বরণীর 'তরীখ্-ই-ফিরুজশাহী', আইন্-উল-মুল্‌ক-এর 'মুনসাৎ-ই-মহরা', ইসামি রচিত 'ফতোয়া-উস্-সালাতিন'. সুলতান ফিরুজ শাহের স্বরচিত 'ফতোয়াৎ-ই-ফিরুজশাহী', শামস্-ই-সিরাজ-আফিক রচিত 'তরীখ-ই-ফিরুজশাহী', নিয়ামৎউল্লা রচিত 'মুখজান-ই-আফঘান' প্রভৃতি। এইসব গ্রন্থ অধিকাংশই ফরাসী ভাষায় লেখা। এই সকল গ্রন্থ হইতে সুলতানী যুগের নানাবিধ মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া যায়। এই যুগ সম্বন্ধে সমসাময়িক হিন্দু লেখকদেরও অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও সাহিত্য আছে। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ হইতে তদানীন্তন ভারতের সামাজিক অবস্থা, ধর্মমত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। সুলতানী যুগের সুফী সাহিত্য, শিখদের গ্রন্থসাহেব, কবীরের দোঁহা, বাংলার বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি হইতে সে যুগের ধর্ম ও সমাজজীবনের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিকদের রচনা

ধর্মীয় সাহিত্য

সুলতানী যুগে যে সব বিদেশী পর্যটক এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের রচনায় সেই যুগের অজস্র ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে ইবন বতুতা, নিকোলো কণ্টি, আবদুর রেজ্জাক, পায়েজ, নুন্যিজ এবং রুশ পর্যটক আথানুসিয়াস নিকিতন-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইবন বতুতা মহম্মদ-বিন তুঘলকের অধীনে কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত 'রিহালা'

পর্যটকদের বিবরণী

সুলতানী আমলের ইতিহাসের এক মূল্যবান উপাদান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চীনদেশীয় পর্যটক মাহুয়ান বাংলাদেশ ভ্রমণ করিয়া সেই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। ইটালীর পর্যটক মার্কো পোলো ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

সুলতানী যুগের শিল্প, স্থাপত্য ও মুদ্রা হইতেও সে যুগের শিল্প, ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। দিল্লীর কুতুব মিনার, বিজাপুরের প্রাসাদ, গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ও বড় সোনা মসজিদ প্রভৃতি সে যুগের ইতিহাসের অন্যতম সাক্ষ্য। সুলতানী যুগের মুদ্রাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ঐ যুগের ধাতু-শিল্প এবং বিভিন্ন সুলতানের মুদ্রানীতি সম্বন্ধে জানা যায়।

মধ্যযুগে লিখিত বিবরণের পরিমাণ যথেষ্ট থাকায় অপরাপর উপাদানগুলি ততটা অপরিহার্য নয়।

তৃতীয় অধ্যায় | ভারতে মুসলমান আগমনের সূত্রপাত

যে সময় ভারতবর্ষের রাজপুত জাতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল ঠিক সেই সময় আরব দেশীয় মুসলমানরা দিগ্বিজয়ে বাহির হয়। মুসলমানরা ছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের অনুগামী।

ইসলাম ধর্মের অবির্ভাব

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরব দেশে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। তিনি আরববাসীদের নূতন ধর্মমতে দীক্ষিত করিয়া এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করেন। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরেই আরবরা দিগ্বিজয়ে ও ধর্মপ্রচারে বাহির হয়। একশত বৎসর মধ্যেই তাহারা পৃথিবীর বহু স্থানে ইসলাম ধর্ম প্রচারে সমর্থ হয় এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন জুড়িয়া এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে।

সিন্ধু জয় ও তার ফলাফল

আরবদের সিন্ধু জয়। ভারতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ আসিয়াছিল আরব হইতে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই আরবেরা পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে লুণ্ঠন-উদ্দেশ্যে আক্রমণ চালাইতে থাকে, কিন্তু অষ্টম শতকের আগে তাহারা ভারতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে নাই। ইরাকের আরব শাসনকর্তা হজ্জাজ ভারতে ইসলাম প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হন। এই সময় তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির এক সুযোগ উপস্থিত হয়। সিন্ধুরাজ্যের দেবল বন্দরের অদূরে সমুদ্রবক্ষে একখানি আরব জাহাজ জলদস্যুরা লুণ্ঠন করে। হজ্জাজ সিন্ধুরাজ দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। দাহির এই ক্ষতিপূরণে অসম্মত হইলে হজ্জাজ দাহিরের বিরুদ্ধে কয়েকটি সামরিক অভিযান পাঠান। মহম্মদ বিন কাশিম নামক এক উৎসাহী তরুণ সেনাপতির নেতৃত্বে যে সামরিক অভিযান পাঠান সেইটেই সফল

হয়। ৭১১ খ্রীস্টাব্দে বিন কাশিম দেবল বন্দর ও নিরুন নগর দখল করিয়া সিন্ধুনদ অতিক্রম করেন। রওয়ার নামক স্থানে দাহির প্রচণ্ড বিক্রমে আরব আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হন। ইহার পর বিন কাশিম আলোয়ার, মুলতান প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া সমগ্র সিন্ধুদেশে মুসলমান আধিপত্য স্থাপন করেন।

সিন্ধুদেশে আরব-শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও ভারতের অন্যত্র কোন অঞ্চলে আরব প্রভুত্ব স্থায়ী হয় নাই। সিন্ধুদেশে শাসনের ক্ষেত্রে আরবরা উদারনীতি গ্রহণ করিয়াছিল। একজন শাসনকর্তার হস্তে সমগ্র দেশটির শাসনভার দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাকে খলিফার নিকট বাৎসরিক কর পাঠাইতে হইত। হিন্দুদের প্রতি তাহারা খারাপ ব্যবহার করিত না। জিজিয়া ও অন্যান্য কর দানে স্বীকৃত হইলে তাহারা ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত। প্রায় তিনশত বৎসরকাল সিন্ধুদেশ আরবদের শাসনাধীনে ছিল। সিন্ধুদেশে আরব অধিকারকে ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে একটি নগণ্য ঘটনা মাত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাকে একটি নিষ্ফল বিজয় হিসাবে ধরা হয়। আরবগণ ভারত জয়ের জন্য সিন্ধুদেশকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে নাই এবং ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার সম্ভব হয় নাই। তবে আরব শাসনকালে সিন্ধুদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়।

একটি নিষ্ফল জয়

চতুর্থ অধ্যায় | ভারতে মুসলমান শাসনের সূচনা

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অবস্থা। হূন আক্রমণের সময় হইতে গজনীর সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণকাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচশত বৎসর উত্তর ভারতে বিদেশী আক্রমণ ঘটে নাই। স্বভাবতই এই অঞ্চলের শাসনকর্তাগণ মনে করিয়াছিলেন যে ভারত কখনো আক্রান্ত হইবে না। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে আত্মতুষ্টির মনোভাব দেখা দেয়। ইতিমধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এই অবনতির প্রভাব রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পড়িয়াছিল। ভারতবর্ষ তখন অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্যবোধ বলিয়া কিছু ছিল না।

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অসংখ্য ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য ছিল। এইসব রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল পাঞ্জাবের হিন্দু শাহী বংশ, কাশ্মীরে লোহর বংশ, মালব অঞ্চলে পরমার বংশ, খাজুরাহো অঞ্চলে চন্দেল্ল বংশ, মেওয়ারের গুহিল বংশ, দিল্লী-আজমীরের চৌহান বংশ, জব্বলপুরের কলচুরি বংশ এবং কনৌজের গাহড়বাল বংশ। এই সকল রাজবংশের অনেক গুণ ছিল সন্দেহ নাই,

কিন্তু তাহাদের অহমিকা—বংশ মর্যাদা, ব্যক্তিগত সাহস ও রণনৈপুণ্য লইয়া দর্প, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ তাহাদের সর্বনাশের কারণ হিসাবে দেখা দিয়াছিল। মালবের পরমার এবং গুজরাটের চালুক্য বংশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা ছিল। কনৌজের গাহড়বাল ও দিল্লী-আজমীরের চৌহান বংশের মধ্যে ছিল চিরশত্রুতা। চন্দেল্লরা কলচুরি বংশের অবসান ঘটায়। এইসব কারণে সুলতান মামুদের পক্ষে ভারত আক্রমণ করা সহজ হইয়াছিল।

সুলতান মামুদের ভারত অভিযান। অষ্টম শতাব্দীর সূচনায় উত্তরদিক হইতে যে আরব মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করেন তাঁহারা সিন্ধুদেশ জয় করিয়াছিলেন। ফলে সিন্ধুদেশ ভারতের বাকি অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর শুরু হইতেই ভারত বারংবার তুর্কী মুসলমান আক্রমণকারীদের আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার নামে তাঁহারা এইসব অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন।

মামুদ ছিলেন আফগানিস্তানের অন্তর্গত তখনকার দিনে পরিচিত খোরাসান অঞ্চলের এক রাজ্যের শাসক। তাঁহার রাজধানী ছিল গজনিতে। কথিত আছে যে তিনি ৯৯৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১০৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সতেরবার ভারত অভিযান করেন। তাঁহার প্রাথমিক অভিযান শুরু হয় হিন্দু শাহী রাজ্যের বিরুদ্ধে। পেশোয়ার ও পাঞ্জাব তখন হিন্দু শাহী রাজাদের অধিকারে ছিল। মামুদ মুলতানের মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেন। হিন্দু শাহী রাজা জয়পাল মামুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পেশোয়ারের নিকট এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি আত্মহত্যা করেন। ইহার পর মামুদ ১০২৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রায় প্রতি বৎসর শীতকালে ভারত আক্রমণ ও অনুপ্রবেশ করিতে থাকেন। এইসব অভিযানের সময়ে মামুদ নিয়মিতভাবে হিন্দু মন্দিরগুলির ক্ষতিসাধন করেন এবং বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যের রাজারা বংশপরম্পরায় যে অতুল ঐশ্বর্য মন্দিরগুলিতে সঞ্চিত করিয়াছিলেন তাহা তিনি লুণ্ঠন করেন। ইহা ছাড়া স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে খেসারত আদায় করিয়া ও লুণ্ঠিত সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র উটের পিঠে বোঝাই করিয়া ফিরিয়া যাইতেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে মামুদের এই আক্রমণের সীমানা ছিল বিরাট—পশ্চিমে সোমনাথ (কাথিয়াওয়াড়) হইতে পূর্বে গঙ্গা উপত্যকার কনৌজ পর্যন্ত। তবে ভারতের যে অঞ্চলটি তিনি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন তাহা হইল পাঞ্জাব। সে সময় উত্তর ভারতে কোন শক্তিশালী রাজ্য না থাকায় মামুদ অবলীলাক্রমে এইসব লুণ্ঠন-কার্য চালাইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। ১০৩০ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান।

মামুদের ভারত আক্রমণের স্বরূপ

সুলতান মামুদ প্রধানতঃ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই ভারতে অভিযানগুলি পরিচালিত করিয়াছিলেন। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। এ কারণে মামুদের আক্রমণের সময় হইতেই ভারতে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এইসব অভিযানগুলির কয়েকটির স্থায়ী ফল লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, পাঞ্জাব অঞ্চল মামুদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, মামুদের

হিংস্র আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে একদিকে যেমন মুসলমান আক্রমণকারীদের সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনে ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল, অপরদিকে তেমনি তাহাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিও শিথিল হইয়া পড়ে। তৃতীয়ত, তাঁহার আক্রমণের ফলে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির সামরিক শক্তি আরও দুর্বল হইয়া পড়ে, ফলে পরবর্তী মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিরোধ করিবার শক্তি কিছুটা কমিয়া গিয়াছিল। সবশেষে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিরাট পরিবর্তন ঘটে। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ভারতের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে চিহ্নিত পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া তুর্কী মুসলমানগণ যে-কোন সময়ে গাঙ্গেয় সমভূমি বা উত্তর ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পথ সুগম করিল।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের ফলাফল

অলবিরুণীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত। অলবিরুণীর প্রকৃত নাম ছিল আবু রিহান। তিনি খিভা প্রদেশে ৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মামুদ ১০১৭ খ্রীস্টাব্দে খিভা জয় করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসেন এবং তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সভায় স্থান দেন। অলবেরুণীর পাণ্ডিত্য বিশ্ববিশ্রুত। তিনি হিন্দু শাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়নের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করেন। তিনি 'তহ্-কক্-ই হিন্দ' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, রসায়ন বিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতির এক মনোজ্ঞ বিবরণ রহিয়াছে। তাঁহার বৃত্তান্ত হইতে তৎকালীন ভারতীয় আচার-ব্যবহার ও রাজনীতি সম্বন্ধেও জানিতে পারা যায়। ভারতের ছোট ছোট রাজ্যগুলির অবস্থা ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাও তাঁহার বিবরণীতে পাওয়া যায়।

অলবেরুণী লিখিয়াছেন হিন্দুদের সহিত বিদেশাগত মুসলমানদের পার্থক্য ছিল। ভারতীয়গণ ইহাদের ম্লেচ্ছ বলিত। তাহারা মনে করিত যে তাহাদের মত উন্নত মানের আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতি অন্য কোন জাতির নাই। তৎকালীন হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা কঠোর ছিল। সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। সতীদাহ ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। সাধারণ লোকেরা মূর্তিপূজা করিত। কিন্তু জ্ঞানীগুণীরা জানিতেন যে ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়। কাব্য, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে ভারতীয়রা বিশেষ উন্নত ছিল। হিন্দুদের আইন ও বিচারব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে ইহা উদার, ন্যায়সম্মত ও মানবতাবোধসম্পন্ন ছিল। ফৌজদারী দণ্ডবিধি কঠোর ছিল না। করভার লঘু ছিল। তিনি ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিলেও ভারতীয় পণ্ডিতদের উদ্ধত, দাম্ভিক ও আত্মাভিমানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে জ্ঞানকে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয় এবং নূতন চিন্তাধারা অগ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রগতি প্রায় বন্ধ হইয়া যায়।

ভারতীয়দের সম্বন্ধে মন্তব্য

মহম্মদ ঘোরী। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর সেলজুক সাম্রাজ্য নামে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সিরিয়া, ইরান ও ট্রান্স-অক্সিয়ানা। মামুদের বংশধররা সেলজুক আক্রমণের ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত। এমন কি তাহারা গজনী রাজ্যের রাজধানী পাঞ্জাবের লাহোরে স্থানান্তরিত করে। তৎকালীন উত্তর ভারতের রাজপুত রাজারা তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এমন কি কয়েকবার তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভও করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে ঘুর রাজ্যটি ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। ঘুররা প্রথমে গজনীর অধীনে ছিল। কিন্তু গজনীর সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ঘুর রাজ্যের অধিপতি আলাউদ্দিন হোসেন গজনী দখল করিয়া লন। আলাউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দিন গজনী রাজ্য ও উহার অধীনস্থ কাবুল প্রদেশ জয় করিয়া ইহার শাসনভার ভ্রাতা শিহাবুদ্দিন (বা মইজউদ্দিন) বিন সামের হস্তে অর্পণ করেন। শিহাবুদ্দিন বিন সাম 'মহম্মদ ঘোরী' নামে পরিচিত। তিনিই ছিলেন ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

ঘুর রাজ্য

মহম্মদ ঘোরী ভারতে স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেন। ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুলতান ও উচ দখল করেন। তিনি ১১৭৮ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু গুজরাটের চৌলুক্য বংশীয় ভীমদেব এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। ইহার পর ঘোরী পাঞ্জাব দখল করেন।

মুলতান ও পাঞ্জাব অধিকার করিয়া ঘোরী দিল্লী ও আজমীড়ের অধিপতি চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে থানেশ্বরের ১৪ মাইল দক্ষিণে তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় পক্ষের শক্তি পরীক্ষা হয়। হিন্দু সৈন্যের বিক্রমে মুসলমান বাহিনী আতঙ্কিত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করে। মহম্মদ ঘোরী গুরুতররূপে আহত হন। ইহার পর ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় তরাইনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এইবার মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করেন। পৃথ্বীরাজ বন্দী হইয়া নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। এই যুদ্ধের ফলে রাজপুত শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং উত্তর ভারতে মুসলমান আধিপত্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়।

মহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণ : তরাইনের যুদ্ধ

ইহার পর একে একে দিল্লী, আজমীড়, মীরাট, আলিগড় প্রভৃতি স্থান ঘোরীর অধিকারে আসে। ১১৯৪ খ্রীস্টাব্দে কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র চন্দবারের যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। ঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন রণথম্ভোর, গুজরাট ও কালিঞ্জর অধিকার করেন এবং অপর সেনাপতি বক্তিয়ার খলজী বিহার ও বাঙলাদেশ জয় করিতে সমর্থ হন। ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পূর্বেই উত্তর ভারতে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হইয়া যায়।

১২০৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়। ঘুর সাম্রাজ্যের ভারতীয় অংশের অধীশ্বররূপে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক।

কুতুবউদ্দিনের শাসনকাল হইতে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করিয়া বাবরের মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত মুসলমান শাসন ভারতের ইতিহাসে 'তুর্কী-আফগান যুগ' বা 'সুলতানী যুগ' নামে খ্যাত। এই যুগে নিম্নলিখিত রাজবংশগুলি দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল ঃ দাস বংশ (১২০৬—১২৯০ খ্রীঃ), খলজী বংশ (১২৯০—১৩২০ খ্রীঃ), তুঘলক বংশ (১৩২০—১৪৩৩ খ্রীঃ), সৈয়দ বংশ (১৩৩৪—১৪৫১ খ্রীঃ) ও লোদী বংশ (১৪৫১—১৫২৬) খ্রীঃ)।

সুলতানী শাসনের সূত্রপাত

কুতুবউদ্দিন্ আইবক। কুতুবউদ্দিন দাসরূপে জীবন শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু মহম্মদ ঘোরী তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তি দিয়া প্রথমে সেনাপতি ও পরে শাসনকর্তা-রূপে নিয়োগ করেন। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন তাঁহার ভারতস্থিত রাজ্যাংশের শাসকরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। গজনীর তুর্কী সুলতান তাঁহাকে সুলতান আখ্যায় ভূষিত করেন। কুতুবউদ্দিন স্বাধীন সুলতানরূপে মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতে আর কোন স্থানে মুসলমান আধিপত্য প্রসার লাভ করে নাই। তিনি অবশ্য একবার অল্পদিনের জন্য গজনী নিজ অধিকারে লইয়া আসেন। তিনি বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। নাসিরউদ্দিন কুবাচার সহিত তাঁহার ভগ্নির এবং ইলতুৎমিসের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন।

কুতুবউদ্দিন চরিত্রের উদারতা ও দানশীলতার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি 'লাখবক্স' বা 'লক্ষ দাতা' নামে পরিচিত ছিলেন। রাজ্যের শান্তি রক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতির জন্য তিনি সর্বদাই তৎপর থাকিতেন। তবে শাসন-ব্যবস্থায় তিনি নূতন কোন সংস্কার প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। তিনি স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক এবং সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। দিল্লী ও আজমীড়ে তিনি দুইটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁহার রাজসভা হাসান, নিজামি এবং আরও অনেক পণ্ডিত অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১২১০ খ্রীস্টাব্দে পোলো খেলার সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া তাঁহার মৃত্যু হল।

কুতুবউদ্দিনের কৃতিত্ব

ইলতুৎমিস্। ১২১০ খ্রীস্টাব্দে কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাম শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু রাজ্যশাসনে তাঁহার কোন যোগ্যতা ছিল না। সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাস পরেই রাজ্যের ওমরাহগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া কুতুবউদ্দিনের জামাতা ইলতুৎমিসকে সিংহাসনে স্থাপন করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ইলতুৎমিসকে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, যেমন উত্তর ভারতের সামন্তনায়কদের বিদ্রোহ, নাসিরউদ্দিন কুবাচার বিরোধিতা,

তাজউদ্দিন ইল্‌দুজ-এর দিল্লীর সিংহাসন দাবি, বাঙলার শাসনকর্তার স্বাধীনতা ঘোষণা। ইলতুৎমিস প্রথমেই উত্তর ভারতের সামন্ত নায়কদের বিদ্রোহ দমন করিয়া বদাউন, বেনারস ও অযোধ্যায় নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। দ্বিতীয়ত, তরাইনের নিকটে ইলদুজকে পরাজিত ও বন্দী করেন। তৃতীয়ত, কুবাচার নিকট হইতে লাহোর উদ্ধার করেন। কুবাচা সিন্ধু অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হন। ইলতুৎমিস মুলতান ও উচ অধিকার করেন। চতুর্থত, বাঙলার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তাঁহাকে দুইবার অভিযান চালাইতে হইয়াছিল। এই দুই অভিযানের পর বাঙলায় তাঁহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া তিনি রণথম্ভোর ও গোয়ালিয়র অধিকার করেন। এইভাবে তিনি উত্তর ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য জয়

ইলতুৎমিস যখন তাঁহার রাজ্যকে সংহত করিয়া তুলিয়াছিলেন ও রাজ্যের সীমানা বিস্তার করিয়া চলিতেছিলেন তখন মোঙ্গল আক্রমণকারীরা দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে ভারত সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের হাতে পরাজিত খিভার শাসকের পুত্র জালালউদ্দিনকে অনুসরণ করিয়া তাহারা ভারতে প্রবেশ করে। জালালউদ্দিন সাময়িকভাবে দিল্লীতে অবস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিলে ইলতুৎমিস তাঁহাকে সেই অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। ফলে জালালউদ্দিন সিন্ধুদেশের বহু স্থান বিধ্বস্ত করিয়া পারস্যে পলায়ন করেন। কিছুকালের মধ্যে মঙ্গোল বাহিনীও জালালউদ্দিনকে অনুসরণ করিয়া ভারত ত্যাগ করিলে দেশ একটা বিধ্বংসী আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। ইহাতে ইলতুৎমিসের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মঙ্গোল আক্রমণ

ইলতুৎমিস ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের খলিফার নিকট হইতে অনুমোদন লাভ করেন এবং 'সুলতান-ই-আজম' উপাধিতে ভূষিত হন। ইহাতে তাঁহার ও তাঁহার সাম্রাজ্যের গৌরব বৃদ্ধি পায়। এই সময় হইতেই দেশে আরবী মুদ্রা ও রূপার টাকার প্রচলন হয়। ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দে ইলতুৎমিসের মৃত্যু হয়।

ইলতুৎমিসকে দাস বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান বলা হয়। নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে তিনি ভারতে নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাম্রাজ্য বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যদি দুর্বল সুলতান হইতেন তাহা হইলে সমগ্র সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইত। বহু বিদ্বান্‌ ও গুণী ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়া তিনি দিল্লীকে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেন। দিল্লীর একাধিক মসজিদ, মাদ্রাসা ও মিনারগুলি নির্মাণে তিনি উদ্যোগী হন। তাঁহার আমলে সুলতানী শিল্প-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি কুতুব মিনারের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়।

কৃতিত্ব

যদিও দিল্লীর প্রথম দুই সুলতান মুসলিম সেনানায়কদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, ইলতুৎমিস কিন্তু সুলতান পদবিকে বংশানুক্রমিক করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার কন্যা রাজিয়াকে নিজের পুত্রের অপেক্ষা বেশি যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সুলতানা রাজিয়া সাহসিকা ও

সুলতান রাজিয়া

বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন কিন্তু অন্ধ ধর্মীয় সংস্কারবশতঃই সেনাপতিরা নারীর অধীনস্থ হইয়া থাকাটা অসম্মানজনক বলিয়া মনে করেন। রাজিয়া চারি বৎসর রাজত্ব করেন, পরে তাঁহাকে হত্যা করা হয় (১২৪০ খ্রীঃ)।

সুলতানা রাজিয়ার পরে যে দুইজন সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহারা নামেমাত্র সুলতান ছিলেন। এই সময় সাম্রাজ্যে নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মঙ্গোলরা বারংবার ভারত আক্রমণ করে এবং ১২৪১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা লাহোর অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নাসিরউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজিয়ার ভ্রাতা নাসিরউদ্দিন ছিলেন শান্তিপ্রিয় ও ধর্মপ্রাণ সুলতান। তিনি প্রায় ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজকার্যে তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার শ্বশুর উলুঘ খাঁর (পরে বলবন্) হস্তে শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পিত থাকায় তাঁহার সাম্রাজ্য অটুট থাকে।

গিয়াসউদ্দিন বলবন। নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর ১২৬৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মন্ত্রী উলুঘ খাঁ 'গিয়াসউদ্দিন বলবন্' নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অভিজ্ঞ শাসক বলবন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেশকে কুশাসন ও বিশৃঙ্খলার হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন।

বিভিন্ন সমস্যা ও সেগুলির সমাধান নীতি

শূন্য রাজকোষ, তুর্কী-আমীরদের ক্রমবর্ধমান ঔদ্ধত্য ও দিল্লীর সন্নিকটে মেওয়াটী দস্যুদের ক্রমবর্ধমান উপদ্রব, মঙ্গোল আক্রমণের সমস্যা, কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার জন্য রাজশক্তির প্রতি জনসাধারণের অশ্রদ্ধা প্রভৃতি সর্বত্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই অবস্থা হইতে দেশকে উদ্ধার করিয়া রাজশক্তিকে শক্তিশালী করিতে এবং সমাজের সংহতি সাধন করিতে বলবন বদ্ধপরিকর হইলেন। শাসক হিসাবে তাঁহার সর্বাধিক কৃতিত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল, তিনি নিজের শক্তিকে দেশের সংহতি সাধনের জন্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি অপেক্ষা সংহতি সাধনেই তিনি অধিক মনোযোগী ছিলেন। তিনি রাজশক্তির গৌরবই কেবল বৃদ্ধি করেন নাই, ইহাকে কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে বাস্তবে পরিণত করেন।



গিয়াসউদ্দিন বলবন

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই গিয়াসউদ্দিন রাজ্যমধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে উদ্যোগী হন। তিনি প্রভাবশালী ওমরাহদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন। তিনি কুখ্যাত 'চল্লিশ চক্রে'র ক্ষমতা নানা অজুহাতে ধ্বংস করিয়া দেন এবং 'চক্রে'র অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ওমরাহদের উচ্চপদে নিযুক্ত করেন। ইহা ছাড়া তিনি ওমরাহদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিবার জন্য বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করেন।

ওমরাহদের ক্ষমতা হ্রাস

তিনি সৈন্যবিভাগ পুনর্গঠন করেন। তিনি অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে নতুনভাবে গড়িয়া তুলেন এবং এই দুইটির পরিচালনার দায়িত্ব সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত সেনাপতিদের উপর ন্যস্ত করেন।

মেওয়াটের অধিবাসী রাজপুতগণ অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল। তাহারা চতুস্পার্শ্বস্থ প্রদেশ-সমূহে লুণ্ঠন ও অত্যাচার করিত। বলবন কঠোরহস্তে মেওয়াটী দস্যুদের দমন করিয়া মেওয়াটে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। দোয়াব অঞ্চলে দুর্ধর্ষ দস্যুদল সাম্রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করিতেছিল। ইহাদের অত্যাচারে ব্যবসা-বাণিজ্য লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। বলবন্ ইহাদের প্রধান ঘাঁটিগুলি অধিকার করিয়া ইহাদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করেন। ইহা ছাড়া রোহিলখণ্ডের শান্তিবিঘ্নকারীদের কঠোরভাবে দমন করেন। বাঙলার শাসনকর্তা তুঘ্রিল খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে বলবন তাঁহাকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া বাংলায় উপস্থিত হন এবং তুঘ্রিলকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে বাঙলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন

বলবনের শাসনকালে মঙ্গোলগণ বারংবার ভারতের পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আক্রমণ করিতে থাকে। তিনি মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সীমান্তে বহু দুর্গ নির্মাণ করেন, পুরাতন দুর্গের সংস্কার সাধন করেন এবং দক্ষ বিশ্বস্ত সেনাপতিদের অধীনে সুশিক্ষিত সৈন্যদল এই অঞ্চলে মোতায়েন রাখেন। ১২৮৫ খ্রীস্টাব্দে মঙ্গোলরা মুলতান আক্রমণ করে। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে যাইয়া বলবনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ নিহত হন, কিন্তু মঙ্গোলরা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। পুত্রের মৃত্যুতে বলবন শোকাভিভূত হইয়া পড়েন এবং ইহার দুই বৎসর পরে ১২৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

বহিঃশত্রু মঙ্গোলদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ও স্বেচ্ছাচারী, উচ্চাভিলাষী আমীরদের দমন করিয়া বলবন সুলতানী সাম্রাজ্যকে আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করেন। রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা রাজ্য সংগঠন করার যে আদর্শ তিনি গ্রহণ করেন তাহা তাঁহার অসাধারণ দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। বলবন কেবল সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন তাহা নহে, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপেও তিনি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক আমীর খসরু তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

বলবনের কৃতিত্ব

ষষ্ঠ অধ্যায় | খলজী বংশ

বলবনের মৃত্যুর পর কায়কোবাদ সম্রাট হন। কিন্তু তাঁহার বিলাসিতা ও অকর্মণ্যতার ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অবশেষে তথাকথিত দাস বংশ উৎখাত হইল

সামান প্রদেশের শাসনকর্তা জালালউদ্দিন খলজীর হাতে। খলজীগণ মূলতঃ তুর্কী ছিল। তবে দীর্ঘদিন ধরিয়া আফগানিস্তানে বসবাস করায় তাঁহারা আফগানদের আচার-আচরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে খলজী রাজবংশের স্থাপন খলজী বিপ্লব নামে পরিচিত। জালালউদ্দিন যখন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন (১২৯০ খ্রীস্টাব্দে) তখন তিনি নিজে বৃদ্ধ। কঠোরহস্তে রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার রাজত্বকালে মঙ্গোলরা বারবার ভারত আক্রমণ করে। তিনি তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। অবশেষে এই বৃদ্ধ সুলতানকে অপসারিত করিলেন তাঁহারই পরম স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন খলজী।

আলাউদ্দিন খলজী। ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পর আলাউদ্দিনকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। এই সমস্যাগুলির মধ্যে ছিল আমীর-ওমরাহদের মধ্যে অনমনীয় মনোভাব, রাজদরবারে আমীরদের ষড়যন্ত্র, তুর্কী জাতীয় সেনাপতিদের ঔদ্ধত্য, নব-মুসলমানদের বিদ্রোহ, মঙ্গোলদের ক্রমান্বয়ে ভারত আক্রমণ

বিদ্রোহ দমন

এবং রাজপুতনা, মালব, গুজরাট ও বাঙলাদেশে বারংবার বিদ্রোহ। কিন্তু আলাউদ্দিন এই সকল বিপদে ভীত হইলেন না, বরঞ্চ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত এই সমস্ত বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র দমন করেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে রাজ্যে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র না দেখা দেয় তাহার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।


আলাউদ্দিন খলজী

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে দুর্ধর্ষ মঙ্গোলরা খিলজী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বারবার আক্রমণ চালাইতে থাকে। তাঁহার সময় মঙ্গোলরা মোট ছয়বার ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। তিনি তাঁহাদের দমন করিতে কৃতসংকল্প হন। ফলে মঙ্গোলদের তিনি প্রতিবারই পরাজিত ও বিতাড়িত করিতে সক্ষম হন। জাফর খাঁ, উলুঘ খাঁ, গাজী তুঘলক প্রভৃতি সুদক্ষ সেনাপতির বিক্রম ও কৌশলে প্রতিবারেই মঙ্গোল সৈন্য বিধ্বস্ত হন। তিনি সীমান্তের দুর্গসমূহ সুরক্ষিত করেন এবং নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মঙ্গোলগণ একবার সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করিলে আলাউদ্দিনের আদেশক্রমে একদিনে প্রায় ত্রিশ হাজার নব মুসলমান মঙ্গোলকে হত্যা করা হয়।

মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

আলাউদ্দিন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়াও তাঁহার

উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় নাই। তিনি আলেকজাণ্ডারের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন। তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজ্যসমূহ নিজ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করেন।

১২৯৮ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দিন গুজরাট জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৩০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি রণথম্ভোর দুর্গ অধিকার করেন। ১৩০১ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাজপুতনার বিখ্যাত রাজ্য মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। তিন মাস অবরোধের পর তাঁহার সৈন্যদল চিতোর দখল করে। ১৩০৫ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দিন মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধার, চন্দেরী প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মালব জয় সম্পূর্ণ করেন। গুজরাট জয়ের ফলে হিন্দুদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র মুসলমানদের হস্তগত হয়। মেবার জয়ে হিন্দুদের রাজনৈতিক শক্তিকেন্দ্র নষ্ট হইয়া যায় এবং মালব জয়ে তৎকালীন হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র লোপ পায়। এইভাবে সমগ্র উত্তর ভারতে আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার : উত্তর ও মধ্য ভারত

আলাউদ্দিন দক্ষিণ ভারত জয়ের দায়িত্ব দিয়াছিলেন মালিক কাফুরের উপর। এই সময় দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিরাজ রামচন্দ্র বার্ষিক করদান বন্ধ করিয়াছিলেন এবং গুজরাটরাজ কর্ণদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রান্ত হইল। রামচন্দ্র পরাজিত হইয়া আলাউদ্দিনের বশ্যতা স্বীকার করেন। লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে কাফুর তাঁহার যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। প্রতাপরুদ্র পরাজিত হইয়া প্রচুর ধনরত্ন দিয়া কাফুরের আনুগত্য স্বীকার করেন। ইহার পর কাফুর অতর্কিত আক্রমণে হোয়েসলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালকে পরাজয় স্বীকার করিতে ও বার্ষিক কর দিতে বাধ্য করেন। এই সময়ে পাণ্ড্য রাজ্যের রাজা বীর পাণ্ড্যের সহিত তাঁহার ভ্রাতা সুন্দর পাণ্ড্যের সিংহাসন লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। সুন্দর পাণ্ড্য কাফুরের সাহায্যপ্রার্থী হইলে কাফুর পাণ্ড্য রাজ্য জয় করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে দেবগিরিরাজ পুনরায় বিদ্রোহ করিলে কাফুর দেবগিরি রাজ্যটি খলজী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তাহার পর কাফুর কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল দখল করিয়া হোয়েসল রাজ্যটিও সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতের সমগ্র অঞ্চল আলাউদ্দিন আপন শাসনাধীনে আনিতে চেষ্টা করেন নাই। ঐ অঞ্চল হইতে কর ও আনুগত্য আদায় করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

দক্ষিণ ভারত জয়

আলাউদ্দিনের শেষ জীবন অশান্তিতে অতিবাহিত হয়। তিনি মালিক কাফুরের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া পড়েন। রাজপুতগণ চিতোর পুনরাধিকার করে এবং দেবগিরি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৩১৬ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

আলাউদ্দিনের শাসনপদ্ধতি। আলাউদ্দিন কেবলমাত্র সমরকুশলী বিজেতাই ছিলেন না। সামরিক বিজয়ের সহিত সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া তাঁহার বিজয়কে স্থায়ী রূপদান করিয়াছিলেন। শাসক হিসাবে আলাউদ্দিন সুলতানী যুগে এক বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। বিদ্রোহ দমন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী অপরিহার্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার সামরিক বাহিনী সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা আলাউদ্দিন তাহার প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাউদ্দিন উলেমাদের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিতেন না। আইন-কানুন বলিতে তিনি সুলতানের ইচ্ছাই বুঝিতেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও কল্যাণের নিমিত্ত যাহা

আলাউদ্দিনের শাসনব্যবস্থা



প্রয়োজন সুলতান তাহাই করিবেন, কোন বিধিনিষেধ গ্রাহ্য করিবেন না, ইহাই ছিল তাঁহার নীতি। ধর্মনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রনীতি পরিচালনা তিনি পছন্দ করিতেন না।

আলাউদ্দিনের রাজত্বের প্রথমদিকে বহু ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। এই বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রগুলি কঠোরহস্তে দমন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, প্রজাদের মধ্যে কেন বিদ্রোহভাব দেখা দেয় তিনি তাহার কারণ অনুসন্ধান করেন। তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসেন যে প্রধানত চারিটি কারণে দেশে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়, যথা সুলতানের রাজকার্যে অবহেলা, মদ্যপান, আমীর ও ওমরাহদের অবাধ মেলামেশা এবং প্রজাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা। আলাউদ্দিন এই ত্রুটির মূলোৎপাটনে উদ্যোগী হইলেন। তিনি সমস্ত নিষ্কর জমি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করেন এবং প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর বসান। তিনি আমীরদের গৃহে সামাজিক উৎসবাদি বন্ধ করিয়া দেন। সুলতানের অনুমতি ভিন্ন আমীর-ওমরাহরা পরস্পরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবে না বলিয়া আদেশ জারি করেন। সাম্রাজ্যের সমস্ত সংবাদ যাহাতে তিনি পান তাহার জন্য অসংখ্য গুপ্তচর নিয়োগ করেন। এইসব বিধিনিষেধের ফলে অভিজাতদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে।

বিদ্রোহের কারণ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা

আলাউদ্দিন কেবল দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন না, শাসকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা আলাউদ্দিন তাঁহার প্রাথমিক দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল।

কঠোর শাসনব্যবস্থা

অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তাহার ফলাফল। আলাউদ্দিন রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য কৃষকদের সহিত খাজনার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হন। স্থানীয় খাজনা-আদায়কারীরা কৃষকদের নিকট হইতে যাহাতে বেশি অর্থ বা শস্য জোর করিয়া আদায় করিতে না পারে তিনি তাহাও নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্ত জমি জরিপ করিয়া গড় উৎপাদন হিসাবে জমির খাজনা নির্ধারণ করা হইত।

রাজকোষ হইতে সৈন্যদের বেতন হইত। সামরিক বিভাগে প্রতিটি সৈনিকের পরিচয় ও বিবরণাদি রাখা হইত এবং রাজকীয় অশ্বগুলির চিহ্নকরণ প্রবর্তন করা হইয়াছিল। আলাউদ্দিন সৈন্যসংখ্যা এত অধিক বৃদ্ধি করেন যে, ব্যয়-সংকুলানের জন্য তিনি দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করিতে বাধ্য হন। নির্দিষ্ট মূল্যে যাহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পাওয়া যায় তাহার জন্য জিনিসপত্রের দাম বাঁধিয়া দেন। যথেষ্ট পরিমাণে শস্য যাহাতে সর্বদা মজুত থাকে সেজন্য তিনি প্রজাদের নিকট হইতে কর হিসাবে অর্থের পরিবর্তে শস্য লইবার ব্যবস্থা করেন এবং সরকারী গোলায় শস্য রাখিবার নির্দেশ দেন। তাহার ফলে অজন্মা হইলেও শস্যের দাম বৃদ্ধি পাইত না। ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসিতে হইত। এইসব ব্যবসায়ীদের সরকারী দপ্তরখানায় নাম লিখাইতে হইত এবং ব্যবসা চালাইবার জন্য অনুমতিপত্র লইতে হইত। বেশী মূল্য লইলে বা ওজন কম দিলে ব্যবসায়ীদের নির্মম শাস্তি দেওয়া হইত। দিওয়ান-ই-রিয়াসত এবং শাহানা-ই-মণ্ডী নামক দুইজন কর্মচারী বাজার

মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রণ করিতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা কৃষক ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। আলাউদ্দিন পণ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার বাজার নিয়ন্ত্রণ আইনকানুন দিল্লী ছাড়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য শহরেও প্রবর্তন করা হইয়াছিল। সৈন্যবাহিনী ছাড়াও সকল শ্রেণীর নগরবাসীই তাঁহার মূল্য নিয়ন্ত্রণের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিল।

আলাউদ্দিন স্থাপত্য শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লীর নিকট সিরি নামক অঞ্চল তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং 'আলাই দরওয়াজা' নামক প্রবেশদ্বার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায় | তুঘলক বংশ

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে খলজী বংশের পতন ঘটে। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিক ১৩২০ খ্রীস্টাব্দে শেষ অকর্মণ্য খলজী শাসক খসরুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 'গিয়াসউদ্দিন তুঘলক' উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দিন সুযোগ্য শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁহার শাসন ক্ষমতাগুণে শীঘ্রই রাজ্য মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

মহম্মদ বিন তুঘলক। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জুনা খাঁ 'মহম্মদ বিন তুঘলক' নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া মহম্মদ বিন তুঘলক রাজত্ব আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমেই কয়েকটি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং সেই অনুযায়ী কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবর্তন আনয়ন করেন। তিনি রাজ্যের সর্বত্র একই হারে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন। রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঠিক ঠিক ভাবে রাখিবার জন্য এবং প্রাদেশিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়মিতভাবে দিল্লীতে পাঠাইবার নির্দেশ দেন।

রাজস্ব বিষয়ে সংস্কার

রাজ্যের আয় বাড়াইবার জন্য তিনি দোয়াব অঞ্চলে করের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। আদেশে ও রাজ কর্মচারীদের উৎসাহে কৃষকদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার চলিয়াছিল, কিন্তু পরে দুর্দশা দেখিয়া সুলতান প্রচুর ঋণদান ও জলসেচের ব্যবস্থা করেন। ইহার ফলে কেবলমাত্র যে কর অনাদায় রহিল তাহাই নয়, প্রচুর অর্থের অপব্যয় হইল এবং সুলতানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইল। কৃষির উন্নতির প্রতিও তিনি নজর দেন।

দোয়াব অঞ্চলে কর বৃদ্ধি ও কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা

তিনি আমীর-ই কোহা নামে এক নূতন কৃষি বিভাগ স্থাপন করেন। সরকারী ব্যয়ে পতিত জমি কৃষিযোগ্য করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। ইহার জন্য বহু কর্মচারী নিযুক্ত করা হয় এবং অর্থও ব্যয় হয় প্রচুর। কিন্তু চাষের অনুপযোগী জমিগুলি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করায় এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

রাজধানী স্থানান্তর

ইহার অল্পকাল পরে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দেবগিরি হইতে সাম্রাজ্য শাসন সহজতর হইবে মনে করিয়া মহম্মদ দিল্লী হইতে রাজধানী তথায় স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করেন। তিনি দেবগিরির নাম পরিবর্তন করিয়া উহার নাম রাখেন দৌলতাবাদ। দেবগিরিতে রাজধানী পরিবর্তনের পক্ষে যুক্তি দেখান যাইতে পারে। প্রথমত, তুঘলক সাম্রাজ্যের মোটামুটি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দেবগিরি সর্বদিক দিয়া রাজধানী হিসাবে যোগ্যতর ছিল। দ্বিতীয়ত, মঙ্গোলদের আক্রমণ ও আমীর-ওমরাহদের ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দিল্লী। এদিক হইতে দেবগিরির অবস্থা অনেক ভাল ছিল। সুতরাং দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। দিল্লীর অধিবাসিগণ অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করিয়া দেবগিরিতে উপস্থিত হইল। কিন্তু সেখানকার জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় সুলতান পুনরায় দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই অনাবশ্যক যাতায়াতের জন্য বহু লোকের প্রাণনাশ এবং অর্থও নষ্ট হইয়াছিল। দৌলতাবাদ মহম্মদ তুঘলকের বিভ্রান্ত কর্মশক্তির স্মারকচিহ্ন।



মহম্মদ বিন তুঘলক

মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার

ইহার পর মহম্মদ মুদ্রা সংস্কারে উদ্যোগী হন। এই সময় রূপার যোগান খুব কম ছিল বলিয়াই সম্ভবত মহম্মদ তাম্রমুদ্রা প্রচলনের চেষ্টা করেন। মুদ্রানীতির দিক্ দিয়া এই ব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত হইলেও এই নূতন মুদ্রা যাহাতে কেহ জাল করিতে না পারে তাহার জন্য কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই তিনি গ্রহণ করেন নাই। ফলে শীঘ্রই জাল মুদ্রায় রাজকোষ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ইহাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হইল। সুলতান তখন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তামার মুদ্রার সম্পূর্ণ মূল্য স্বর্ণ ও রৌপ্যে প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে রাজকোষের অর্থাভাব আরও বৃদ্ধি পাইল।

মহম্মদ তুঘলকের শাসনকালে মঙ্গোলরা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে এবং তাহাদের একটি দল মীরাট পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মহম্মদ তুঘলককে ঝিলমের নিকটে এক যুদ্ধে

তাহাদের পরাজিত করেন। মহম্মদ হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত রাজ্যগুলির উপর তাঁহার কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি এই অঞ্চলে অবস্থিত কারাজল বা কুর্মাচল নামক পার্বত্য রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। কারাজলের রাজা বশ্যতা স্বীকার করিলেও ইহার ফলে তাঁহার বহু সৈন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। মহম্মদ পাঞ্জাবে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত দুর্ভেদ্য দুর্গ নগরকোট দখল করেন। মহম্মদ তুঘলক খোরাসান ও ইরাক জয় করিবার পরিকল্পনাও করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি প্রায় চারি লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এক বৎসর ধরিয়া পোষণ করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনাটি তিনি কার্যকর করেন নাই। ফলে রাজকোষের প্রচুর অর্থ অপচয় হয়। তিনি অবশ্য রাজ্যের নিরাপত্তা সমস্যা ও সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্যই ইহা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরবর্তীকালে মুঘল ও ইংরেজরা এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিল।

মঙ্গোল আক্রমণ

কারাজল বিজয়

মহম্মদ তুঘলকের কার্যকলাপে সাম্রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কিছুকাল পর্যন্ত সৈন্যদের সাহায্যেই তিনি বিদ্রোহীদের দমন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বিদ্রোহের প্রকোপ ক্রমেই বাড়িতে থাকে। জালালউদ্দিন নামক এক সেনাপতি মাবারে (দক্ষিণ ভারতে) স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর এবং ১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দে বাহমনী নামে দুইটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গুজরাট ও সিন্ধুদেশ সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং বাঙলাদেশের শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এইসব দেখিয়া সুলতান একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করিতে থাকেন। সিন্ধুদেশে এক বিদ্রোহীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে যাইয়া ১৩৫১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুকালে দিল্লী সুলতানের অধিকার উত্তর ভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে।

বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতা

মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে দিল্লী সাম্রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে করমণ্ডল উপকূল এবং পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। কিন্তু তাঁহার জীবিতকালেই এই বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। দিল্লীর তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্যের এই ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য তিনি অনেকাংশে দায়ী ছিলেন।

ইতিহাসের বিচিত্র পুরুষ মহম্মদ বিন তুঘলক অত্যাচারী, বিদ্যোৎসাহী, খামখেয়ালী শিল্পপ্রেমিক বলিয়া খ্যাত। তাঁহার মত জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বান্ কোন মুসলমান সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ইসলাম ধর্মের প্রতি তিনি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। দানশীল নরপতি হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন! শাসনকার্যে তাঁহার যোগ্যতার অভাব ছিল না এবং যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনাসমূহ জন-

মহম্মদ তুঘলকের চরিত্র

গণের নিকট উদ্ভট বলিয়া মনে হইত। তাহারা সেগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিত না। কারণ ঐ সময় সাধারণ প্রজারা ছিল অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। উলেমারা ছিলেন সুলতানের উপর বিরূপ। কারণ সুলতান সরকারী ব্যাপারে ইহাদের হস্তক্ষেপ একেবারে নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। কৃষি-সংস্কার, রাজধানী পরিবর্তন, তামার নোটের প্রচলন আর যাহাই হউক পাগলামি বলা যায় না। তবে তাঁহার অস্থিরচিত্ততা ও বাস্তব জ্ঞানের অভাবের জন্য তাঁহার সবকয়টি পরিকল্পনাই ব্যর্থ হইয়াছিল।

ফিরোজ শাহ তুঘলক। নিঃসন্তান অবস্থায় মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যু হইলে তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরোজ দুর্বল চরিত্রের সুলতান ছিলেন। পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। রণকুশল সেনাপতি হিসাবে তিনি কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তিনি গোঁড়া ও ধার্মিক মুসলমান্ ছিলেন এবং সর্বদা গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনিই সর্বপ্রথম হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করেন।

ফিরোজ দুইবার বাঙলা জয়ের চেষ্টা করেন, কিন্তু দুইবারই তিনি ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি বাঙলার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন। তিনি উড়িষ্যার হিন্দুরাজকে পরাজিত করেন। ১৩৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের নগরকোট দুর্গ পুনরায় দখল করেন। পর বৎসর তিনি সিন্ধুদেশের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। বহু সৈন্য ক্ষয় করিয়া তিনি সিন্ধুদেশ জয় করিতে সমর্থ হন।

সামরিক ক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও শাসন-সংস্কার ও জনহিতকর কার্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ফিরোজ তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে কোরানের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজস্বের ক্ষেত্রে তিনি কয়েকটি সংস্কার সাধন করেন। প্রথমে অবৈধ খাজনাগুলি বাতিল করিয়া তিনি কয়েকটি ক্ষেত্রে ভূমি-রাজস্ব কমাইয়া দেন। ইহার পর তিনি কোরানে উল্লিখিত চারিপ্রকার কর স্থাপন করেন—খারাজ (ভূমিকর), জাকৎ (সরকারকে দান), জিজিয়া (অমুসলমানদের উপর ধার্য কর) এবং খামস (যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ)। ইহা ছাড়া তিনি সেচকরও প্রবর্তন করেন। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বহুবিধ শুল্ক ব্যবস্থা হইতে বণিকদের মুক্তি দেন। ফলে সাম্রাজ্যে অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা হয়। কৃষির উন্নতির জন্য সুলতানের নির্দেশে কয়েকটি সেচখাল এবং বহুসংখ্যক কূপ খনন করা হয়, কিছু পতিত জমিও উদ্ধারের ব্যবস্থা হয়। ফলে কৃষির ও কৃষকের উন্নতি সাধিত হয়। ইসলামী আইনকে অনুসরণ করিয়া তিনি বিচার-ব্যবস্থারও সংস্কার করেন। দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস করিয়া নিষ্ঠুর শাস্তিপ্রদান রহিত করেন। বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি একটি কর্মসংস্থান সংস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। দরিদ্রের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় এবং তাহাদিগকে অর্থ সাহায্যের জন্য সরকারী সাহায্য ভাণ্ডার খুলিবার ব্যবস্থা করেন। এগুলি অবশ্য মুসলমানদের জন্যই স্থাপিত হইয়াছিল। ফিরোজ শাহ কয়েকটি নূতন শহর নির্মাণ করেন। এগুলির মধ্যে জৌনপুর, ফতেহাবাদ, হিসার, ফিরোজপুর, ফিরোজাবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জনহিতকর কার্য্যাবলী

ফিরোজ তাঁহার কর্মচারীদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দানের প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার ফলে কর্মচারীগণ তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ পায়। তাহাতে কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির প্রাধান্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁহার সময়ে সুলতানের ক্রীতদাসের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য রাজকোষ হইতে বহু অর্থ ব্যয় করা হইত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ক্রীতদাসের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল প্রায় দুই লক্ষ। ১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজ প্রাণত্যাগ করেন।

অষ্টম অধ্যায় | সুলতানী শাসনের ক্রমাবনতি ও পতন

১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহবিবাদ দেখা দেয়। ফিরোজের মৃত্যুর পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে পাঁচজন সুলতান দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। এইসব দুর্বল অকর্মণ্য সুলতানদের অধিকার দিল্লী ও ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, কারণ ইতিমধ্যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সকলেই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৩৯৪ খ্রীস্টাব্দে মামুদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তৈমুরলঙ-এর ভারত আক্রমণ। তৈমুরলঙের পিতা ছিলেন চাঘতাই তুর্কী বংশের নেতা। ৩৩ বছর বয়সে তৈমুর চাঘতাই শাখার নেতা হন এবং একে একে ইরান, আফগানিস্তান, ইরাক প্রভৃতি দেশ জয় করেন। তুঘলক সাম্রাজ্যের শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়া ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে সসৈন্যে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া পাঞ্জাবের নানা স্থান বিধ্বস্ত করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে উপনীত হইলেন। সুলতান মামুদ শাহ এই পরাক্রান্ত আক্রমণকারীর গতিরোধ অসম্ভব মনে করিয়া গুজরাটে পলায়ন করেন। বিজয়ী তৈমুর দিল্লী অধিকার করেন এবং অধিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন। কথিত আছে দিল্লীর প্রবেশ-পথেই এক লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়। পনের দিন অবস্থানের পর দিল্লীর যুগ যুগ সঞ্চিত ধনরত্ন লইয়া তৈমুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।



তৈমুরলঙ

আক্রমণের ফলাফল

তৈমুরের আক্রমণ কেবলমাত্র তুঘলক বংশের উপর মারাত্মক আঘাত হানে নাই, এই আক্রমণ সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের পথ সুগম করিয়া দেয়। দিল্লীর রাজশক্তি একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন রাজ্যের পত্তন ঘটান। গুজরাট, মালোয়া ও জৌনপুরের শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

তৈমুরের আক্রমণের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অরক্ষিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। দুর্বল শাসকরা এই সীমান্ত রক্ষায় সুব্যবস্থা না করায় পরবর্তীকালে মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

সাম্রাজ্যে অরাজকতা

তৈমুরের আক্রমণের ফলে দিল্লীর সিংহাসন তিনমাস খালি পড়িয়া থাকে। এই মহাশ্মশানে মামুদ প্রথমে ফিরিয়া আসিতে চাহেন নাই। পরে তিনি জৌনপুর ও অন্যান্য শক্তিশালী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাদের সাহায্যে ১৪০৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া তুঘলক বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার মত চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তুঘলক বংশের পতন ঘটে।

সৈয়দ বংশ (১৪১৩-১৪৫১) খ্রীঃ)। তুঘলক শাসনের অবসান হইলে তৈমুরের প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজেকে হজরৎ মহম্মদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং এই কারণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ সৈয়দ বংশ নামে পরিচিত হয়। খিজির খাঁ তৈমুরের পুত্রের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি এবং তাঁহার পরবর্তী তিনজন সুলতান ৩৮ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তাঁহাদের আধিপত্য দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই বংশের শেষ রাজা আলাউদ্দিন আলম শাহকে পরাজিত করিয়া পাঞ্জাবের শাসনকর্তা বাহলুল লোদী সৈয়দ বংশের অবসান ঘটান।

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৭ খ্রীঃ)। লোদী বংশের তিনজন সুলতান ৭৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহারা জাতিতে আফগান ছিলেন। লোদী বংশের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে। লোদী বংশের প্রথম সুলতান বাহলুল লোদী বিহার পর্যন্ত জয় করিয়া দিল্লীর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের প্রথম দুইজন সুলতান শাসনকার্যে দক্ষ ছিলেন। বাহলুল জৌনপুরের সার্কি সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই সময় তিনি আফগানদের সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করিতে থাকেন। ফলে বহুসংখ্যক আফগান এই সময় ভারতে আসে এবং তাহাদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

সিকন্দর ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি আফগান সর্দারদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং রাজ্যে সুশাসন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তিনি ন্যায়-বিচারের উপর বিশেষ জোর দিতেন। ডাকাতদের হাত হইতে অত্যাচারীদের রক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি জৌনপুর ও গোয়ালিয়র জয় করেন। সিকন্দর

লোদী শাসনকার্যে দক্ষ ও বিদ্যোৎসাহী হইলেও পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন। সেকেন্দার লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সুলতান হন। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

নবম অধ্যায় | প্রাদেশিক স্বাধীন রাজ্যসমূহ

বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানী শাসন

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বক্তিয়ার খলজী বাংলা আক্রমণ করিয়া পশ্চিম ও উত্তর বাংলা জয় করেন। দিল্লী হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া মধ্যযুগে মুসলিম শাসিত বাংলা দিল্লীর অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট থাকিত। বাংলার সমস্যা এই কারণে মধ্যযুগে একটি জটিল সমস্যা ছিল। এমন কি বলবনের ন্যায় শক্তিশালী সুলতানের সময়েও বাংলা স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে। গিয়াসুদ্দিন তুঘলক বাংলায় পুনরায় দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ইহাকে তিনটি ভিন্ন প্রদেশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের জন্য এক একজন পৃথক শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাংলাকে অধীনে রাখা সম্ভব হয় নাই। সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নামে এক ব্যক্তি সমগ্র বাংলা জুড়িয়া একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইলিয়াস শাহী বংশের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলক বারংবার চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে দমন করিতে পারেন নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি বঙ্গদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন।

ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন। ইলিয়াস শাহই ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৩৫২ খ্রীস্টাব্দে তিনি সোনারগাঁ অধিকার করেন এবং উড়িষ্যা ও ত্রিহুতের রাজাদের নিকট হইতে কর আদায় করেন। তিনি কামরূপ রাজ্যও জয় করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশ শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ ছিল। তাঁহার স্থাপিত রাজবংশ দীর্ঘদিন শাসনের দ্বারা বঙ্গদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং সামরিক সাফল্যের দ্বারা বঙ্গদেশের সহিত অপরাপর দেশের সংযোগ সাধন করে।

ইলিয়াস শাহ

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ বঙ্গদেশের সুলতান হন। তিনি কামরূপ হইতে নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। সিকন্দরের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা হইল দিল্লীর সুলতানের আক্রমণের হাত হইতে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করা। ফিরোজ শাহ তুঘলক শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে সিকন্দরের সহিত সন্ধি করিয়া তিনি দিল্লী ফিরিয়া যান। সিকন্দরকে তিনি বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতান হিসাবে স্বীকার করিয়া লন।

সিকন্দর শাহ

সিকান্দরের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩—১৪১০)। তিনি ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান। কোচবিহার এবং কামরূপ রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চল অধিকার করিয়া তিনি রাজ্যের শক্তি ও আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কেবল যুদ্ধ জয় করিয়াই খ্যাতিলাভ করেন নাই। তিনি রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশের সহিত চীনের নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। তিনি চীন রাজাদের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং চীন সম্রাটও আজম শাহের দরবারে দূত পাঠান। ঐ দূতের সহিত মাহুয়ান নামক একজন চীনা দোভাষী আসিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে জানিতে পারা যায়। কথিত আছে পারস্যের বিখ্যাত কবি হাফেজের সহিত তিনি পত্রালাপ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ বংশের আরও তিনজন সুলতান রাজত্ব করেন। শাসক হিসাবে তাঁহারা কোন কৃতিত্বই দেখাইতে পারেন নাই। রাজা গণেশ এই সময় খুব শক্তিশালী হন এবং ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালের সাময়িক বিরতি ঘটে।

আজম শাহ

রাজা গণেশের পুত্র জালালউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ বঙ্গদেশের সুলতান হন। তাঁহার কুশাসনে অতিষ্ঠ হইয়া বাংলার আমীরগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া পুরাতন ইলিয়াস শাহী বংশের একজনকে বঙ্গদেশের সিংহাসনে বসান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ইলিয়াস শাহী বংশের উপর তৎকালীন বাঙালীদের গভীর বিশ্বাস ছিল। এই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহী বংশের পরপর চারিজন সুলতান বঙ্গদেশ শাসন করেন। শেষ নবাব জালালউদ্দিন ফত্তাকে হত্যা করিয়া প্রাসাদ-রক্ষকদের নেতা শাজাদা নামক এক হাব্‌সী সিংহাসন অধিকার করেন। এই শাসন অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

রাজা গণেশ

বঙ্গদেশের ইতিহাসে ইলিয়াস শাহী বংশের অবদান ভুলিবার নয়। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ক্ষেত্রেই ইলিয়াস শাহী বংশের সমান কৃতিত্ব রহিয়াছে। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া দিল্লী সুলতানীর বিরোধিতা করিয়া এই বংশের একাধিক শাসক বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কামরূপ, আরাকান ও উড়িষ্যায় ইহারা বাঙলার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই বংশের শাসনকালে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব বৃদ্ধি পায়। ইলিয়াস শাহী বংশের আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ ঘটে এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পরীতিতে এক নূতন ভঙ্গী দেখা যায়।

ইলিয়াস শাহী বংশের অবদান

হুসেন শাহী বংশ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হাবসী সুলতানকে নিহত করিয়া হুসেন শাহ বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পূর্ব পরিচয় ঠিক জানা যায় না। কাহারও কাহারও মতে তিনি আরব দেশবাসী ছিলেন। পিতার সহিত বাংলায় আসিয়া চাঁদপাড়া গ্রামে বসবাস করেন। কিভাবে তিনি ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন তাহা জানা যায় না।

হুসেন শাহ

বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি অভ্যন্তরীণ সংস্কারে মনোযোগী হন। তিনি হাবসী-কুশাসন দূর করেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় দক্ষ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিবার পর তিনি রাজ্যবিস্তারে মনোযোগ দেন। কামরূপ ও মগধ জয় করিয়া উড়িষ্যার প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করিয়া তিনি স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে বঙ্গদেশকে নূতন মর্যাদা আনিয়া দেন। সম্ভবতঃ আরাকান এবং ত্রিপুরার কতকাংশও তিনি জয় করিয়াছিলেন।

কৃতিত্ব

হুসেন শাহ নিজে নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তিনি হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতেন না। তিনি অনেক হিন্দুকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে বিদ্বান ছিলেন, তাই সাহিত্যিক ও বিদ্বানদের তিনি সমাদর করিতেন। তাঁহার উৎসাহ ও আনুকূল্যে রূপ গোস্বামী দুইখানি বই লেখেন। তাঁহার শাসনকালে বিপ্রদাস 'মনসামঙ্গল' রচনা করেন। বিদ্যোৎসাহী সুলতান হুসেন শাহের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার সেনাপতি পরাগল খান কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে একজন লেখককে বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিবার দায়িত্ব দেন। ধর্ম সম্বন্ধে হুসেন শাহ উদার মতাবলম্বী ছিলেন।

হুসেন শাহের শাসনকাল মধ্যযুগের বাংলাদেশের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁহার সুশাসনে বাংলার সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রজাদের জন্য তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদ্রাসা, চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া প্রজাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করিয়াছিলেন।

নসরৎ শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ)। পিতার জীবদ্দশাতেই নসরৎ শাহ রাজ্যের শাসন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার ন্যায় তিনি দক্ষ শাসক ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহার শাসনে সন্তুষ্ট ছিল। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলায় বড় সোনা মসজিদ ও কদম রসুল নির্মিত হইয়াছিল।

মুঘলদের বিরুদ্ধে জোট গঠন

নসরৎ শাহ পিতার ন্যায় রাজ্যবিস্তার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিম ও পূর্বে রাজ্য সীমানা বৃদ্ধির জন্য তিনি ত্রিহুত অধিকার করেন। তাঁহার শাসনকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল মুঘল নেতা বাবরের দিল্লী অধিকার এবং উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা। তিনি মুঘল-বিরোধী শক্তিজোট গঠনে তৎপর হন। কিন্তু বাবরের নিকট তাঁহার পরাজয় ঘটে এবং বাবরের শর্তানুযায়ী সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হইলে নসরৎ শাহ পুনরায় মুঘলদের বিরুদ্ধে পাঠানদের দলবদ্ধ করিতে সচেষ্ট হন। এমন কি গুজরাটের বাহাদুর শাহের সহিত মিলিত হইয়া মুঘলদের ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকর হইতে পারে নাই। অকস্মাৎ এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে তিনি নিহত হন।

নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ হুসেন শাহী বংশের গৌরব ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। বাংলায় পুনরায় রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। এই সুযোগে শের খাঁন (পরে শের শাহ) বাংলা দখল করিয়া লইলেন।

হুসেন শাহী বংশের কৃতিত্ব : বাংলার সংস্কৃতিতে তাঁহাদের অবদান

মধ্যযুগে বাংলার উন্নতির সহিত হুসেন শাহী বংশের শাসন নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই বংশের শাসকগণের উদার মন ও ধর্মীয় সহনশীলতা ভিন্ন বাংলা ভাষা ও বৈষ্ণব ধর্মের উন্নতি ও প্রসার অসম্ভব ছিল। হুসেন শাহী বংশের শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি স্থাপন। দুই সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বসবাসের ফলে একের আচার-ব্যবহার অপরের আচার-ব্যবহারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। হিন্দুরা পীর পূজা এবং সিন্নি দিতে শুরু করে। কালক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আরাধ্য দেবতার একটা সমন্বয় দেখা দেয়। হিন্দুরা মুসলমান পীরকে দেবতার আসনে বসাইয়া সত্যনারায়ণ ত্রিলোকের পূজা শুরু করে। তাঁহাদের স্তবস্তুতির জন্য পাঁচালি লেখা হইল। মুসলমানরাও দূরে সরিয়া থাকে নাই। তাহারাও গঙ্গাদেবী, ওলাবিবি, শীতলার পূজা আরম্ভ করিল। 'সত্যপীরের' পূজা উভয় সম্প্রদায়ই করিত। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কন চণ্ডী হইতে এই যুগে বাঙালী মুসলমানদের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধে জানা যায়। হুসেন শাহী বংশীয় সুলতানরা শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বাংলা ভাষা প্রসারে উৎসাহ দিতেন। তাঁহাদের সাহায্যে ও সহায়তায় বহু গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবৎ ও মহাভারতের বাঙ্গানুবাদ এই সময় হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যেরও চর্চা এই সময় ভালভাবেই হইত। নবদ্বীপ সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। স্থাপত্যের ক্ষেত্রেও এই বংশের অবদান বিশেষভাবে মনে রাখিবার মত। বাংলায় এই সময় বিভিন্ন নির্মাণ-কার্যের ভিতর দিয়া স্থাপত্য শিল্পের এক গৌরবজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। এই যুগের ছোট সোনা মসজিদ ও বড় সোনা মসজিদ, কদম রসুল, ফিরোজ মিনার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য রীতি। ধর্মীয় ভাবধারার ক্ষেত্রে এই যুগ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। শ্রীচৈতন্যদেব এই যুগেই আবির্ভূত হন এবং বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে এক নূতন যুগের সূচনা করেন।

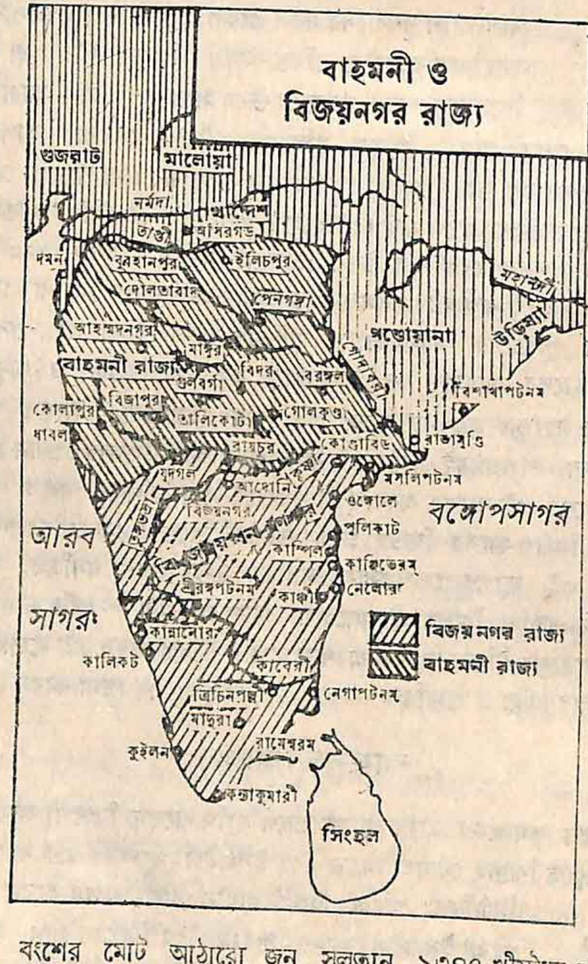
বাহমনী রাজ্য

বাহমনী রাজ্যের উৎপত্তি

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যের বিদেশী আমীররা দিল্লীর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ইসমাইল মুখ্ নামক এক ব্যক্তিকে সুলতান নির্বাচিত করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। কিছুদিন পরেই ইসমাইল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং হাসান জাফর খাঁ নামক একজন বীর সৈনিক তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন (১৩৪৭ খ্রীঃ)। হাসান সুলতান হইয়া 'আলাউদ্দিন বাহমন শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার স্থাপিত সুলতানী বংশ 'বাহমনী বংশ' নামে পরিচিত।

বাহমনী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন বাহমন রণকুশল নরপতি ছিলেন। তিনি

একে একে বিদর, গোয়া, দাভোল, কোলাপুর ও তেলিঙ্গানা জয় করিয়া দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অংশের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। উত্তরে বেরার হইতে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী এবং পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে তেলিঙ্গানা পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তিনি গুলবর্গা নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। গুলবর্গা, বেরার, দৌলতাবাদ ও বিদর এই চারিটি তরফে তিনি তাঁহার রাজ্যটিকে বিভক্ত করেন। হাসান ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্মিক ও প্রজার কল্যাণকামী ছিলেন।



বাহমনী বংশের মোট আঠারো জন সুলতান ১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; তাঁহাদের রাজত্বকাল যুদ্ধ, আত্মকলহ, ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার ঘৃণ্য বিবরণে পূর্ণ। এই কারণে সুলতানদের মধ্যে পাঁচজন অকালে নিহত, দুইজন অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তিনজন গুপ্ত ষড়যন্ত্রের ফলে সিংহাসনচ্যুত হন। বাকী সুলতানদের

বাহমনী শাসনের স্বরূপ

মধ্যে কেহ কেহ পরাক্রান্ত ছিলেন, সুশাসক ছিলেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁহারা অধিকাংশই অত্যন্ত অনুদার ছিলেন। বিধর্মীদের কঠোরভাবে নির্যাতন করিতে তাঁহারা ইতস্ততঃ করিতেন না। পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের সহিত তাঁহারা অবিশ্রান্ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন।

আলাউদ্দিন বাহমন শাহের পুত্র মহম্মদ শাহ বরঙ্গলরাজকে পরাজিত করিয়া গোলকুণ্ডা দুর্গ অধিকার করেন। তিনি রাজ্যে শান্তি সৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনেন। তাঁহার সময় হইতে বিজয়নগরের সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের যুদ্ধ শুরু হয় এবং বাহমনী রাজ্য টিকিয়া থাকাকালীন এই যুদ্ধের অবসান হয় নাই। দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ ছিলেন বাহমনী সুলতানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শান্তিপ্রিয় সুলতান। তিনি অহেতুক যুদ্ধ দ্বারা তাঁহার রাজত্বকালকে কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি বহু মসজিদ ও অনাথ মুসলমান শিশুদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রজাদের দুঃখদুর্দশা দূর করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতেন। এই বংশের অষ্টম সুলতান ফিরোজ শাহ খুবই পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি দুইবার বিজয়নগরের রাজাকে পরাজিত করেন। কিন্তু তৃতীয়বারে তিনি নিজেই পরাজিত হন। শিল্প ও সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং বহু ভাষায় তিনি কথা বলিতে পারিতেন। তিনি ছিলেন একজন সুকবি এবং মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য ভারতের সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠে।

বাহমনী-বিজয়নগর সংঘর্ষ

পরবর্তী সুলতান আহম্মদ শাহ একজন রণনিপুণ সুলতান ছিলেন। তিনি বিজয়নগরের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া করদানে বাধ্য করেন। তিনি বরঙ্গল অধিকার করেন এবং গুলবর্গা হইতে রাজধানী বিদরে স্থানান্তরিত করেন। মালবের সুলতানও তাঁহার নিকট পরাজিত হন। আহম্মদ শাহও বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং কবি ও সাহিত্যিকদের শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বামহনী রাজ্যে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। বাহমনী রাজ্যের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হয় বিজয়নগরের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন যুদ্ধ এবং মুসলিম অভিজাতদের দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বিসংবাদের মধ্য দিয়া। এই দুইটি গোষ্ঠী পরিচিত ছিল 'দক্ষিণী' এবং 'পরদেশী' নামে। এই বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ধর্মীয় কারণেও। কারণ পরদেশীরা ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত এবং দক্ষিণীরা ছিলেন সুন্নী মতাবলম্বী। শেষোক্ত দলের নেতা ছিলেন মহম্মদ গাওয়ান। বাহমনী রাজ্যের সবচেয়ে সুদিন দেখা দিয়াছিল মন্ত্রী মামুদ গাওয়ানের শাসনকালে (১৪৪৬-১৪৮৬ খ্রীঃ)। তিনি মালব রাজ্য জয় করিয়া লন। কিন্তু তিনি পরদেশী ছিলেন বলিয়া দক্ষিণীরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করার ব্যবস্থা করে। মামুদ গাওয়ানের শাসনকালেই রুশদেশীয় পর্যটক নিকিতিন বাহমনী রাজ্য সফর করেন। তিনি বাহমনী রাজ্যের সৈন্যবাহিনী, আমীর-ওমরাহদের বিলাসবহুল জীবন এবং বাদবাকি জনসাধারণের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। পঁচিশবৎসর কাল বাহমনী রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মহম্মদ গাওয়ান অসামান্য রাজনৈতিক

আহম্মদ শাহ

মহম্মদ গাওয়ান

দক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি কোষ্কণ, উড়িষ্যা, গোয়া প্রভৃতি অঞ্চল বাহমনী রাজ্যভুক্ত করেন। মহম্মদ গাওয়ানের মৃত্যুর পর বাহমনী রাজ্য দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। পরবর্তী সুলতানগণের দুর্বলতার ফলে বাহমনী রাজ্য ক্রমশঃ কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

বাহমনী রাজ্য হইতে উদ্ভূত পাঁচ সুলতানী রাজ্য ঃ

বেরার। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বাহমনী রাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৪৯০ খ্রীস্টাব্দে ফতেউল্লা ইমাদ-উল-মুলুক বেরারের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ইমাদশাহী বংশ স্থাপন করেন। ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দে আহম্মদনগরের সুলতান বেরার দখল করেন।

বিজাপুর। ১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে ইউসুফ আদিল শাহ বিজাপুরে আদিল শাহী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। বিজাপুরই ছিল পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে আয়তন ও শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ। আদিল শাহ সুশাসক ছিলেন। তিনি শিয়া ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করেন। সম্রাট ঔরংজেবের রাজত্বকালে বিজাপুর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬৮৬ খ্রীঃ)।

আহম্মদনগর। ১৪৯০ খ্রীস্টাব্দে মালিক আহম্মদ নিজাম-উল-মুলুক নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে আহম্মদনগরে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। ইনি যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা 'নিজাম শাহী বংশ' নামে পরিচিত। একশত বৎসর অস্তিত্বের পর আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের পর আহম্মদনগর রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গোলকুণ্ডা। ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে কুতুব-উল,মুল্ক গোলকুণ্ডায় কুতুব শাহী বংশ-স্থাপন করেন। এই বংশের সুলতানরা প্রায় দুইশত বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে ঔরংজেব গোলকুণ্ডা রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

বিদর। ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে আমীর বারিদের নেতৃত্বে বারিদ শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের সুলতানগণ ১৬১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। অবশেষে বিজাপুরের সুলতান এই বংশের শেষ রাজাকে পরাজিত করিয়া বিদর রাজ্য অধিকার করেন।

বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য দুইটির মধ্যে সংঘর্ষের প্রকৃতি। তুঙ্গভদ্রা, দোয়াব, কৃষ্ণা, গোদাবরীর ব-দ্বীপ ও মারাঠা অঞ্চল এই তিনটি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের জন্যই বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য দুইটির মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ চলিয়াছিল। তুঙ্গভদ্রা দোয়াব ছিল কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। ইহা ছাড়া কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলও খুব উর্বর ছিল। অতএব এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে পারিলে আর্থিক লাভ প্রচুর হইবে মনে করিয়াই উভয় রাজ্য দুইটি সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মারাঠা অঞ্চল লইয়া বিরোধের কারণ ছিল অন্যরকম। এখানকার কোঙ্কন অঞ্চলটি ছিল উর্বর এবং এখানে অবস্থিত গোয়া বন্দরটি সেই যুগে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। গোয়া ছিল একটি

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। এই দুইটি রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে উভয় রাজ্যই প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাহাদের পতন ত্বরান্বিত হয়। ১৩৬৭ খ্রীস্টাব্দে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত। বিজয়নগরের রাজা বুক্কা ইহা শুরু করেন। পরে বাহমনী রাজ্যের সুলতান এই আক্রমণ শুধু প্রতিহতই করেন নাই, বিজয়নগর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রভূত সম্পদ নষ্ট করেন এবং বহু লোককে হত্যা করেন। উভয় পক্ষ দুর্বল হইয়া পড়িলে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং দোয়াব অঞ্চল দুই রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া লয়। ইহার পর দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে (১৩৭৯-১৪৩৩ খ্রীঃ) বাহমনী রাজ্যের সহিত পুনরায় যুদ্ধ দেখা দেয়। এই যুদ্ধে বিজয়নগর বাহমনী রাজ্যের নিকট হইতে বেলগাঁও ও গোয়া বন্দরটি কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। দ্বিতীয় হরিহরের পর রাজা হন দেবরায় (১৪৩৪-১৪২২ খ্রীঃ)। তাঁহার রাজত্বকালে বাহমনী রাজ্যের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে বিজয়নগর পরাজিত হইয়াছিল। ইহার পর দ্বিতীয় দেবরায় ও কৃষ্ণদেব রায়ের শাসনকালেও এই যুদ্ধ চালিয়াছিল। যুদ্ধে ভাগ্যলক্ষ্মী কখনো এক পক্ষে আবার কখনো অপর পক্ষে প্রসন্ন হইবার ফলে উভয় পক্ষের অবস্থার কোন হেরফের হয় নাই। এই দুই রাজ্যের মধ্যে সুদীর্ঘকাল সংগ্রামের কারণ কিন্তু ধর্মীয় ছিল না। ইহার প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর মারাত্মকভাবে পরাজিত হয় এবং বিজয়নগর সম্পূর্ণভাবে লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে বিজয়নগরের গৌরবময় যুগের অবসান ঘটে।

দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের কারণ

যুদ্ধের ফলাফল

বিজয়নগর রাজ্য

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্তমান তামিলনাড়ুর রাজ্যের অন্তর্গত বেলারী জেলায় এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শক্তির অগ্রগতি প্রতিরোধ ও মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সঙ্গম বংশ। হরিহর ও বুক্কা যে স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তাহা তাঁহাদের পিতার নামানুসারে 'সঙ্গম বংশ' নামে খ্যাত। হরিহর তাহার প্রথম শাসক ছিলেন। তিনি পরাক্রান্ত রণকুশল নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্য উত্তরে কৃষ্ণা হইতে দক্ষিণে কাবেরী এবং পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। হরিহরের পর বুক্কা বিজয়নগরের সিংহাসনে বসেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। বুক্কাকে বাহমনী রাজ্যের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। বুক্কার পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় হরিহর ত্রিচিনপল্লী, কাঞ্চী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরগুলি অধিকার করিয়া ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত রাজ্যসীমা বর্ধিত করেন। তাঁহার পুত্র প্রথম দেবরায়ের রাজত্বকালে পার্শ্ববর্তী বাহমনী রাজ্যের সঙ্গে বিজয়নগর রাজ্যের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

দেবরায়

রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের রাজত্বকালে ইটালীর পর্যটক নিকোলা কণ্টি ও পারস্যের রাজদূত আব্দুর রজ্জাক বিজয়নগর পরিদর্শন করেন। তাঁহারা উভয়েই বিজয়নগরের ঐশ্বর্য ও শক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।

শাল্লুভ বংশ। ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে সঙ্গম বংশের শেষ রাজা বিরূপাক্ষকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নরসিংহ শাল্লুভ বিজয়নগরের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বংশ শাল্লুভ বংশ নামে পরিচিত। তিনি খুব কৃতী পুরুষ ছিলেন। এই বংশ ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিজয়নগর শাসন করে।

তুলুভ বংশ। বীর নরসিংহ নামক এক ব্যক্তি শাল্লুভ বংশীয় শেষ রাজাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ তুলুভ বংশ নামে পরিচিত। এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি

কৃষ্ণদেব রায়

কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যখন বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রাজ্যের অবস্থা ভাল ছিল না। একদিকে অন্তর্বিদ্রোহ, অন্যদিকে বৈদেশিক আক্রমণ রাজ্যের অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ ছিল। তিনি দৃঢ়তার সহিত বিপদের সম্মুখীন হইয়া সমস্ত বিপদ হইতে বিজয়নগরকে রক্ষা করেন। তিনি একজন সুনিপুণ সংগঠনকারী ও রণকুশল নৃপতি ছিলেন। তিনি বহু যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই জয়ী হইয়াছিলেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহগুলি দমন করিয়া তিনি উড়িষ্যার রাজা ও বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত করেন। রায়চুর প্রদেশ তিনি পুনরায় অধিকার করিয়া লন। ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও তিনি জয় করিয়াছিলেন। তিনি কেবল অসামান্য রণকুশল সেনাপতি ছিলেন না, একজন সর্বগুণান্বিত সম্রাট ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আটজন পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহারা অষ্টদিগ্‌গজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন।


কৃষ্ণদেব রায়

কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর বিজয়নগর রাজ্যের অবনতি শুরু হয়। অচ্যুত রায় ও সদাশিব রায় পর পর সিংহাসনে বসেন।

উভয়েই ছিলেন দুর্ধর্ষ নৃপতি। কিন্তু মন্ত্রী রামরাজই প্রকৃত শাসক ছিলেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের সহিত হাত মিলাইয়া আহ্‌ম্মদনগর আক্রমণ করিয়া নগরটি লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করেন। এমন কি তিনি তাঁহার মিত্রদের সহিতও খারাপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ইহাতে মুসলমান শাসকরা ক্ষুব্ধ হন। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, আহম্মদনগর ও বিদর এই চারিটি মুসলমান রাজ্য একজোটে বিজয়নগর আক্রমণ করে। তালিকোটার প্রান্তরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজয়নগর বাহিনী পরাজিত হয়। বিজয়ী মুসলমান বাহিনী বিজয়নগরে প্রবেশ করিয়া শহরটি সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করে। তালিকোটার যুদ্ধ বিজয়নগর রাজ্যের ভাগ্যনির্ণয় করিয়া দেয়। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিজয়নগরের পূর্ব গৌরব আর ফিরিয়া আসে নাই।

তালিকোটার যুদ্ধ

আরবিদ্‌ বংশ। ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে তিরুমল আরবিদু বংশ স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় একশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরবর্তী রাজাদের আমলে চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। কালক্রমে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানরা বিজয়নগর রাজ্যের অধিকাংশ দখল করিয়া লন।

শাসনব্যবস্থা। বিজয়নগরে সুসংহত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই শাসন-ব্যবস্থায় রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। শাসন, বিচার ও সমর বিভাগের তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। রাজার পক্ষে একা রাজ্যশাসন করা সম্ভব ছিল না বলিয়া তিনি শাসন ব্যাপারে একটি পরিষদের পরামর্শ লইতেন। মন্ত্রীবর্গ, প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ, সেনাপতি এবং রাজনীতিজ্ঞদের লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইত। রাজা শাসন ব্যাপারে প্রতিটি দিকে নজর রাখিতেন। মুখ্যমন্ত্রী, ধনাধ্যক্ষ এবং আইন, শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার প্রধান কর্তা (পুলিশ) ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারীবৃন্দ। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ শ্রেণী হইতে উচ্চ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করা হইত। বিজয়নগরের রাজশক্তি স্বৈরাচারী হইলেও অত্যাচারী ছিল না। 'আমুক্ত মাল্যদা' নামক গ্রন্থে সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় রাজার আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে রাজা ধর্মশাসন অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করিবেন, রাজনীতিজ্ঞদের পরামর্শ লইবেন, প্রজাদের উপর লঘু করভার বসাইবেন, দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন এবং শত্রুর হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবেন। তিনি প্রজাসাধারণের মিত্র হইবেন এবং প্রত্যেক প্রজাকে বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

কেন্দ্রীয় শাসন

বিজয়নগর রাজ্য ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের শাসনভার 'নায়ক' উপাধিধারী একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। বেশ কয়েকটি সামন্ত রাজ্যের অস্তিত্বও বিজয়নগর রাজ্যে ছিল। নায়কগণ সরাসরি দায়ী থাকিতেন মহাপ্রধান বা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট। এই শাসনকর্তাদের সাধারণতঃ দুই বা তিন বৎসর অন্তর বদলি করা হইত। প্রদেশগুলি ছিল কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। গ্রামই রাজ্যের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল। গ্রামগুলি ছিল প্রায় স্বয়ং-

প্রাদেশিক শাসন

সম্পূর্ণ। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া গ্রামসভা থাকিত। গ্রাম-প্রধানকে আয়াগার (বা আয়াঙ্গার) বলা হইত। বিজয়নগরের শাসনব্যবস্থা অনেকটা চোল শাসনব্যবস্থার ন্যায় ছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মধ্যযুগে বিজয়নগর একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র ছিল। ইহার অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক। এ কারণে শাসকবর্গ কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহারা কৃষিতে জলসেচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বস্ত্রশিল্প, খনিজ শিল্প ও ধাতু-শিল্পেরও বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। সুগন্ধি দ্রব্যের প্রস্তুতকারক হিসাবে বিজয়নগরের বিশেষ নাম ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার জন্য বণিকরা সংঘ বা নিগম গঠন করিত। আবার বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজ নিজ সংঘ বা নিগম গঠন করিয়া ব্যবসা পরিচালনা করিত। কালিকট ছিল বিজয়নগরের প্রধান বন্দর। রাজ্যে স্বর্ণ ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল।

বিদেশীর দৃষ্টিতে বিজয়নগর

বিজয়নগর সে সময়ে সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে যে শ্রেষ্ঠ ছিল তাহা বিদেশী পর্যটকদের লেখা হইতে জানিতে পারা যায়। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে, বিজয়নগর সর্বদিক দিয়া বাহমনী রাজ্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। ইটালীয় পর্যটক নিকোলা কণ্টির মতে বিজয়নগর রাজ্যের মত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভারতবর্ষে আর একটিও ছিল না। পারস্যের রাজদূত আবদুর রজ্জাক বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, বিজয়নগরের মত সমৃদ্ধ নগর পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। সম্ভ্রান্ত লোক হইতে রাজ্যের সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই অঙ্গে নানাবিধ মণিরত্নখচিত অলঙ্কার পরিত। পর্তুগীজ পর্যটক কোমিণ্টো পা-এস লিখিয়াছেন, বিজয়নগর শহরটিতে লক্ষাধিক গৃহ ছিল এবং ইহা ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী শহর। নগরে কোন দ্রব্যের অভাব ছিল না। গ্রামাঞ্চলে অবশ্য সাধারণ লোকের অবস্থা ভাল ছিল না। ন্যুনিজ নামক পর্যটকও বিজয়নগরকে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী রাজ্য হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

সামাজিক অবস্থা

বিজয়নগর রাজ্যের সমাজ ছিল শ্রেণীভিত্তিক। সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। প্রবল পরাক্রান্ত সামন্তদের ন্যায় মন্দিরগুলির দুর্বার ক্ষমতা ছিল। এই মন্দিরগুলি ছিল এক একটি এলাকার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। কারুশিল্পী ও বণিকরা মন্দিরের কাছাকাছি বাস করিতেন এবং মন্দিরগুলিও ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থ ঋণ দিত। বিজয়নগরের সমাজে ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। ব্রাহ্মণ সভাগুলি গ্রামগুলির অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করিত। ব্রাহ্মণদের জমি চাষ করিত সাধারণতঃ অস্পৃশ্য জাতির লোকজন।

রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে প্রতি মাসেই ধর্মীয় অনুষ্ঠান জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। বিজয়নগরের রাজারা বৈষ্ণব ধর্ম অনুসরণ করিতেন। তাঁহারা পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিজয়নগরের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। নারী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল।

বিজয়নগরের রাজারা শিল্প ও সাহিত্যের প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের নির্মিত দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আজিও দেখা যায়। বিজয়নগরের নিজস্ব স্থাপত্য

রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় নির্মিত 'হাজার মন্দির' শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'বিঠলস্বামীর মন্দির' সূক্ষ্ম কারুকার্যময় ভাস্কর্যের একটি গৌরবময় নিদর্শন। চিত্রাঙ্কন এবং সঙ্গীতেও বিজয়নগর উৎকর্ষ লাভ করে। বিজয়নগরের রাজারা সংস্কৃত ও তেলেগু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময় দর্শন, ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, নাট্য, সঙ্গীত ও নৃত্য বিষয়ক বহু গ্রন্থ রাজানুকূল্যে রচিত হইয়াছিল। বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়নাচার্য ও তাঁহার ভ্রাতা মাধবাচার্য বিজয়নগরের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

শিল্প ও সংস্কৃতি

দশম অধ্যায় | সুলতানী যুগে ভারতে ইসলামের প্রভাব

মুসলমানগণ পৃথক ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার লইয়া ভারতে আসে। ইসলাম ধর্মের বিধি-ব্যবস্থা ও আচার-ব্যবহার হিন্দুধর্ম হইতে এত স্বতন্ত্র যে, ইহাকে হিন্দুধর্মে ও সমাজবিধির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীভূত করা সম্ভব হয় নাই। বরঞ্চ নানা কারণে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের প্রথমদিকে হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে ধর্মীয় বিরোধও দেখা দেয়। ইহার কারণ অবশ্য ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের কিছু-সংখ্যক রক্ষণশীল মানুষ তাহাদের নিজ নিজ মতবাদে অটল ছিলেন, ফলে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও সংঘাত দেখা দেয়। সুলতানী শাসনের যুগে রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং অমুসলমানদের প্রতি রাষ্ট্রের নীতি এই দুই বিষয় লইয়া গোঁড়া উলেমা ও মোল্লা-মৌলবীদের সঙ্গে সুলতানদের বিবাদের অবসান কখনো হয় নাই। কয়েকজন সুলতান অবশ্য শাসন ব্যাপারে উলেমাদের পরামর্শ লইতেন না। আবার ফিরোজ তুঘলকের ন্যায় সুলতান তাঁহাদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেন। স্বভাবতই এই সময় অমুসলমানগণ নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য রক্ষণশীল মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দুই মনোভাবের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের পথে বহু বাধা দেখা দেয়, কিন্তু এই বিরোধের মধ্যেও কালক্রমে উভয় ধর্মের জনসাধারণের বহুদিন ধরিয়া একত্রে বসবাস করিবার ফলে পরস্পর ধর্মমত ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুটা সহিষ্ণু হয় এবং পরস্পরের আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিতে থাকে। মুসলমান ধর্মের মধ্যে সুফিবাদ এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে ভক্তিবাদ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি মিলনের সেতু রচনা করে। মুসলমানেরা হিন্দুধর্মের বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিতে থাকেন। হিন্দুরাও মুসলমানদের জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানচর্চা করিতে শুরু করে। উর্দু ভাষা সমসাময়িক হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলনের ফলেই উদ্ভব হইয়াছিল। মুসলমান লেখকরা হিন্দী ভাষায় ও হিন্দু লেখকগণ ফারসী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন।

মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে পার্থক্য

রক্ষণশীল মনোভাব

নতুন চিন্তাধারা: উদার ধর্মচিন্তা ও ভাবের আদান প্রদানের ফল

প্রাচীন যুগে বিভিন্ন সময়ে পারসিক, গ্রীক, শক, কুষাণ, হুন প্রভৃতি বিদেশীরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম ও সমাজব্যবস্থায় পরধর্মের প্রতি উদার মনোভাবের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বিদেশী জাতিগুলি হিন্দুদের ভাষা, ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছে।

পূর্ববর্তী জাতিগুলির হিন্দু সমাজে স্থান

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উভয় ধর্মের সহিষ্ণুতা দেখা যায়। মুসলমান সুলতান হিন্দুদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিতেন। হিন্দু রাজারাও যুদ্ধে মুসলমান সৈন্য নিযুক্ত করিতেন। এইভাবে তুর্কী-আফগান যুগে উভয় সম্প্রদায়ই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে পরস্পরের শিল্পরীতি, ভাস্কর্য, স্থাপত্যকলা, সঙ্গীত, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে আদান প্রদান করিতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সহনশীলতার মনোভাবের ফল

সুলতানী যুগে মুসলমান শাসকদের প্রভাবে ভারতীয় সমাজে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে নাই। কারণ ভারতীয় কৃষি-প্রধান সমাজের জীবন রাষ্ট্র-নির্ভর ছিল না। সে কারণে মোটামুটি পল্লীসমাজের জীবনযাত্রা অব্যাহত ছিল। জিজিয়া করের ভয়ে ও জায়গীরদারের অত্যাচারে তাহাতে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নাই।

সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন

ভারতে নবাগত মুসলমানগণ তাহাদের পৃথক সামাজিক গঠন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার লইয়া হিন্দুদের হইতে স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করিতে থাকেন। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করিবার ফলে মুসলমানগণ সমাজজীবনে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত। শাসন বিভাগের উচ্চপদগুলি প্রায় সবই তাহাদের করায়ত্ত হওয়ায় তাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। তবে অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশই ছিলেন বিদেশী বংশোদ্ভূত। তাহাদের পক্ষে এদেশের জনমণ্ডলীর সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। তবে কিছুদিনের মধ্যেই তাহারা পূর্বেকার স্বতন্ত্রতা হারাইয়া ফেলে। অভিজাতদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিবাদ বিসম্বাদ সামাজিক জীবনে অস্থিরতা লইয়া আসিয়াছিল। সুলতানী যুগে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল এবং ক্রীতদাসের সংখ্যা ফিরোজ তুঘলকের শাসনকালে খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সুবিধাভোগী শ্রেণী

ক্রীতদাস প্রথা

সুলতানী-যুগে ক্রীতদাস ছাড়া সমাজ প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—সুলতান-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ, ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারী, কৃষক ও গরীব জনসাধারণ। আমীর-ওমরাহরাই ছিলেন সমাজের অভিজাত শ্রেণী এবং বিশেষ সুবিধাভোগী। এই যুগে শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই। ব্যবসায়ী, চিকিৎসক এবং নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারী ইত্যাদি লইয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী অপরিপুষ্টভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই ছিল গরীব শ্রমজীবী। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে জীবন-

সমাজে তিনটি শ্রেণী ও তাহাদের জীবনযাত্রা

যাত্রার মানের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সুলতান ও আমীর-ওমরাহগণ আলস্যে ও বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকিতেন। তাঁহাদের জীবনযাত্রায় অতিরিক্ত বিলাসিতা দেখা যাইত। ব্যবসায়ী ও নানাপ্রকার পেশাদারী ব্যক্তিরা সংযত ও মিতব্যয়ী ছিল।

কিছুসংখ্যক হিন্দুও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে ভারতে ভিন্ন দুইটি সমাজ পরস্পরের প্রতিবেশী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে—একটি হিন্দু সমাজ, অপরটি মুসলমান সমাজ। প্রথমদিকে এই দুইটি সমাজ নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষায় বিশেষ সচেতন ছিল। কিন্তু হিন্দুদের মধ্য হইতে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহারা তাহাদের সামাজিক আচার-আচরণ ভুলিতে পারে নাই। ইসলামে জাতিভেদের কোন স্থান না থাকিলেও ইহার ফলে ধর্মান্তরিতদের মধ্যে বিবাহাদি ব্যাপারে শ্রেণীগত বৈষম্য দেখা দেয়।

হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজ

সুলতানী যুগে নারীদের সামাজিক মর্যাদা বলিয়া কিছু ছিল না। তাহারা পুরুষদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিল। মুসলমান নারীদের মধ্যে পর্দাপ্রথা প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণ হিন্দু নারীদের মধ্যেও এই প্রথা প্রবর্তিত হয়। হিন্দু সমাজে সতীদাহ ও জৌহর প্রথা প্রচলিত ছিল। অর্থনৈতিক কারণে তখন কৃষক ও কারিগরদের পরিরারের মেয়েদের অনেক বেশি স্বাধীনতা ছিল।

নারীদের স্থান

ইসলামের প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজকে বাঁচাইবার জন্য জাতিভেদ প্রথা পূর্বাপেক্ষা কঠোর হইয়াছিল। হিন্দু সমাজ সংকীর্ণ ও কঠোর আচার-সর্বস্ব হইয়া দাঁড়ায়।

হিন্দু সমাজে প্রতিক্রিয়া

এই যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার দৈন্যদশা দেখা দেয়। মুসলমান বিদ্যালয়গুলি রাষ্ট্র হইতে অধিক সাহায্য পাইত। হিন্দুদের বিদ্যালয়গুলি এ সাহায্য না পাওয়ায় খুবই দুর্দশার মধ্যে পড়ে। এ যুগে শিক্ষা ছিল প্রধানত ধর্মভিত্তিক। মক্তব, মাদ্রাসার শিক্ষা ভারতে প্রচলিত হইবার ফলে বহির্ভারতের মুসলমান জগতের চিন্তাধারার সহিত ভারতের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ইউনানী চিকিৎসা রীতি এই যুগে ভারতে প্রসারলাভ করে। হিন্দুরাও এই শিক্ষা পাইবার জন্য আরবী, ফারসী শিখিতে থাকে। অবশ্য হিন্দুদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। কালক্রমে সুলতানী যুগে যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহা কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষা রহিল না। এই শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থাও কিছুটা নতুনত্বের সন্ধান পাইল। বহির্জগতের সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুরা পরিচিত হইল। আরবী, ফারসী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় তাহারা শিখিতে চাহিল। বহির্জগতের সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুদের পরিচয়ের ফলে আঞ্চলিক ভাষাগুলির উৎকর্ষ ঘটিল। টোল-চতুষ্পাঠীগুলিতেও আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হইল। হিন্দুরা আরবী ফারসী শিখিল কেবলমাত্র আর্থিক লাভের জন্য নহে। এই ভাষা শিক্ষার ফলে মুসলিম সংস্কৃতির প্রকৃত মূল্য তাহারা বুঝিতে পারিল এবং তাহাদের মধ্যে এই সংস্কৃতির প্রতি যে রক্ষণশীল মনোভাব ছিল তাহা কিছুটা দূরীভূত হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা

সাংস্কৃতিক জীবন। সুলতানী যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে একটি

গুরুত্বপূর্ণ যুগ। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই যুগের অবদান অসামান্য। ভারতীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাস, সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য যে উচ্চমানে পৌঁছিয়াছিল তাহার সহিত কালক্রমে এই নবাগতদের ধ্যান-ধারণার সুষম সমন্বয় ঘটে। ফলে এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। তবে ইহা একদিনে বা বিনা সংঘাতে ঘটে নাই। দিল্লীতে সুলতানী প্রতিষ্ঠার পর ভারত মুসলমান জগতের সাংস্কৃতিক বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইসলাম ধর্মের ধ্যান-ধারণা অনুপ্রবেশ শুরু হয়। প্রথমে সিন্ধু দেশে ও পরে সুলতানী আমলে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয় এবং অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে এই ধর্ম গ্রহণ করে।

সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উদ্ভব

ভারতে বেশিদিন একত্রে বসবাস করিবার ফলে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি সম্প্রদায়ের উপর পারস্পরিক প্রভাব বিস্তার এবং ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সংমিশ্রণও ঘটে। ভারতীয় মুসলমানগণ জাতিভেদ প্রথা কিছুটা স্বীকার করিয়া লয় এবং লৌকিক দেবদেবীকে মানিতে শুরু করেন। তাঁহারা যোগ দর্শনের কিছু কিছু দিক গ্রহণ করে এবং হিন্দুদের উৎসবগুলিতে যোগ দিতে শুরু করে, ফলে ভারতীয় পটভূমিতে ইসলাম ধর্ম এক নূতন বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হয়। হিন্দুরাও মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের ধ্যানধারণায় সূফী সম্প্রদায়-গুলির জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও ঈশ্বর পাইবার জন্য বিভিন্ন পথের অস্তিত্ব সম্পর্কিত সূফী মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেওয়া-নেওয়ার রীতি

সুলতানী যুগে হিন্দু-মুসলমান মিলনের ক্ষেত্র কেবলমাত্র ধর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও উভয়ের ভাবধারা মিশ্রিত হইয়াছিল। দিল্লী ও প্রাদেশিক সুলতানদের অনেকের মধ্যেই সাহিত্য-প্রীতি দেখা যায়। তাঁহারা অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু সংখ্যক ফারসী সাহিত্যিক তাঁহাদের আনুকূল্যে নিজ নিজ সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই আনুকূল্যে অবশ্য ফারসী সাহিত্যই বেশি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই যুগে দিল্লী, জলন্ধর, ফিরোজাবাদ এবং জোনপুর ফারসী সাহিত্য ও শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হইয়া উঠে।

সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে সমন্বয়ী মনোভাব

কবি, আমীর খসরু ছিলেন ফারসী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহাকে সুলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয়। উর্দু সাহিত্যেও তাঁহার বিশেষ অবদান রহিয়াছে। তিনি গিয়াসুদ্দিন বলবন হইতে পর পর কয়েকজন সুলতানের রাজসভা অলংকৃত করেন। সুললিত কবিতা রচনা করিয়া তিনি হিন্দুস্তানের 'বুলবুল' নামে পরিচিত হন। তিনি একাধারে ছিলেন সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি। তিনি ভারতবর্ষকে স্বর্গের সহিত তুলনা করেন। খসরু ভারতীয় ভাষাগুলির প্রশংসা করেন। হিন্দী ভাষায় তিনি কয়েকটি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

আমীর খসরুর অবদান

ভারতে ফারসী ভাষার প্রসার ঘটিবার ফলে ভারতবর্ষের সহিত ইরান ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিবিড় হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ইহা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যোগাযোগকারী ভাষারূপে গড়িয়া উঠে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও

এই ভাষার প্রচলন হয়। সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার আদান-প্রদান ঘটে এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ

এই আমলের অন্যতম বিখ্যাত কবি ছিলেন হাসান দেহ্‌লবি। ইতিহাস রচনায় সুলতানী যুগ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে মিনহাজউদ্দিনের 'তবকৎ-ই-নাসরী' ও জিয়াউদ্দিন বরনীর 'তারীখ-ই-ফিরোজশাহী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি

সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই যুগ একেবারে অনুর্বর নয়, যদিও রাজানুকূল্য হইতে সংস্কৃত সাহিত্য একেবারেই বঞ্চিত ছিল। বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফরাসী ও আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে নাই। তবে ব্যক্তি-বিশেষের চেষ্টার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ সংযোজিত হয়। শঙ্করাচার্যের অনুসরণে রামানুজ, মাধব, বল্লভ প্রমুখ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় অদ্বৈতবাদের উপর মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা ছাড়া পার্থসারথি মিশ্র কর্মমীমাংসা সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। জয়সিংহ সূরী রচিত 'হামির মদমর্দন', রবিবর্মন রচিত 'প্রদ্যুম্ন অভ্যুদয়' রূপ গোস্বামী-রচিত 'ললিতমাধব', 'বিদগ্ধমাধব', বিদ্যানাশের 'প্রতাপরুদ্র উপাখ্যান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। স্মৃতিশাস্ত্রই এই যুগের প্রধান সংস্কৃত সাহিত্য। রঘুনন্দন বাংলা-দেশের এবং মাধব বিদ্যারত্ন হইলেন দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্রকার। পদ্মনাভ ও বাচস্পতি মিশ্র ছিলেন মিথিলার স্মৃতিশাস্ত্রকার। এই যুগে লিখিবার জন্য কাগজের প্রচলন ঘটায় প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলি নূতন করিয়া লেখা ও প্রচার করিবার সুযোগ দেখা দেয়। ইহার ফলে অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ কিছুটা সহজলভ্য হয়। দর্শন ছাড়া এ যুগে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, সঙ্গীত প্রভৃতির ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ অবশ্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন।

উর্দু ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ

মুসলমানরা যখন ভারতে আসেন তখন তাঁহারা আরবী ও ফারসী ভাষা ব্যবহার করিতেন। এ দেশের অধিবাসীরা নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন। কালক্রমে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ও কথাবার্তায় প্রয়োজনের তাগিদে এক নূতন ভাষার উদ্ভব ঘটে। হিন্দী ও ফারসী ভাষার সংমিশ্রণে যে ভাষার উৎপত্তি হইল তাহাকে উর্দু ভাষা বলা হয়। হিন্দু-মুসলমান পরস্পর এই ভাষার সাহায্যে ভাব বিনিময়ের সুযোগ লাভ করে। কালক্রমে ইহা সুলতানী যুগের ভাষা হইয়া উঠে। হিন্দী বাক্যগঠন পদ্ধতি এবং ফারসী ও আরবী ভাষার শব্দ সম্ভারের মিলনে উর্দু ভাষার জন্ম। স্বভাবতই উর্দু ভাষা যাঁহারা ব্যবহার করিতেন তাহারা হিন্দীও জানিতেন। উর্দু ভাষার প্রাথমিক রূপ সুফী সাধকদের বাণীতে পাওয়া যায়। পরে সাধারণ লোকের কথোপকথনের মাধ্যম হিসাবে ইহা গণ্য হয়।

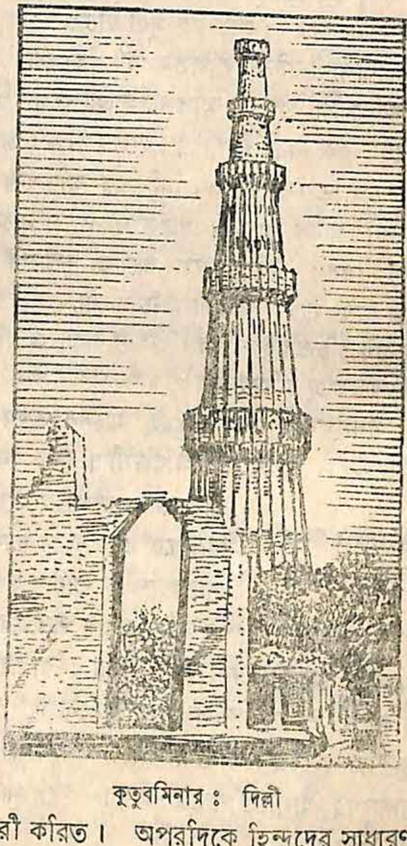
সুলতানী যুগে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার বিপুল বিকাশ ঘটে। একদিকে প্রাদেশিক

সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আর একদিকে ধর্মসংস্কারকদের বাণী প্রচারের ফলে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ ঘটে। ধর্মসংস্কারকদের বাণী যাহাতে সাধারণ লোক বুঝিতে পারে সেইজন্য তাঁহারা সহজবোধ্য ভাষাতেই গ্রন্থ লিখিতেন এবং প্রচার করিতেন। রামানন্দ ও কবীর হিন্দীভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কবীরের দোঁহাগুলি শব্দ-প্রাচুর্যে ও ভাবসম্পদে হিন্দী ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। নানক ও তাঁহার শিষ্যগণ গুরুমুখী লিপি ও পাঞ্জাবী ভাষার উন্নতি সাধন করেন। বৈষ্ণব লেখকেরা তাঁহাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় বাঙলা ভাষার নবজীবন সৃষ্টি করেন। বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী ও ঐশ্বর্যশালী করিবার জন্য মুসলমান শাসকগণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সুলতান হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহ-এর প্রচেষ্টা এইদিক হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাদেশিক ভাষার বিকাশ

স্থাপত্য ও শিল্পকলা। তুর্কীদের কেবলমাত্র ইসলাম ধর্মের প্রতিই গভীর শ্রদ্ধা ছিল না, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাহাদের উন্নত ধারণা ছিল। ভারতীয় শিল্প ও স্থাপত্য মুসলিম শিল্প ও স্থাপত্যের সুষম সমন্বয়ের ফলে এক সমৃদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পরীতি গড়িয়া উঠে। এই সমন্বয়ের কাজ অবশ্য দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। এই শিল্পরীতিকে হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতি বলা হয়। প্রথম-দিকে মুসলমান শাসকগণ প্রাসাদ, কবর ও মসজিদ নির্মাণের জন্য ভারতীয় স্থপতি ও শিল্পী নিয়োগ করিতেন। ইহার ফলে স্বভাবতই স্থাপত্য রীতিতে হিন্দু প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পরে পশ্চিম এশিয়া হইতে সুদক্ষ স্থপতি ভারতে আনা হইয়াছিল। তুর্কীরা তাহাদের শিল্পকীর্তিগুলিতে খিলান ও গম্বুজ ব্যবহার করিত। ইহার ফলে ছাদকে ধরিয়া রাখিবার জন্য স্তম্ভের প্রয়োজন বিশেষ হইত না। এই গম্বুজ তৈয়ারীর জন্য বিশেষ মশলার প্রয়োজন ছিল। তুর্কীরা উচ্চ মানের চুন, বালি ও জলের মিশ্রণে ইহা তৈয়ারী করিত। অপরদিকে হিন্দুদের সাধারণ স্থাপত্য রীতি ছিল পাথরের উপর পাথার বসাইয়া গাঁথিয়া যাওয়া। ছাদ আচ্ছাদিত

স্থাপত্য ও শিল্পকলার সমন্বয়ের কারণ ও ফলাফল

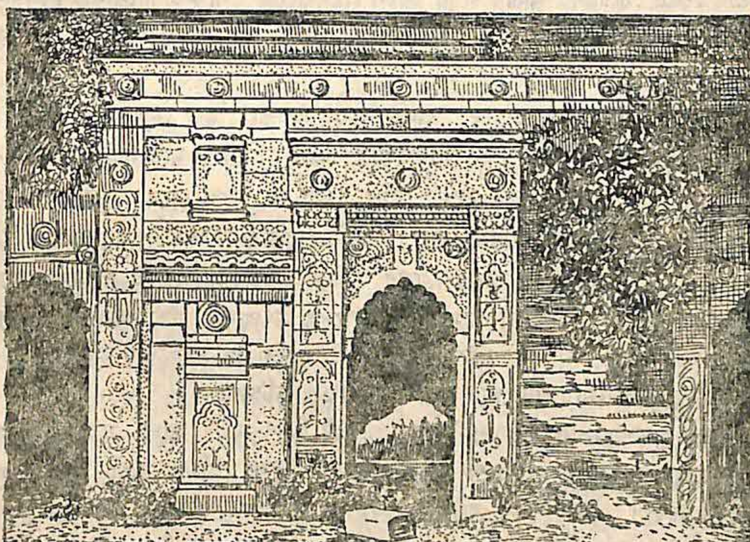


কুতুবমিনার : দিল্লী

হইত পাথর দিয়াই। তুর্কী শাসকরা এই দুইটি পদ্ধতিই তাঁহাদের অট্টালিকা নির্মাণে ব্যবহার করিয়াছিলেন। অলঙ্করণের ক্ষেত্রে তাঁহারা হিন্দু পদ্ধতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দিল্লীর স্থাপত্যকীর্তি

দিল্লীর সুলতানরা দিল্লী নগরীকে প্রাসাদে ও মসজিদে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য থাকায় ইহার শিল্পরীতিতে মুসলিম প্রভাব বেশি পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীতে এই সময় যে সব প্রসিদ্ধ সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলির মধ্যে কওয়াৎ-উল-ইসলাম, কুতুব মিনার, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার কবরের উপর মসজিদ, আলাই দরওয়াজা, জামায়েৎখান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তুঘলকী যুগে দিল্লীর শিল্পরীতি সহজ, সরল ও অলঙ্কারবর্জিত রূপ লইয়াছিল।



ছোট সোনা মসজিদ : গৌড়।

প্রাদেশিক রীতি

এই যুগে প্রত্যেক প্রদেশে নিজস্ব শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। জৌনপুর, গুজরাট, বাঙলাদেশ, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, বিজয়নগর প্রভৃতি স্থানে যে সব মসজিদ, প্রাসাদ ও মন্দির নির্মিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে স্থানীয় প্রভাবই বেশি।

জৌনপুরে

জৌনপুরের রীতিতে হিন্দু প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। এই স্থানের মসজিদগুলিতে গম্বুজের প্রভাব হিন্দুরীতির ফলে দেখা গিয়াছিল। অতাল মসজিদ জৌনপুরী রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই যুগের স্থাপত্য কীর্তির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুজরাটের স্থাপত্য শিল্প। এখানকার সৌধ নির্মাণে হিন্দু ও জৈন শিল্পরীতি অনুসরণ করা হয়। এখানকার জাম-ই মসজিদ ও মহাফিজ খাঁ মসজিদ সুপ্রসিদ্ধ।

গুজরাটে

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলা দেশের শিল্পরীতিতে এক নূতন ভঙ্গী দেখা যায়। হুসেন শাহের সমাধিস্তম্ভ এবং তাঁহার রাজত্বকালে নির্মিত ছোট সোনা মসজিদ, কদম রসুল বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লইয়া টিকিয়া রহিয়াছে।

বাংলাদেশে

দক্ষিণ ভারতের বাহমনী সুলতানরা যে স্থাপত্য-রীতি প্রচলন করেন, তাহাতে পারসিক প্রভাব প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই শিল্প-রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি জাম-ই মসজিদ, চারমিনার প্রভৃতিতে পরিস্ফুট। সুলতানী আমলে স্বাধীন বিজয়নগর, মেবার ও উড়িষ্যার প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের শিল্প-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেন। মেবারের রাণা কর্তৃক নির্মিত বিজয়স্তম্ভ, বিজয়নগরের হাজার মন্দির ও বিঠলস্বামী মন্দির প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

দক্ষিণ ভারতে

অর্থনৈতিক অবস্থা। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল মূলতঃ কৃষিনির্ভর। মুসলমানদের আগমনের ফলে এই অর্থব্যবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। সে সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি ছিল না, ফলে চাষের কাজে হিন্দুদের হাতেই থাকিয়া যায়। ভূমি-ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের জীবন পুরাতন পথেই চলিতে থাকে। শহরগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী গ্রামগুলি তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিত। শহরের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গ্রাম হইতে শহরে কারিগরগণ আসিয়া ভিড় করিত। নানা শিল্পদ্রব্য তৈয়ারীর জন্য ছোট ছোট কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

হিন্দুদের হাতে আর্থিক ক্ষমতা

বিজেতা মুসলমানগণ বাণিজ্য বিষয়ে আগ্রহী ছিল না। ফলে সুলতানী যুগে অর্থনৈতিক ক্ষমতা হিন্দুদের হাতেই থাকিয়া যায়। হিন্দু 'বেনিয়া' অর্থনৈতিক ব্যাপারে অপরিহার্য ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যও ইহারা নিয়ন্ত্রণ করিত। ব্যবসায় ক্ষেত্রে হুণ্ডিপ্রথা প্রচলিত ছিল। মহাজনেরা ব্যবসায়ীদের টাকা ঋণ দিত। বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারত বিশ্বের নানা দেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, আফ্রিকা, চীন প্রভৃতি দেশে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ছিল। ভারত আমদানি করিত ঘোড়া, প্রবাল, সিঁদুর, সীসা, রূপা, পারদ, কর্পূর, ফটকিরি, রঙ ও জাফরান। আর রপ্তানি করিত চাউল, বস্ত্র, দামী পাথর, নীল। বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশে মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। মুদ্রার মধ্যে জিতল ও টাকার কথা অধিক শোনা যায়।

আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য

সুলতানী যুগে রাষ্ট্রের আয় ছিল ভূমিকর, সুলতানের খাস জমি 'খালসা' হইতে রাজস্ব, যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত সামগ্রীর এক-পঞ্চমাংশ, গৃহকর, গোচারণ কর, জলকর, জাকৎ ও জিজিয়া কর। জিজিয়া কর লওয়া হইত হিন্দুদের নিকট হইতে। ইহা সত্ত্বেও

দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা হিন্দুদের হাতেই থাকিয়া যায়। কারণ অধিকাংশ মুসলমানই সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিত।

ধর্মীয় জীবন। মুসলমানগণ এক পৃথক ধর্মবিশ্বাস লইয়া ভারতে আসেন এবং স্বভাবতই হিন্দুদের সহিত ধর্ম বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়। মুসলমানগণ একেশ্বরবাদী এবং পৌত্তলিকতা বিরোধী। হিন্দুরা বহু দেবদেবীর পূজা করিত। মুসলমান শাসকগণ ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া ইসলাম ধর্ম প্রচারে সাহায্য করিতেন। হিন্দুগণ তাহাদের ধর্ম রক্ষার জন্য স্বভাবতই বিভিন্ন বিধিনিষেধের গণ্ডি তৈয়ারী করেন। ফলে এই দুই ধর্মের মধ্যে বিরোধ তীব্রভাবে দেখা দেয়। কিন্তু এই বিরোধের মধ্যেই কালক্রমে উভয় ধর্মের জনসাধারণ বহুদিন ধরিয়া একত্রে বসবার করিবার ফলে পরস্পর ধর্মমত সম্বন্ধে কিছুটা সহিষ্ণু হয় এবং পরস্পরের আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিতে থাকে। ইসলাম ধর্মের মধ্যে সুফীবাদ এবং হিন্দুদের মধ্যে ভক্তিবাদ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটি মিলনের সেতু রচনা করে।

ভক্তিবাদী আন্দোলনের স্বরূপ ও প্রভাব

হিন্দু ও ইসলামী ভাবধারায় সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটাইতে 'ভক্তিবাদী' আন্দোলনের অবদান সবচেয়ে বেশি। প্রধানত হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যেকার অসহিষ্ণুতা ও তাত্ত্বিকতার পরিবর্তে ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবক্তারা এক এবং অদ্বিতীয় এক ঈশ্বরের ধারণা প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন যে এই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা নিবেদন করা ধর্মীয় আচার বিচার অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং যে কোন জাতি, বর্ণ বা ধর্মবিশ্বাসের মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরলাভ সম্ভব। ইশ্বরের নিকট ধনী-নির্ধন সকলেই সমান। ভক্তিবাদের প্রসারিত এই নীতির মধ্যে সামাজিক সাম্যের আদর্শে লক্ষ্য করা যায় এবং প্রাচীন রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও ইহার দ্বারা ধ্বনিত হয়। হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্যের বিরুদ্ধেও ইহা ছিল বলিষ্ঠ প্রতিবাদস্বরূপ। স্বভাবতই সমাজের নীচু ও নিপীড়িত মানুষ এই আন্দোলনের সামিল হইয়াছিল। ভক্তিবাদের প্রচারকগণ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত গানের মধ্য দিয়া তাঁহারা এই শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন। এই গানগুলি গীত হইত শ্রোতৃবৃন্দের পরিচিত নানা জনপ্রিয় সুরে। এইরকম ও সরলভাবে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা প্রচারের ফলে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় ব্যাপারে কিছুটা সহিষ্ণু হইয়াছিল।

মধ্যযুগের ভক্তিবাদী ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে রামাৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভূত হন। তিনি রাম ও সীতার উপাসক ছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা মানিতেন না এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকেই দীক্ষা দিতেন।

রামানন্দ

রামানন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন **কবীর** (আনুমানিক ১৩৭০-১৪১৪ খ্রীঃ)। কবীর বৈষ্ণব প্রচারক রামানন্দেও ভক্ত ছিলেন। কবীর হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু

মুসলমান তাঁতীর ঘরে মানুষ হন। কবীরের জীবনকাল লইয়া তর্ক রহিয়াছে, কিন্তু তর্ক নাই তাঁহার প্রচারিত বাণীর সহজ ও সরল মহিমা লইয়া। কবীর হিন্দু ও ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মূলকথা ছিল যে, যিনি হিন্দুর ঈশ্বর, তিনিই মুসলমানের আল্লাহ। মানসিক পবিত্রতা ও আন্তরিকতার উপর তিনি বিশেষ জোর দিতেন। তিনি সামাজিক সাম্য চাহিয়াছিলেন। কবির তাঁহার শিষ্যদের সহজ সরলভাবে দিন কাটাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবানকে পাইবার উপায় সব ধর্মেই আছে, হিন্দু বা মুসলমান সকলেই একই লক্ষ্যে পৌঁছাইবার চেষ্টা করিতেছে—ইহাই তিনি বলিতেন। সরল হিন্দীতে রচিত কবীরের 'দোঁহা' বা দুই পঙক্তির কবিতাগুচ্ছ হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কবীরের শিষ্যরা 'কবীরপন্থী' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

কবীর



কবীর

শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার মধ্যে ধার্মিক হইবার গুণগুলি ফুটিয়া উঠে। মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থান পর্যটন করিয়া প্রেম ও বৈরাগ্যের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে পুরীতে দেহত্যাগ করেন। বাঙলা ও উড়িষ্যায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে চৈতন্যই সর্বাগ্রগণ্য। জীবে দয়া, ভগবানে প্রেম এই ছিল তাঁহার ধর্মের মর্মবাণী। তাঁহার ভক্তদের তৃণের ন্যায় বিনয়ী ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার উপদেশ। এই যুগের অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদিগের ন্যায় তিনিও জাতিভেদ প্রথা মানিতেন না। হরিদাস নামে একজন মুসলমান তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। কেবলমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত খুলিয়া দেয়।



শ্রীচৈতন্য

রাজস্থানের রাণা রতনসিংহের রাজপরিবারের মীরাবাঈ-এর জন্ম। তাঁহার জীবনকাল

লইয়া বিতর্ক আছে। মেবারের রাণা সঙ্গ-এর পুত্র রাজা ভোজ-এর সহিত মীরাবাঈ-এর বিবাহ হয়। কিন্তু পার্থিব সুখ তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন। রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক বহু সুমধুর পদাবলী তিনি রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত সমস্ত স্থান তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছিলেন।

মীরাবাঈ

মারাঠী ধর্মাচার্য নামদেব চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মহারাষ্ট্রে ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। তিনি হরিজন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কিন্তু ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে তিনি অনেকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেম বিষ্ণুর উপাসক। তিনি ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ধর্মমতের মূলকথা ছিল শুচিতা ও ভক্তি।

নামদেব

এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম-সংস্কারক ছিলেন শিখধর্মের প্রবর্তক **গুরু নানক**। ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোর হইতে কিছু দূরে তালবন্দী গ্রামে নানক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ভারতের নানাস্থান পর্যটন করেন। কথিত আছে, তিনি মক্কা ও বাগদাদ পর্যন্ত গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অনুগামীদের মিথ্যা ভাষণ, কপটতা ও আত্মসুখ ত্যাগ করিতে বলিতেন। নানক আনুষ্ঠানিক আচার-বহুল ধর্মে বিশ্বাস করিতেন না; তিনি সরল জীবনযাত্রা ও সহজ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর জোর দিয়াছিলেন। কবীরের ন্যায় নানকও সমাজকে সাম্যের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জাতিভেদ প্রথা মানিতেন না। সর্বধর্ম সমন্বয়ে তাঁহার আস্থা ছিল। হিন্দু ও মুসলমাম ধর্মের যাহা কিছু ভাল, তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বলেন যে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে কেহ ভালবাসা ও ভক্তি দিয়া ঈশ্বরের নাম বার বার জপ করিলে ও চিন্তা করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। তিনি অবশ্য সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে বলেন নাই। তিনি আধ্যাত্মিক জীবন ও গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য মধ্যপন্থা অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন।

গুরু নানক


গুরু নানক

নানক নূতন কোন ধর্ম প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। তিনি হিন্দু ও মুসলমানের

মধ্যে বিভেদ দূর করিতে চাহিয়াছিলেন। ননেকের জীবিতকালে শিখধর্ম হিন্দুধর্মের শাখারূপেই গণ্য হইত, পরে শিখরা এক স্বতন্ত্র ধর্ম-সম্প্রদায়ে পরিণত হয়।

১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে গুরু নানক দেহত্যাগ করেন। তিনি যে ভজন গান রচনা করেন তাহা 'আদিগ্রন্থ' নামক শিখদের ধর্মগ্রন্থে রক্ষিত হয়। নানকের কবিতা অবলম্বন করিয়া গুরুমুখী বা পাঞ্জাবী ভাষার বিশেষ উন্নতি হয়।

সুলতানী যুগের সুফী সাধকেরাও ধর্মীয় সমন্বয় সাধনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। সুলতানী যুগের প্রথমদিকেই সুফী ধর্মসাধকেরা ভারতে আসিয়াছিলেন। সুফীরা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের মতে ভগবানকে ভালবাসিয়াই তাঁহার কাছে পৌছান যায়। ইহারা হিন্দুদের মত কোন পীরেব নেতৃত্বে গোষ্ঠী গঠনও করিতেন। গোষ্ঠীর সদস্যদের বলা হইত ফকির বা দরবেশ। সুফীরা বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবীতে নবযুগ আসিবে যখন এক ইসলামী মাহ্বী (উপরকর্তা) আসিয়া ইসলামের আসল বাণী আবার প্রচার করিবেন। সুফীদের বৈরাগী জীবন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয়দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল।

সুফীবাদ

মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের একান্তবোধ এবং মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই এই হইল সুফীবাদের মর্মকথা। মধ্যযুগে ইসলাম ধর্মে উলেমাদের একাধিপত্য নষ্ট করিবার জন্য সুফীবাদ সচেষ্ট ছিল। ভারতের ধর্ম-সমন্বয়ের ইতিহাসে সুফীবাদের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রভাব মুসলমানগণ কিছুটা পরধর্মসহিষ্ণু হয়। সুফীরা ইসলামের সামাজিক সাম্য মানিয়া চলিত। ইহার ফলে সুফীবাদের সঙ্গে কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর লোকের সম্পর্ক নিকটতর হইয়াছিল। কালক্রমে সুফীদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় দেখা দেয়। এক একটি সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে থাকিত সন্ত বা গুরু। গুরু তাঁহার শিষ্যদের লইয়া থাকিতেন সরাইখানায়। গুরু বা পীরের সঙ্গে তাঁহাদের শিষ্যদের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। ভারতে সুফীদের মধ্যে দুইটি সম্প্রদায়—চিশ্‌তি ও সুহরাবর্দী বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। মুইনউদ্দিন চিশ্‌তি হইলেন চিশ্‌তি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মহম্মদ ঘুরীর বিজয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে আসেন। লাহোরে ও দিল্লীতে কিছুদিন বসবাস করিবার পর তিনি আজমীরে চলিয়া যান। আজিও তাঁহার দরবারে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়। সকল সম্প্রদায়ের নিকট ইহা এক পবিত্র তীর্থস্থানস্বরূপ। মইনউদ্দিনের পরেই সুফী সন্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হইল ফরিউদ্দিন গঞ্জইগিকর, নিজামউদ্দিন আউলিয়া। সুহরাবর্দী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বিখ্যাত সন্ত হইলেন শিহাবউদ্দিন সুহরাবর্দী ও হামিদউদ্দিন নাগোরি।

সুফীবাদের বৈশিষ্ট্য

মইনউদ্দিন চিশতি ও নিজামুদ্দিন আউলিয়া ও অন্যান্য সুফী সন্ত

ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিকে ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রথমত, ভক্তিবাদী সাধক ও সুফী ধর্মপ্রচারকদের প্রচারের ফলে উভয়

সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মনোভাবপন্ন ব্যক্তিদের মনে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হইবার পথ সুগম হয়, একে অপরকে বুঝিতে চাহে। তৃতীয়ত, হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনের কার্য কিছুটা সফল হয়। ইহার ফলে হিন্দুধর্ম শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং অন্যান্য ধর্মের আঘাত সহ্য করিবার মত ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে হিন্দু ও মুসলমান মিলন ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ সুগম করে। উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীলগণ কিছুটা দুর্বল হইয়া পড়ে। ভক্তিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনে মূল বিষয়বস্তু ছিল, ঈশ্বরের নিকট সকল মানুষই সমান। এই নীতিতে সমাজিক সাম্যের আদর্শ ধ্বনিত হইয়াছিল। সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধেও ইহা কাজ করিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মমতের গোঁড়া সমর্থকদের ইহা যেমন বিরোধিতা করে, অপরদিকে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা ও মুসলমানদের সুবিধাভোগী আধিপত্যের অবসান চায়।

ধর্মীয় আন্দোলনের ফলশ্রুতি

মুঘল যুগে ভারত

প্রথম অধ্যায় — মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদান

মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদানের কোন অভাব নাই। সুলতানী আমলের লিখিত বিবরণের সংখ্যার চেয়ে ইহা আরও অনেক বেশি। আব্বাস সারওয়ানী রচিত 'তারীখ-ই শের শাহ' শের শাহের রাজত্বকাল সম্বন্ধে আলোকপাত করে। মুঘল সম্রাট বাবর-রচিত 'বাবরনামা' ও সম্রাট জাহাঙ্গীর-লিখিত 'তুজক-ই জাহাঙ্গীরি' স্বরচিত গ্রন্থ আত্মচরিত হিসাবে মূল্যবান। এই যুগের অন্যান্য অসংখ্য লেখকদের গ্রন্থের মধ্যে আবুল ফজল রচিত 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই আকবরী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'আইন-ই আকবরী'কে সে যুগের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক দলিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহা ছাড়া নিজামুদ্দিন আহম্মদের 'তবকাৎ-ই আকবরী', আবদুল কাদির বদাউনীর 'মুন্তখব-উৎ তবারীখ', মহম্মদ কাশিম ফিরিস্তার 'গুলসাহান-ই-ইব্রাহিমী' ও 'তরীখ-ই-ফিরিস্তা', আবদুল হামীদ লাহোরীর 'বাদশাহনামা', মির্জা মহম্মদ কাজিম-এর 'আলমগীরনামা', মহম্মদ হাশীম কাফি খাঁর 'মন্তখব-উল-লুবাব' এবং গোলা মহুসেন লিখিত 'সিয়র-উল-মতাখারিন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগমের 'হুমায়ুননামা' মুঘল আমলের আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

লিখিত ইতিহাস ও ঐতিহাসিকগণ

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়া মুঘল সম্রাটদের অসংখ্য রাজকীয় ফর্মান ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মূল্যবান। মুঘল সাম্রাজ্যের রাজস্ব-বিষয়ক আইনকানুন, বিভিন্ন বিষয়ের প্ররিসংখ্যানমূলক গেজেট 'দস্তুর-উল-অমন' ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে মূল্যবান। সরকারী দফ্‌তরে কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ রাখিবার পদ্ধতি এ যুগে কিছুটা ভাল ছিল বলিয়া ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সুবিধা হইয়াছে। অবশ্য বৈদেশিক আক্রমণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে আকবরের গ্রন্থাগারে চব্বিশ হাজার পাণ্ডুলিপি ছিল। এগুলির কোন চিহ্নই বর্তমানে নাই। অবশ্য রাজস্থান ও অন্যান্য প্রদেশিক রাজধানীগুলিতে বহু চিঠি ও দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গিয়াছে। এগুলি মুঘল যুগের ইতিহাস রচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে।

সরকারী দলিল ও দস্তাবেজ

এই যুগের ঈশ্বরদাস নাগর, ভীমসেন প্রভৃতি হিন্দুরাও ফারসী ভাষায় ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। রাজপুত চারণদের গীতিকাব্যও খ্যাত। শিবাজীর সময় লেখা সভাসদদের, ঔরংজেবের শাসনকালে প্রকাশিত সরকারী সংবাদপত্র 'আখবরাৎ' এবং পেশোয়ার দফতরে রক্ষিত নথিপত্র প্রভৃতিও মুঘল যুগের ইতিহাস রচনায় প্রভূত সাহায্য করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য,

অন্যান্য লিখিত তথ্য

কুঠিগুলি ও কারখানাতে বহু কাগজপত্র রাখা হইত, পরে সেগুলির কিছু প্রকাশ করা হইয়াছে এবং ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গৃহীত হইয়াছে।

মুঘল যুগে বহু ইউরোপীয় পর্যটক এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণী হইতে মুঘল যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই সকল পর্যটকদের মধ্যে র‍্যালফ ফিচ, টেভারনিয়ার, মানুচি, বর্নিয়ার, মনসেরাট, হকিন্স এবং ইংল্যাণ্ডের রাজার দূত স্যার টমাস রো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পর্যটকদের বিবরণ

মুঘল যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংখ্যা অসংখ্য। এগুলি ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। এগুলি হইতে সে যুগের শিল্পকলার পরিচয়ই কেবল পাওয়া যায় না, সামাজিক রুচি ও রীতির চিত্র পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া এ যুগের মুদ্রাগুলিও মুঘল যুগের ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করে। অর্থনৈতিক বনিয়াদের চিহ্নস্বরূপ এগুলিকে ধরা হয়। তবে মুঘল যুগের লিখিত বিবরণ এত বেশি যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর বিশের নির্ভর না করিয়াও পক্ষপাতহীন ইতিহাস লেখা সম্ভব।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায় | ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ বাবর

মুঘলদের উৎপত্তি। বাবরকে ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। মুঘল আর মঙ্গোল কথা এক নয়। মুঘল এবং মঙ্গোলরা উভয়েই মধ্য এশিয়ার অধিবাসী হইলেও মুঘলগণ ছিলেন তুর্কী জাতীয়। তাহারা প্রাচীন আর্য জাতির একটি শাখা হিসাবে তুর্কীস্থানে বসবাস করিত। মঙ্গোলরা ছিল এক যাযাবর জাতি। চীনের তৃণভূমি অঞ্চলে ইহাদের আদি বাসভূমি ছিল। চেঙ্গিস খান তাহাদের এক দুর্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত করেন। তিনি পশ্চিম তুর্কীস্থান, খীভা রাজ্য, বাগদাদ, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল দখল করিয়া এক বিরাট মঙ্গোল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কালক্রমে উভয় জাতি পরস্পরের আচার-ব্যবহার অনুসরণ করে। তুর্কীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং মোঙ্গলদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক শুরু হয়। ফলে মঙ্গোল ও তুর্কী জাতির সংমিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব ঘটে তাহা তুর্ক নামে পরিচিত। তুর্করা কিন্তু একেবারে মঙ্গোল ছিল না।

তুর্কীজাতির উৎপত্তি

এশিয়ায় দুইজন শ্রেষ্ঠ বীর—তৈমুরলঙ ও চেঙ্গিস খানের সহিত বাবরের রক্তের সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন পিতার দিক হইতে তৈমুরের অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং মাতার দিক হইতে চেঙ্গিস খানের বংশধর। অতএব বাবরের স্থাপিত বংশকে তৈমুর বংশ বলাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মধ্যযুগের মুসলমান ঐতিহাসিকরাই তৈমুরলঙকে মঙ্গোল বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, এবং

বাবরের বংশ পরিচয়

যেহেতু বাবর নিজেকে তৈমুরের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সে কারণে বাবরকেও মঙ্গোল বা মুঘল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তাহা ছাড়া ইউরোপে বাবর প্রতিষ্ঠিত বংশ 'দি গ্রেট মুঘলস' বলিয়া পরিচিত ছিল। এইসব কারণেই বাবর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে মুঘল সাম্রাজ্য বলা হইয়া থাকে।

তথাকথিত মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য

১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে বাবর কর্তৃক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। দিল্লীর সুলতানী শাসনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে যে ভারতে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয় শক্তিশালী মুঘল সম্রাটদের শাসনে এই অবস্থার অবসান ঘটে এবং ভারত পুনরায় এক পরাক্রমশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়।

বাবরের ক্ষমতা বিস্তার

বাবর। বাবরের পিতা ওমর শেখ মির্জা মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত ফারগানা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। মাত্র এগার বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া বাবর ফারগানা রাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। তিনি দুইবার সমরখন্দ অধিকার করেন, কিন্তু দুইবারই জ্ঞাতিবর্গের চক্রান্তে উক্ত স্থান হইতে বিতাড়িত হন। অবশেষে মধ্য এশিয়া পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে তিনি কাবুলে উপস্থিত হন এবং ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে বাহুবলে উক্ত রাজ্য অধিকার করেন। ইহার পর কান্দাহার জয় করিয়া বাবর ভারত সীমান্ত পর্যন্ত নিজ রাজ্যসীমা বিস্তার করেন।


বাবর

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ

এই সময় অনৈক্যে বিভক্ত ভারতের দিকে বাবরের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি মোট পাঁচবার ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেন এবং ক্রমশঃই তিনি সাহস সঞ্চয় করিতে থাকেন। এই পাঁচবারের মধ্যে কোন সময়ে ঝিলাম নদী, কোন সময়ে পেশোয়ার, কোন সময় শিয়ালকোট পর্যন্ত অগ্রসর হন। ১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে বাবর লাহোর অধিকার করেন এবং দিপালপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। ইহার পর বৎসর পুনরায় সৈন্যদল পুনর্গঠন করিয়া তিনি ভারত জয়ের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করেন এবং দিল্লীর নিকট উপস্থিত হন। বাবরের সুনিপুণ যুদ্ধকৌশল ও গোলন্দাজ বাহিনীর সহিত

সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদী সম্পূর্ণ পরাজিত হন। এই যুদ্ধের সাফল্যের ফলে দিল্লী ও আগ্রা অঞ্চলে বাবরের প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধের গুরুত্ব

পানিপথের প্রথম যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। এই যুদ্ধের ফলে ভারতের ইতিহাসে একটি নূতন যুগের সূচনা হইল। দিল্লীর সিংহাসনে একটি নূতন রাজবংশের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইল এবং সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল ; তবে এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র ভারতে মুঘল আধিপত্য স্থাপিত হয় নাই। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ ছিল মাত্র।

খানুয়ার যুদ্ধ

পানিপথের যুদ্ধের পর বাবর দিল্লী ও আগ্রার অধীশ্বর হইলেও সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিতে তাঁহাকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। একদিকে পাঠান জায়গীরদারগণের বিরোধিতা, অপরদিকে মেবারের রানা সংগ্রামসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে তাঁহাকে লড়িতে হইয়াছিল। আগ্রার পশ্চিম প্রান্তে খানুয়া নামক স্থানে বাবরের বাহিনী সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীর সম্মুখীন হইল (১৫২৭ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে রাজপুতগণ প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হইল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব সর্বাধিক। রানা সঙ্গ ইব্রাহিম লোদী অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী ছিলেন। সুতরাং পানিপথের প্রথম যুদ্ধ অপেক্ষা খানুয়ার যুদ্ধ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই যুদ্ধে রাজপুতদের পরাজয়ের ফলে তাহাদের পক্ষে ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করা আর সম্ভব হইল না। অপরদিকে মুঘল শক্তিকে প্রতিহত করিবার মত উপযুক্ত শক্তিও আর ভারতে রহিল না। দিল্লীতে বাবরের সিংহাসন নিরাপদ হইল। তাঁহার নবগঠিত সাম্রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। দ্বিতীয়ত, তাঁহার রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল কাবুল হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইল।

উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার

খানুয়ার যুদ্ধের পর বাবর বিহার ও বাঙলায় আফগান শক্তিকে উৎখাতের কার্যে মনোনিবেশ করেন। ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে গোগ্‌রা নামক স্থানে তিনি বাঙলা ও বিহারের শাসনকর্তা মহম্মদ লোদীকে পরাজিত করেন। এইভাবে তিনটি যুদ্ধ দ্বারা বাবর প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য কাবুল হইতে গোগ্‌রা এবং হিমালয় হইতে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত হইহ ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাবরের কৃতিত্ব

জহিরউদ্দিন মহম্মদ বাবর একজন প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। সামান্য ভাগ্যান্বেষী সৈনিকরূপে তিনি জীবন শুরু করেন। কিন্তু অসাধারণ কর্মদক্ষতার গুণে ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। যোদ্ধা হিসাবে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। কূটনীতিজ্ঞ হিসাবেও তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীর। পানিপথের যুদ্ধের পূর্বে দৌলত খাঁ লোদীর সহিত সম্পর্ক স্থাপন এবং খানুয়ার যুদ্ধের পূর্বে কয়েকজন আফগান দলপতির সমর্থন লাভ প্রভৃতি তাঁহার

অসাধারণ কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচয়। তবে শাসক হিসাবে তিনি কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে তিনি তাঁহার অর্থভাণ্ডার শূন্য করিয়া ফেলেন। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল।

বাবর কেবল একজন রণকুশল সেনানায়ক ছিলেন না। সাহিত্য ও চারুকলায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ফারসী ভাষায় তিনি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন।

বাবরের আত্মজীবনী

তুর্কী ভাষায় তিনি গদ্য ও পদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তুর্কী ভাষায় তিনি আত্মকথা ('বাবরনামা') রচনা করিয়া গিয়াছেন! ইহা সাহিত্যরসে স্নিগ্ধ। তাঁহার আত্মকথায় স্নেহশীল ও উদার মানুষ বাবরের সুস্পষ্ট চিত্র আমরা পাই।

তৃতীয় অধ্যায় | মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ : হুমায়ুন ও শের শাহ

হুমায়ুন। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু পিতার নির্দেশমত তিনি সাম্রাজ্যের কতক অংশ ভ্রাতাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেন।

সিংহাসন লাভ করিয়া হুমায়ুনকে বহুবিধ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই সময় গুজরাটে বাহাদুর শাহ এবং বিহারে শের খাঁ শক্তি সঞ্চয় করিয়া হুমায়ুনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়োজন করিতেছিলেন।

হুমায়ুনের সমস্যা

হুমায়ুন রণকুশল বাদশাহ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে যথোচিত দৃঢ়তা এবং কর্মপটুতার অভাব ছিল। চারিদিকে বিদ্রোহ দমন করিয়া রাজ্যে শান্তি ও শৃখলা স্থাপন করিবার মত সামর্থ্য তাঁহার ছিল না।



হুমায়ুন

মোঘল-আফগান সংঘর্ষ। লোদী বংশীয় সুলতানগণ জাতিতে পাঠান বা আফগান ছিলেন। এই বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকালে বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে মুঘল-আফগান সংঘর্ষ শুরু হয়। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে মোগল-আফগান সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। বাবরকে বিভিন্ন স্থানে আফগানদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। হুমায়ুনের রাজত্বের ঘটনা হইল পাঠান শক্তির সহিত তাঁহার সংঘর্ষ এবং এই সংঘর্ষে পাঠানদের জয় ও মুঘলদের

পরাজয় হয়। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে মুঘল আফগানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বতার নিষ্পত্তি হইয়াছিল।

বাবর গুজরাট জয়ের সুযোগ পান নাই। মহুায়ুনের সময় গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া মালব জয় করেন। এই সংবাদে শঙ্কিত হইয়া হুমায়ুন ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট আক্রমণ করিয়া মালব ও গুজরাটের কিছু অংশ দখল করিয়া লন। কিন্তু গুজরাটের যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই বিহারে শের খাঁর অভ্যুত্থানের সংবাদ পাইয়া তিনি বিহারের দিকে অগ্রসর হন। চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে তিনি শের খাঁর নিকট পরাজিত হন এবং দিল্লী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে তিনি পারস্য-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে বিজয়ী শের খাঁ 'শের শাহ্' উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন পূনরায় পুনঃরায় দিল্লী দখল করেন।

শের খাঁর নিকট পরাজয়

শের শাহ্। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শের শাহের আকস্মিক আবির্ভাব ও অভাবনীয় সাফল্য যেমন বিস্ময়কর তেমনি চমকপ্রদ। শের শাহের আদি নাম ছিল ফরিদ। তাঁহার পিতা হাসান খাঁ বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গীর-দার ছিলেন। বাল্য-কালেই বিমাতার চক্রান্তে তিনি পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। অল্পবয়সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তিনি জৌনপুরে গিয়া ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি বিহারের শাসনকর্তা বহর খাঁর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি একাকী একটি বাঘ (শের) শিকার করিয়া প্রভুর নিকট হইতে 'শের খাঁ' উপাধি লাভ করেন।

শের শাহের বাল্যজীবন



শের শাহ

তিনি বিহারের শাসনকর্তার নাবালক পুত্রের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত হন। শাসনকর্তার মৃত্যুর পর তিনিই প্রকৃতপক্ষে বিহারের শাসনকর্তা হইয়া দাঁড়ান। ক্রমে চুনার দুর্গ তাঁহার অধিকারে আসে। তাঁহার ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া বিহারের জায়গীরদারগণ বাঙলার সুলতানের সহিত একযোগে শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু শের খাঁ সূরজগড়ের যুদ্ধে এই সম্মিলিত দলকে পরাজিত করেন। এই জয়ে উৎসাহিত হইয়া তিনি বাঙালাদেশ আক্রমণ করিয়া রাজধানী গৌড় দখল করিয়া লন। শের খাঁর

ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া হুমায়ুন সসৈন্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু চৌসা নামক স্থানে শের খাঁর হস্তে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। বাংলা ও বিহারের স্বাধীন সুলতান হিসাবে শের খাঁ এই সময় 'শের শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন আর একবার শের শাহ্‌র শক্তি পরীক্ষা করিতে আসিয়া কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া পারস্যে পলায়ন করেন। শের শাহ্‌ দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

হুমায়ুনের সহতি সংঘর্ষ : হুমায়ুনের পরাজয়

অতঃপর শের শাহ্‌ হুমায়ুনের ভ্রাতা কামরানের নিকট হইতে পাঞ্জাব দখল করেন। পাঞ্জাবের গক্কর নামক দুর্ধর্ষ পার্বত্য উপজাতিকে তিনি দমন করেন। বাঙালার বিদ্রোহও তিনি সবল হস্তে দমন করেন এবং সেখানে নিজের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পর তিনি বিনা অয়াসে মালব দেশ অধিকার করেন এবং গোয়ালিয়র, রনথম্ভোর ও রায়সিনের দুর্গসমূহ দখল করিয়া নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। ক্রমে সিন্ধু ও মুলতানে শের শাহের অধিকার বিস্তারলাভ করে। ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অসামান্য চাতুর্যের বলে মাড়বারের পরাক্রান্ত রাজা মালদেবকে শের শাহ্‌ পরাজিত করেন। কিছুকাল পরে মেবারের চিতোর দুর্গও তাঁহার হস্তগত হয়। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে হঠাৎ তিনি বোমার আগুনে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শের শাহ্‌-এর সাম্রাজ্য বিস্তার

শের শাহের শাসনব্যবস্থা। প্রধানতঃ বাহুবলে এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে প্রতিভার পরিচয় দিলেও শাসনব্যবস্থার সংগঠকরূপে শের শাহ্‌ ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার শাসনব্যবস্থা ছিল মূলতঃ স্বৈরতান্ত্রিক। তাঁহার হস্তেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি চারজন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক একজন মন্ত্রীর উপর এক-একটি বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। মন্ত্রী ছাড়াও আরও উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। উলেমাদের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শাসনক্ষেত্রে তিনি উগ্র ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করেন নাই।

সামরিক বিভাগে তিনি সংস্কার প্রবর্তন করেন। সুলতান ছিলেন সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সৈন্য ও সামরিক কর্মচারীদের জায়গীর দেওয়ার পরিবর্তে তিনি বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য শের শাহ মুদ্রা ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন ও মিশ্রিত মুদ্রার প্রচলন অব্যাহত রাখেন এবং 'দাম' নামে এক নূতন মুদ্রার প্রচলন করেন। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে তিনি পুলিস-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। শান্তি বজায় রাখিবার জন্য এবং অপরাধীকে শায়েস্তা করাবার জন্য তিনি স্থানীয় জনসাধারণের উপর নির্ভর করিতেন। দেশের বিভিন্ন অংশের খবরাখবর সংগ্রের জন্য

শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা

শের শাহ গুপ্তচর নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বিচার বিভাগের যথোচিত সংস্কার সাধন করেন। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি উচ্চনীচ ভেদ করিতেন না।

শের শাহ্ তাঁহার সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে, প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত করেন। তাঁহার সাম্রাজ্য কম করিয়া ৪৭টি সরকারে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক পরগণা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি ছিল। প্রত্যেক পরগণায় আমিন, শিকদার, খাজাঞ্চী, দুইজন কারকুন ও মুন্‌শী প্রভৃতি কর্মচারী থাকিত। প্রত্যেক সরকারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করা হইত। শের শাহ্ সরকারী কর্মচারীদের একই স্থানে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি তাহাদের বদলীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শাসন বিভাগ 'প্রদেশ' 'সরকার', ,পরগণা' 'গ্রাম'

শের শাহ্ সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করাইয়া ভূমি-রাজস্বের হার নির্ধারণ করেন। প্রজার স্বত্ব ও দায়িত্ব সুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত করিবার জন্য তিনি 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' প্রবর্তন করেন। 'পাট্টা'তে প্রজাদের জমির সীমা, স্বত্ব ও মালিকানা ইত্যাদি উল্লেখ থাকিত, আর কবুলিয়তে থাকিত প্রজাদের রাজস্ব দিবার শর্তাদি। অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য কারণে শস্যহানি ঘটিলে খাজনা মকুব ও কৃষিঋণের ব্যবস্থা ছিল।

রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি মুদ্রা ও বাণিজ্য নীতির সংস্কার করেন। বাণিজ্যের প্রসার, সৈন্য চলাচল ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি কয়েকটি সুদীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করেন। তিনি রাজপথগুলির পার্শ্বে ছায়াপ্রদ বৃক্ষ রোপণ করেন এবং পথচারীদের সুবিধার জন্য রাজপথের উভয়পার্শ্বে ৭ কিলোমিটার অন্তর হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বিশ্রামাগার ও পান্থশালা স্থাপন করেন। তাঁহার আমলে অশ্বপৃষ্ঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা শুরু হয়। শের শাহ শাসন ও চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তারতম্য করিতেন না। সুযোদ্ধা ও দক্ষ শাসক শের শাহ্ স্থাপত্য শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

অন্যান্য সংস্কার

শের শাহের রাজত্বকাল ছিল মাত্র পাঁচ বৎসর। যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া তাঁহাকে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও খুব কম সময়ের মধ্যেই এই অসামান্য সামরিক যোদ্ধা যেভাবে শাসন-কৃতিত্ব, সংগঠন-প্রতিভা ও রাজোচিত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেন তাহা অভূতপূর্ব বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। প্রজার কল্যাণ ও সন্তোষ বিনা যে রাজশক্তি ব্যর্থ তাহা তিনি ভালভাবেই জানিতেন। মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শাসকরূপে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করিতেন না।

শের শাহের কৃতিত্ব

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইসলাম শাহ নয় বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বকালে আফগান সাম্রাজ্যের কোন বিপদ ঘটে নাই। কিন্তু ১৫৫৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার শিশুপুত্রকে হত্যা করিয়া আদিল শাহ সিংহাসন দখল করেন। তাঁহার অযোগ্য শাসনে সাম্রাজ্যের সর্বত্র গোলযোগ দেখা দেয়। ইহার সংবাদ পাইয়া হুমায়ুন

তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া ভারতে প্রবেশ করেন। পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা সহজেই তিনি পুনরুদ্ধার করেন। এইবার আফগানরা তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। ইহার ফলে ভারতে মুঘল শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল (১৫৫৫ খ্রীঃ)।

চতুর্থ অধ্যায় | মহামতি আকবর

১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে ১৫ অক্টোবর অমরকোট নামক স্থানে আকবর জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের ছয় মাসের ভিতরেই খুল্লতাত আসকারী তাঁহাদের বন্দী করিয়া কান্দাহারে নজরবন্দী করিয়া রাখেন। ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে হুমায়ুন আকবরকে উদ্ধার করেন। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করিয়া বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বে আকবরকে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যু হইলে পাঞ্জাবের কালানউর নামক স্থানে আকবরের অভিষেক সুসম্পন্ন হয়।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর আকবরের একরকম রাজ্যহীন রাজ্যের রাজা হন। কারণ উত্তর ভারতের এক পাঞ্জাব ছাড়া কোন অংশই মুঘলদের অধিকারে ছিল না।

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ

হুমায়ুনের মৃত্যুর সুযোগে বাঙলার আফগান শাসক আদিল শাহের সেনাপতি হিমু দিল্লীর মুঘল শাসন কর্তাকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লন। স্বভাবতঃই আকবর ও বৈরাম খাঁর প্রথম কাজ হইল হিমুকে পরাজিত করা এবং সে উদ্দেশ্যে পানিপথ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। এই যুদ্ধে মুঘল বাহিনী জয়লাভ করিয়া দিল্লী ও আগ্রা পুনরধিকার করে। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুদ্ধে মুঘলরা জয়ী হইবার ফলেই ভারতে আফগান প্রভুত্বের অবসান ঘটে।



আকবর

পানিপথের যুদ্ধের পরও আকবরের অভিভাবক হিসাবে বৈরাম খাঁ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি গোয়ালিয়র, জৌনপুর ও আজমীড় অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতা, ঔদ্ধত্য ও স্বজনপোষণ আকবরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। তিনি ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে বৈরামকে পদচ্যুত করেন। বৈরাম বিদ্রোহ

করিলে তাঁহাকে দমন করা হয়। আকবর বাস্তববাদী সম্রাট ছিলেন। শাসনকার্য নিজের হস্তে গ্রহণ করিয়াই আকবর রাজ্যবিস্তারের দিকে মনোযোগী হন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৬০১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অবিরত রাজ্যবিস্তারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

বৈরাম খাঁর পদচ্যুতি : নিজ হস্তে ক্ষমতা গ্রহণ

মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংহতি। আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন সে সময় মুঘল রাজ্য গঙ্গা-যমুনার উপত্যকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাব ও আফগান ভূখণ্ডগুলির সঙ্গে কোনরূপ যোগাযোগ ছিল না। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য উত্তর ভারতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দক্ষিণ ভারতেও কিছুটা প্রসারিত হয়। তিনিই আগ্রা শহরে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন।

১৮ বৎসর হইতেই আকবর স্বহস্তে রাজ্যের শাসনভার তুলিয়া লন। তিনি প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে একমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাহায্যেই ভারত শাসন করা সম্ভব। প্রথম হইতেই তিনি বীর জাতি রাজপুতদের সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হন।

গণ্ডোয়ানা আক্রমণের দ্বারা (১৫৬৪ খ্রীঃ) আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি স্পষ্ট রূপ পায়। ঐ অঞ্চলের রানী দুর্গাবতী মুঘলদের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রম ও অদম্য সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন ও পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন। মুঘল সৈন্যরা গণ্ডোয়ানা অধিকার করে।

আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তার

আকবরের উদ্দেশ্য ছিল রাজপুতদের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়ায় আসা। দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ রাজনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। কে শাসক হইবে তাহা লইয়া তাহারা বিশেষ মাথা ঘামাইত না। কিন্তু রাজপুতরা ছিল অন্যরকম। তাহাদের প্রভাব কেবলমাত্র রাজপুতানার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, দেশের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদিত। আকবর উপলব্ধি করেন যে বীর রাজপুতদের উপর বিশ্বাস রাখা যায় এবং তাহারা নির্ভরযোগ্যও বটে। তবে ইহা সম্ভব হইবে যদি তাহাদের সহিত সম্মানজনক সম্পর্ক এবং উচ্চনীচ মনোভাবশূন্য হইয়া বন্ধুত্বের হাত বাড়াইয়া দেওয়া হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে রাজপুত জাতিকে স্ববশে না আনিতে পারিলে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মুঘল শক্তির বিস্তার অসম্ভব। এই কারণে আকবর রাজপুতদের সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মোটামুটি তিনটি কর্মপন্থা স্থির করেন : (ক) রাজপুতানার ঘটনাবলীর স্থির বিবেচনার নীতি ; (খ) রাজপুত নেতাদের সহিত সখ্যতা স্থাপন ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নীতি ; এবং (গ) প্রথম দুইটি নীতি ব্যর্থ হইলে যুদ্ধ-নীতি। এই নীতিগুলির উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রথমে ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে অম্বররাজের বিহারীমলের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং বিহারীমলের পুত্র ভগবান দাস ও পৌত্র মানসিংহকে উচ্চপদে

আকবরের রাজপুত নীতি

নিযুক্ত করেন। ফলে মানসিংহের নেতৃত্বে রাজপুত অশ্বারোহী বাহিনী মুঘল সেনাপতির সহিত যুদ্ধ হইল। মানসিংহ ছিলেন প্রতিভাবান সেনাধ্যক্ষ। ইহার ফলে বিভিন্ন রাজ্য জয় করিতে আকবরের সুবিধা হইয়াছিল। আকবরের এই সখ্যতা স্থাপনের নীতিতে অধিকাংশ রাজপুত নায়ক সাড়া দিলেও মেবার, কালিঞ্জর ও রণথম্ভোরের অধিপতিগণ বিরোধিতা করেন। আকবর ঐ তিনটি রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধনীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

মেবারের শিশোদিয়া রাণাদের সহিত আকবরের দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনটি পর্যায়ে যুদ্ধ চলে। ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া তাঁহার রাজত্বের শেষ পর্যন্ত মেবারের পর পর তিনজন রানা, যথা উদয়সিংহ (১৫৬৭—১৫৭২ খ্রীঃ), প্রতাপসিংহ (১৫৭২—১৫৯৭ খ্রীঃ) ও অমরসিংহ তাঁহার বিরোধিতা করেন।

রানা উদয়সিংহ আকবরের সহিত কোন সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ না করায় আকবর ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে মেবারের প্রধান দুর্গ চিতোর অবরোধ করেন। উদয়সিংহ যদিও চিতোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, কিন্তু রাঠোর নেতা জয়মলের নেতৃত্বে মেবারবাসীরা মুঘলদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যান। আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া জয়মল প্রাণত্যাগ করিলে তুমুল যুদ্ধের পর ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে চিতোর আকবরের হস্তগত হয়।

চিতোর আক্রমণ

রানা উদয়সিংহের মৃত্যুর পর (১৫৭২ খ্রীঃ) তাঁহার বীরপুত্র প্রতাপসিংহ রাণা হইলেন। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য মুঘলদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ চালাইয়া যান। প্রতাপকে দমন করিবার জন্য আকবর যুবরাজ সেলিম ও মানসিংহের নেতৃত্বে এক বিশাল মুঘল সৈন্যদল প্রেরণ করেন। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে **হলদিঘাটের যুদ্ধে** প্রতাপ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হন। অতঃপর প্রতাপ পার্বত্যাঞ্চলে আশ্রয় লইয়া প্রতিরোধ চালাইয়া যান। মৃত্যুর (১৫৯৭ খ্রীঃ) পূর্বে প্রতাপসিংহ চিতোর ও আজমীড় বাদে তাঁহার অন্যান্য দুর্গগুলি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রানা প্রতাপসিংহ

১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে আকবর গুজরাট জয় করেন। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার সৈন্যদল রাজমহলের যুদ্ধে বাঙলার সুলতান দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করিয়া বাঙলা অধিকার করে। কিন্তু সমগ্র বাঙলায় মুঘল আধিপত্য স্থাপন করিতে কিছু সময় লাগে। চাঁদ রায়, কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য, কন্দর্পনারায়ণ প্রমুখ ভৌমিকরা বহুদিন পর্যন্ত মুঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাধীনভাবে বিস্তীর্ণ জমিদারী শাসন করিতেন। অবশেষে টোডরমল ও মানসিংহের চেষ্টায় বাঙলাদেশের অনেক এলাকা আকবরের অধীনে আসে।

গুজরাট ও বাংলাদেশ জয়

ইহার পর আকবর ক্রমে কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধু, কান্দাহার, বেলুচিস্তান এবং উড়িষ্যা অধিকার করিয়া নেপাল, সিকিম, ভুটান এবং আসাম ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতে নিজ অধিকার বিস্তার করেন।

উত্তর ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া অকবর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা—এই চারিটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ছিল। আকবর এইসব মুসলমান রাজাদের তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে আহ্বান জানান। কিন্তু খান্দেশের অধিপতি ছাড়া আর কোন সুলতান তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। আকবর ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগর আক্রমণ করেন এবং কিয়দংশ অধিকার করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। আহম্মদনগরের পতনের পর খান্দেশের বুরহানপুর ও অসীরগড় দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয় (১৬০৫ খ্রীঃ)। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাম্রাজ্যবিস্তার নীতির পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দক্ষিণ ভারত

আকবরের শাসনব্যবস্থা। মুঘল আমলের শাসনব্যবস্থা আকবরের সৃষ্টি। তিনি যে শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহাকে পারস্য, আরব ও ভারতীয় শাসন পদ্ধতির মিশ্ররূপ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়—কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, বিচারব্যবস্থা, রাজস্ব, ভূমি রাজস্ব ও সামরিক ব্যবস্থা।

শাসনব্যবস্থার স্বরূপ

সম্রাট স্বৈরতান্ত্রিক শাসক ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী শাসন পরিচালিত হইত। তিনি একাধারে ছিলেন শাসক, প্রধান বিচারক এবং সামরিক বিভাগের সর্বময় কর্তা।

সম্রাটই সর্বোচ্চ

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবর বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করেন। উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে ভকিল (প্রধানমন্ত্রী) সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সম্রাটের পরেই তাঁহার স্থান ছিল। অপরাপর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে উজীর, মীর বক্সী, মীর সামান, সদর-উল সদর, কাজী-উল-কাজাৎ উল্লেখযোগ্য ছিলেন! উজীর ও দেওয়ানের সম্মান খুবই বেশি ছিল। রাজস্ব ও অর্থবিভাগের ভার দেওয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল। রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরা বেশির ভাগই হিন্দু ছিলেন।

উচ্চপদস্থ কর্মচারী

সম্রাট বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সুবিচারের দিকে তিনি নজর দিতেন। প্রজারা সরাসরি সম্রাটের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। কাজী-উল-কাজাৎ ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান। তাঁহার অধীনে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে কাজী নামধারী বিচারকেরা নিযুক্ত থাকিতেন।

বিচার ব্যবস্থা

আকবর রাজস্ব বিভাগে বহু প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রবর্তন করেন। আকবরের পূর্ব হইতে দুই প্রকারের রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যথা—গাম্পা-বকসী ও নাসক। এই ব্যবস্থা দুটিতে রাজস্ব আদায় পদ্ধতি তেমন বৈজ্ঞানিক রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রথম ব্যবস্থায় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জমিতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্ধারিত হইত এবং সেই হিসাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব ধার্য হইত। নাসক ব্যবস্থা কেবল বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল এবং

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

ইহা অনেকটা জমিদারী প্রথার অনুরূপ ছিল। আকবর টোডরমলের সাহায্যে নূতন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, যাহা 'জাবৎ' বা পূর্ববর্তী দশ বৎসরের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের ওপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল ঃ (ক) ইলহীগাজ ও 'জারিবের সাহায্যে সমগ্র জমি জরিপ, (খ) উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে জমি ভাগ করা, (গ) প্রতি জমিকে পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীতে বিভক্ত করা, (ঘ) পূর্ববর্তী দশ বৎসরে উৎপন্ন শস্যের গড় নিরূপণ করিয়া তাহার এক-তৃতীয়াংশ রাজকর হিসাবে ধার্য করা এবং (ঙ) প্রতি শস্যের বাজারদরের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন প্রকারের শস্যের উপর বিভিন্ন কর স্থাপন করা ইত্যাদি।

ফসলের এক-তৃতীয়াংশ ছিল রাজস্ব হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য। জমি আবাদ করা রাষ্ট্রের প্রতি প্রজাসাধারণের কর্তব্য বলিয়া ঘোষণা এবং সকল আবাদযোগ্য জমিতে যাহাতে ফসল বোনা হয় সেদিকে সরকারী কর্মচারীদের কড়া নজর রাখিতে বলা হইত। প্রজারা টাকা বা শস্য দ্বারা রাজস্ব দিতে পারিত। আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। তিনি রাজস্ব কর্মচারীদের এইরূপ নির্দেশ দিয়াছিলেন—কৃষকরা যাহাতে স্বেচ্ছায় আগ্রহ সহকারে কৃষিকর্ম করে, সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। জোর করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কিছু আদায় করা উচিত নয়, মনে রাখিতে হইবে যে চাষীদের জমিতে স্থায়ী অধিকার রহিয়াছে।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আকবর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করিয়াছিলেন, যথা—কাবুল, লাহোর, মূলতান, দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমীর, আহম্মদনগর, মালব, বিহার, বাঙলা, বেরার ও আহম্মদনগর। প্রত্যেক সুবায় একজন করিয়া নাজিম বা সিপাহশালার থাকিতেন। পরবর্তীকালে ইহাদের সুবাদার বলা হইত। সুবাদারকে সাহায্য করিবার জন্য দেওয়ান, সদর, আমিন প্রভৃতি কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত।

প্রাদেশিক শাসন

প্রত্যেক সুবা কয়েকটি সরকার বা জেলায় বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক সরকার আবার কয়েকটি পরগণায় বিভক্ত ছিল। সরকারের শাসনকর্তা ছিলেন ফৌজদার। সরকার বা জেলাগুলি পরগণা ও মহলে বিভক্ত ছিল। শহরের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ছিল কোতোয়াল নামক কর্মচারীর উপর। আকবরের শাসনকালে গ্রামগুলি অনেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ংশাসিত ছিল।

আকবরের শাসনকালে দুই ধরনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন জমি ছিল—যথা, খালিসা ও জায়গির। সমস্ত বিজিত ভূখণ্ড রাষ্ট্রের বলিয়া গণ্য হইত। এগুলি খালিসার অন্তর্ভুক্ত হইত। এই জমি হইতে সম্রাট 'জায়গির' ভূসম্পত্তি বিলি-বাঁটোয়ারা করিতেন। জায়গির বলিতে বুঝাইত শর্তাধীনে বিলি করা জমি। এরূপ ভূসম্পত্তি যাহারা পাইত তাহাদের জমির পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া সৈন্যবাহিনী পোষণ করিতে হইত। এই সৈন্যবাহিনী অবশ্য সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর অংশ হিসাবে গণ্য হইত। জায়গিরগুলিও ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি। প্রতিটি জায়গির হইতে যে পরিমাণ অর্থ প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করা হইত তাহা নির্ধারণ করিত রাষ্ট্র,

জায়গিরদারী ব্যবস্থা

জায়গিরদার নয়। জায়গিরদারের মৃত্যুর পর তাহার বংশধররা উত্তরাধিকারসূত্রে জায়গির পাইত না। অর্থাৎ জায়গিরদারের পদ বংশানুক্রমিক ছিল না এবং ইহা পিতা হইতে পুত্রে বর্তাইত না। আকবরের সময়ে জায়গিরদারদের একস্থান হইতে অন্যস্থানে বদলি করা হইত। ইহার দ্বারা তিনি জায়গিরদারদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন।

মনসবদার ও মনসবদারী প্রথা

আকবর জায়গির প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটাইয়া সরাসরি বেতন প্রথার প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি মনসবদারী প্রথা প্রবর্তন করিয়া জায়গিরদারী প্রথাকে কিছুটা শক্তিহীন করিয়াছিলেন। 'মনসব' কথাটির অর্থ হইল পদাধিকার বা স্থান। প্রত্যেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এক এক মনসবের অধিকারী। আইনতঃ তাহারা প্রত্যেকেই যুদ্ধের জন্য সৈন্য সরবরাহ করিতে বাধ্য ছিল। আকবরের সময়ে মনসবদারগণ ৩৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন এবং এই শ্রেণীবিভাগ সৈন্য সরবরাহের ভিত্তিতে করা হইত। সর্বনিম্ন মনসবের অধীনে ১০ জন সৈন্য এবং সর্বোচ্চ মনসবের অধীনে ১০ হাজার সৈন্য থাকিত। মনসবদারী পদও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যাইত না। এক একজন মনসবদার এক এক সময় এক এক কাজে নিযুক্ত থাকিতেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজকর্ম ও দায়িত্ব তাহাদের পালন করিতে হইত।

শাসননীতি ও বিভিন্ন সংস্কার

কেবলমাত্র রাজ্য বিস্তারের দ্বারাই যে আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা নয়। তাঁহার পূর্বেও মুসলমান সুলতানগণ রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। এমনকি আলাউদ্দিন ও মহম্মদ বিন-তুঘলকের সাম্রাজ্য এককালে আকবরের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বড় ছিল। কিন্তু তাঁহারা কেহই স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠন করিয়া যাইতে পারেন নাই। আকবর বলিয়াছিলেন যে কতকগুলি রাজ্য জয়ই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা নয়। প্রজাপুঞ্জের ভালবাসা ও সহযোগিতা ব্যতীত কোন সাম্রাজ্যই স্থায়ী হইতে পারে না। তাই আকবর সকলের প্রতি সমান ও উদার ব্যবহার করিতেন। তিনি হিন্দুদের উপর হইতে জিজিয়া কর ও তীর্থকর তুলিয়া দেন এবং তাহাদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেন। তিনি যাহা অন্যায় ও নীতিবিরোধী ও মানবতা-বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন তাহা দূর করিবার জন্য সকল রকমের ঝুঁকি লইতে প্রস্তুত ছিলেন। শত্রুকে ক্রীতদাসে পরিণত করবার যে প্রথা ছিল তাহা তিনি রদ করেন। তিনি হিন্দুদের কয়েকটি সামাজিক অনাচার দূর করার চেষ্টা করেন। তিনি সতীদাহ প্রথা বন্ধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

ফারসী, উর্দু ও হিন্দী সাহিত্যের উন্নতি

সাংস্কৃতিক জীবন। আকবরের শাসনকালে ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তিনি নিরক্ষর হইয়াও সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আনুকুল্যে রাজসভায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। ফলে ফারসী ভাষায় বহু ইতিহাস, অনুবাদ-সাহিত্য ও কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আবুল ফজল রচিত

'আইন-ই-আকবরী' এবং 'আকবরনামা' এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ। আবুল ফজল ছিলেন একাধারে ঐতিহাসিক, কবি ও সমালোচক। অন্যান্য ইতিহাস লেখকদের মধ্যে বদায়ুনী ও ফিরিস্তার নাম উল্লেখযোগ্য।

লেখকবৃন্দ ও তাঁহাদের রচনাবলী

আকবরের সময়ে মহাভারত, রামায়ণ, অথর্ববেদ, গণিতগ্রন্থ 'লীলাবতী' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। আকবরের আমলে হিন্দী ও উর্দু কাব্য-সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। রাজা বীরবল, ভগবান দাস ও মানসিংহ সুকবি ছিলেন। বীরবলের কবিপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে 'কবিপ্রিয়' উপাধি দেন। এই সময় আবদুল রহিম নামে একজন ওমরাহ ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দুতে রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখিয়া খ্যাতি পান। এই যুগে হিন্দী ভাষায় সুরদাস, নন্দদাস ভূষণ প্রমুখ কবিরা রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু গীতিকবিতা রচনা করেন। সন্ত তুলসীদাস এই সময় হিন্দীতে 'রামচরিতমানস' রচনা করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'ভক্তি-রত্নাকর' এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার সময়েই মুঘল চিত্রকলার সৃষ্টি। খেয়াল সঙ্গীত এই সময় পুষ্টিলাভ করে।

অনুবাদ সাহিত্য

আঞ্চলিক ভাষার উন্নতি

আকবর নিজে শিল্পরসিক ছিলেন। তাঁহার সময় মুঘল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিকাশের সূচনা হয়। আকবরের সময়কার শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির মধ্যে হুমায়ুনের সমাধিভবন, আগ্রার প্রাসাদদুর্গ, ফতেপুর সিক্রির সুরম্য রাজপ্রাসাদ ও সুউচ্চ সিংহদ্বার, বুলন্দ দরওয়াজা ও যোধবাইয়ের প্রাসাদ ভাস্কর্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবরই সর্বপ্রথম মার্বেল পাথরের ব্যবহার করেন। ফতেপুর সিক্রিকে অনেকে মহৎ প্রাণের প্রতিবিম্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে উন্নতি

আকবর একদিকে যেমন ছিলেন সুশাসক, অপরদিকে ছিলেন বিদ্যানুরাগী। বহু জ্ঞানীগুণী তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহার নিজস্ব একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। সাহিত্য, ধর্ম, সঙ্গীত, চারুশিল্প, লিপিশিল্প সবকিছুতেই তাঁহার সমান উৎসাহ ছিল।

শিল্পক্ষেত্রে উন্নতি

আকবরের ধর্মমত। প্রথম জীবন হইতেই আকবরের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে উদারতা ছিল। ইহার একটি প্রধান কারণ অল্প বয়স হইতেই তিনি উদার সুফীদের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। আবুল ফজল ও ফৈজীর সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মাইলে আকবর সকল ধর্মের সারতত্ত্ব জানিতে উৎসুক হন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মনে অনেক প্রশ্ন জাগে। বিভিন্ন ধর্মের মূলগত ঐক্য লক্ষ্য করিয়া তাহার সমন্বয় সাধনের চিন্তা তিনি করিতেন। কথিত আছে যে তিনি প্রত্যুষে একা বসিয়া প্রায়ই চিন্তামগ্ন থাকিতেন, ধর্মের সংঘাত তাঁহাকে পীড়া দিত। সেই সংঘাত কিভাবে দূর করা যায় তাহার জন্যই তিনি চেষ্টা করেন। তিনি ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে নূতন রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতে ইবাদৎখানা নামে একটি উপাসনা গৃহের প্রতিষ্ঠা

বিভিন্ন প্রভাব

করেন। এই উপাসনা গৃহে প্রথমে মুসলমান উলেমারা সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেন। এখানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আলোচনায় প্রচুর তর্ক-বিতর্কের স্বরূপ দেখিয়া তিনি ক্রমশঃ রক্ষণশীল ইসলাম ধর্ম হইতে কিছুটা দূরে সরিয়া যান। এই সময় শেখ মুবারক ও তাঁহার দুই পুত্র আবুল ফজল ও ফৈজী তাঁহার মধ্যে অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাইয়া তোলেন। ফলে তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহী হন। তিনি উপাসনা গৃহের দ্বার সকল ধর্মের আচার্যদের নিকট খুলিয়া দেন। তখন হিন্দু, জৈন, পার্সি, খ্রীস্টান প্রভৃতি ধর্মের আচার্যগণ আসিয়া এখানে ধর্মালোচনায় যোগ দিতেন। আকবর মনোযোগ সহকারে তাঁহাদের আলাপ-আলোচনা শুনিতেন এবং তিনি নিজেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন। ইবাদৎখানায় ধর্মালোচনা হইতে আকবর এমন সিদ্ধান্তে আসেন যে সকল ধর্মের মধ্যেই সত্য আছে এবং ভগবানকে লাভ করাই সকল ধর্মের লক্ষ্য। এই উপলব্ধি হইতে তাঁহার প্রচারিত 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছিল। ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি এই নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। ঈশ্বর এবং আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন - ইহাই ছিল তাঁহার 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্মের সারকথা। আকবর জোর করিয়া কাহারও উপর এই ধর্ম চাপাইয়া দিতে চাহেন নাই। তাহার এই ধর্মমত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপন।

ইবাদৎখানা

বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও তাহার ফল

নূতন ধর্ম দীন-ই-ইলাহী

আকবরের রাজসভা। আকবরের রুচিস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব তৎকালীন জ্ঞানীগুণীদের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্যের সভার ন্যায় আকবরের সভায় তানসেন প্রমুখ নবরত্ন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আবুল ফজল, ফৈজী, রাজা টোডরমল, রানা মানসিংহ, রাজা বীরবল, তানসেন ও রাজবাহাদুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তানসেন এবং অন্যতম প্রধান সুরশিল্পী রাজবাহাদুর সঙ্গীত শিল্পকে বিশিষ্ট স্থান দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

জ্ঞানী গুণীর সমাবেশ

ভারতের ইতিহাসে আকবর অনন্য। মহামতি অশোকই কেবলমাত্র তাহার সমপর্যায়ভুক্ত। অসাধারণ সামরিক প্রতিভা, সংগঠন শক্তি ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তাঁহার ছিল বলিয়াই তিনি পিতৃলব্ধ ক্ষুদ্র রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন বিষয়ে তিনি যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে ছিল বিরল। তিনি ভারতের নবযুগের প্রবর্তক। তাঁহার চেষ্টায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের পথ উন্মুক্ত হয়, যাহার ফলে জাতীয়তাবাদের বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। তিনি তাঁহার প্রজাপুঞ্জের প্রীতি ও শ্রদ্ধা জয় করিতে পারিয়াছিলেন। মধ্যযুগের অন্য কোন শাসকের চরিত্রে এরূপ বহুমুখী প্রতিভা ও বিভিন্ন গুণাবলীর একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় না।

মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট

জাহাঙ্গীর। ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম 'নুরউদ্দিন মহম্মদ জাহাঙ্গীর' উপাধি ধারণপূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সিংহাসনে আরোহণের পরই তিনি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কতকগুলি নিয়মকানুন প্রবর্তন করেন। প্রথমত, যাহারা তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্তিতে বাধা দিয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের ক্ষমা করেন এবং দণ্ডিত প্রজাদের মুক্তি দেন। দ্বিতীয়ত, প্রজারা যাহাতে স্বয়ং সম্রাটের নিকট তাহাদের অভিযোগ জানাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। তৃতীয়ত, তিনি সাম্রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দ্বাদশটি আইন প্রণয়ন করেন এবং ঐগুলি লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। ঐ আইনগুলি সাম্রাজ্যের সর্বত্র যাহাতে ঠিকভাবে পালন করা হয় সেদিকে নজর দেন। মুঘল সাম্রাজ্যের এই প্রথম আইন লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইল। ইহা ছাড়া তিনি কয়েকটি অন্যায় কর তুলিয়া দেন এবং অপরাধীদের অঙ্গছেদ এবং জোর করিয়া কাহারও সম্পত্তি দখলের প্রথাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

শাসন সংস্কার

আইন প্রণয়ন

জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু পাঞ্জাবে এক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জন তাঁহাকে আর্থিক সাহায্য দিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহ দমন করিয়া জাহাঙ্গীর গুরু অর্জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। ইহার ফলে মুঘল ও শিখদের মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হইয়াছিল।

শিখদের সঙ্গে বিরোধ

রাজপুতানা ও দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তারে জাহাঙ্গীর পিতা আকবরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এই কারণে প্রথমেই তিনি মেবার জয় করিবার চেষ্টা করেন। মেবারের রানা অমরসিংহ মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সেনাপতি মানসিংহ ও ইসলাম খাঁ যশোহরের অধিপতি প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া বাঙলাদেশে মুঘল আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আকবর আহম্মদনগরের কিয়দংশ মাত্র জয় করিতে পারিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র খুর্‌রম মালিক অম্বরকে পরাজিত করিয়া খাস আহম্মদনগর ও অন্যান্য কয়েকটি দুর্গ দখল করিতে সক্ষম হন। ১৬২৩ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সৈন্যদল কাঙ্গরা (নগরকোট) অধিকার করে। কিন্তু ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কান্দাহার মুঘলদের হস্তচ্যুত হয়। ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

রাজ্যবিস্তার


জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিগুলি এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল। জাহাঙ্গীর তাহাদের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রাখিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পর্তুগীজরা যখন মুঘল নৌবহর আক্রমণ করিতে শুরু করে তখন তিনি পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি ব্রিটিশ ও ডাচ বণিকদের মুঘল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করিতে অনুমতি দেন। জাহাঙ্গীরের শাসনকালেই ইংরেজ ও ওলন্দাজরা ভারতে ব্যবসা করিবার জন্য উপস্থিত হয়। তাহারা অবশ্য সমুদ্রোপকূলের অঞ্চলেই তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ রাখে নাই, দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের পক্ষে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ মুঘল দরবারে টমাস রো নামে একজন প্রতিনিধিকে পাঠান। টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে তিন বৎসর (১৬১৫-১৬১৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) ছিলেন। তিনি ইংরেজ ব্যবসায়ীদের পক্ষে নানা সুযোগ সুবিধা আদায় করিয়াছিল।

বণিকদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক

জাহাঙ্গীরের রাজ্যশাসনে তাঁহার পত্নী নূরজাহান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইতিমাদ্‌উদ্দৌলা বা মির্জা গিয়াস বেগ নামক এক পারসিক বণিকের কন্যা মেহেরুন্নিসার বিবাহ হইয়াছিল শের আফগান নামক এক ব্যক্তির সহিত। বাঙলাদেশে বর্ধমান জেলায় তিনি ছিলের জায়গিরদার। বাঙলার শাসনকর্তার সহিত তাঁহার বিরোধ দেখা দিলে জাহাঙ্গীরের আদেশে শের আফগান নিহত হন। মেহেরউন্নিসা বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে দুই বৎসর অবস্থানের পর জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করিয়া 'নূরজাহান' নাম গ্রহণ করেন এবং ভারত সাম্রাজ্ঞী-রূপে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রভূত আধিপত্য বিস্তার করেন। জাহাঙ্গীরের নামে তিনিই শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহার স্বজন-পোষণ, ষড়যন্ত্রপ্রিয়তা, অতিরিক্ত ক্ষমতালিপ্সা, সন্দেহপ্রবণতা প্রভৃতির ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং যুবরাজ শাহজাহান ও সেনাপতি মহবৎ খাঁ বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হন। তবে ব্যক্তিগতভাবে নূরজাহান ছিলেন বহু গুণের অধিকারী।

জাহাঙ্গীরের রাজ্য পরিচালনায় নূরজাহানের ভূমিকা

দোষ ও গুণের সমাবেশে জাহাঙ্গীর ছিলেন এক বিচিত্র মানুষ। একদিকে তিনি ছিলেন দয়ালু ও স্নেহপরায়ণ, আবার অন্যদিকে অতি নিষ্ঠুর। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি আকবর-অনুসৃত নীতি অনুসরণ করেন। ধর্ম সম্বন্ধে পিতার ন্যায় উদার না হইলেও তাঁহার মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। তাঁহার সাহিত্যপ্রীতি ও শিল্পানুরাগ অকৃত্রিম ছিল। ফরাসী, হিন্দী ও তুর্কী ভাষায় তাহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তুর্কী ভাষায় তাঁহার আত্মজীবনী 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' সুলিখিত আত্মজীবনী। ইতিমাদ্-উদ্দৌলা ও সেকেন্দ্রার সমাধি ভবন তাঁহার শাসন-কালের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

শাহ্জাহান। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় পুত্র খুর্‌রম 'শাহজাহান' নাম লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালের

প্রথমদিকে বুন্দেলখণ্ডের যুঝর সিং এবং দাক্ষিণাত্যের খান জাহান লোদী বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু দুইটি বিদ্রোহই সহজে দমন করা হয়। পর্তুগীজদের অত্যাচার হইতে বাঙলাকে বাঁচাইবার জন্য তিনি বাঙলার শাসনকর্তা কাশিম খাঁকে নির্দেশ দেন। তিনি পর্তুগীজদের কঠোরহস্তে দমন করেন।



শাহ্‌জাহান

পর্তুগীজদের দমন

শাহ্‌জাহানের আমলে পর্তুগীজদের অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া যায় সতের শতকে পর্তুগীজরা বাংলায় তাহাদের অবস্থানকে পাকাপোক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ধিষ্ণু শহর হুগলি এই সময় পর্যন্ত ছিল তাহাদের অধীন। তাহারা তামাকের উপর কর ধার্য করে এবং ভারতীয়দের বলপূর্বক খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে থাকে এবং নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলিতে হানা দিয়া গ্রামের বাসিন্দাদের জোর করিয়া লইয়া গিয়া বিদেশে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিতে থাকে। বাঙলার বহু জনপদ তাহাদের আক্রমণে ধ্বংসের মুখে গিয়া দাঁড়ায়।

ভারতকে বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শাহ্‌জাহানের সীমান্ত-সংক্রান্ত নীতি প্রশংসার যোগ্য। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে তিনি অহোমরাজ প্রতাপ-সিংহের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বৈদেশিক শত্রুর হাত হইতে মুঘল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য শাহ্‌জাহান কান্দাহার, বাহ্লীক বা বল্ক প্রদেশ এবং বাদাকশান প্রদেশ জয় করেন। কিন্তু এই অঞ্চলগুলিতে মুঘল আধিপত্য স্থায়ী হয় নাই। শাহ্‌জাহানের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া নীতি ব্যর্থ হইবার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক দুর্বলতা ধরা পড়ে।

দাক্ষিণাত্য নীতি

শাহ্‌জাহানের দাক্ষিণাত্য নীতির পিছনে দুইটি উদ্দেশ্য ছিল—সাম্রাজ্য প্রসারের ইচ্ছা এবং শিয়া উচ্ছেদসাধন। তাঁহার আমলে দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর রাজ্যটি সম্পূর্ণভাবে মুঘল সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহার পর তিনি বিজাপুর ও গোল-কুণ্ডার সুলতানদ্বয়কে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে আহ্বান জানান। গোলকুণ্ডার সুলতান বিনাযুদ্ধে মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করেন। বিজাপুরের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে বিজাপুরের সুলতান মুঘল বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেন।

১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে শাহ্‌জাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার পুত্রদের (দারা, সুজা, ঔরংজেব ও মুরাদ) মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহবিবাদ শুরু হয়। তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব এই গৃহবিবাদে জয়লাভ করেন। হতভাগ্য শাহ্‌জাহান কারারুদ্ধ অবস্থায় আট বৎসর কাটাইবার পর ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শাহজাহানের রাজত্বকাল ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। এ বিষয়ে তাঁহার ন্যায় অন্য কোন মুঘল সম্রাট কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ও শিল্পানুরাগী। শিল্পচর্চা ও জাঁকজমকের জন্য অর্থব্যয় করিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য তিনি করেন নাই। স্থাপত্য শিল্পের প্রতিই তাঁহার আকর্ষণ ছিল বেশি। আগ্রা ও দিল্লীতে তিনি যে সমস্ত প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহা দেখিলে আজও বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবী-বিখ্যাত তাজমহল, মতি মসজিদ, দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, রংমহল, হীরামহল, জাম-ই-মসজিদ, জুম্মা মসজিদ ইত্যাদি বহুসংখ্যক অট্টালিকা তাঁহার মার্জিত রুচি, নৈপুণ্য ও ঐশ্বর্যের পরিচয় বহন করে। দরবারে বসিবার জন্য তিনি যে ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও ছিল সৌন্দর্যে অতুলনীয়। তাঁহার রাজত্বকালে চিত্রশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। তাঁহার রাজত্বকালের সমস্ত শিল্প নিদর্শনই অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত। মুঘল শিল্প যে এই সময়েই চরম উন্নতি লাভ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শিল্প ও স্থাপত্যকীর্তি

শাহ্ জাহানের জাঁকজমক ও আড়ম্বর দেখিয়া ঐতিহাসিকগণ তাঁহার রাজত্বকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগ বলিয়া মনে করেন। এই মতের সপক্ষে তাঁহারা বলেন যে, শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা যথেষ্ট বর্ধিত হয়, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় এবং স্থাপত্য শিল্পের চরম উন্নতি দেখা যায়। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের মতে শাহ্ জাহানের রাজত্বকালের ঐশ্বর্য সমারোহ ও সমৃদ্ধির অন্তরালেই মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতনের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

শাহ্ জাহান বিলাসপ্রিয় সম্রাট ছিলেন কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি যে কর্মঠ, উদ্যমী, বুদ্ধিমান ও স্নেহপ্রবণ নরপতি ছিলেন তাহা অস্বীকার করা যায় না। শিল্প ও সাহিত্যের তিনি অনুরাগী ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি উদার ছিলেন না সত্য, তবে তাঁহার মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। তিনি ভারতকে বৈদেশিক আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কান্দাহার জয় করেন এবং মধ্য এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছিল। তবে তিনি দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিলেন। পর্তুগীজদের তিনি কঠোরহস্তে দমন করেন, আসাম অঞ্চলে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্য শাসন করিবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটে নাই। এইসব কারণে তাঁহার শাসনকালেই মুঘল সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে তাঁহার রাজত্বকালই মুঘল সাম্রাজ্যের চরম গৌরবের যুগ।

কৃতিত্ব

সিংহাসন লইয়া শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে বিবাদ। দারা, সুজা, ঔরংজেব ও মুরাদ নামে শাহ্‌জাহানের চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শিকোহ্‌ পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সম্রাটের উত্তরাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিলেন। সুজা ও ঔরংজেব যথাক্রমে বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন। কনিষ্ঠ মুরাদ ছিলেন গুজরাটের শাসনকর্তা। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে শাহ্‌জাহান অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহবিবাদ শুরু হয়। দারা ছিলেন উদার মনোভাবাপন্ন। সুজা ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয়। কনিষ্ঠ মুরাদ সরল সদাশয় হইলেও অকর্মণ্য ছিলেন। ঔরংজেব পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। কূটনীতিতে তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন বলিয়া তিনি গোঁড়া মুসলমানদের খুব প্রিয় ছিলেন।

ভ্রাতাদের গুণাবলী

শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ মৃত্যুসংবাদ হিসাবে ছড়াইয়া পড়িলে সুজা ও মুরাদ যথাক্রমে বাঙলা ও গুজরাটে নিজেদের বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ঔরংজেব দাক্ষিণাত্য পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি কৌশলে মুরাদকে নিজ দলভুক্ত করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করেন। দারা সেনাপতি জয়সিংহকে সুজার বিরুদ্ধে এবং যশোবন্ত সিংহকে ঔরংজেব ও মুরাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সুজা পরাজিত হইয়া বিহারে পলাইয়া যান। কিন্তু ধর্মাটের যুদ্ধে ঔরংজেব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনী বাদশাহী ফৌজকে পরাজিত করিল। ইহার পর বিজয়ী ঔরংজেব দারাকে সামুগড়ের যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং আগ্রা অধিকার করিয়া বৃদ্ধ সম্রাটকে কারারুদ্ধ করেন।

ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ঔরঙ্গজেবের জয়

আগ্রা হইতে ঔরংজেব দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে মুরাদকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক বন্দী করা হয় এবং পরে নরহত্যার অপরাধে তাঁহাকে হত্যা করা হয় (১৬৬১ খ্রীঃ)। ইহার পূর্বেই অবশ্য ঔরংজেব নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন।



ঔরংজেব

যুদ্ধে দারার পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া সুজা আবার ভাগ্য পরীক্ষার চেষ্টায় অগ্রসর হইলেন। কিন্তু খাজুয়ার যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। দারা পুনরায় একদল সৈন্য

লইয়া গুজরাট হইতে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু আজমীড়ের নিকট দেউরাই নামক স্থানে আবার পরাজিত হইয়া পালাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যথ হন। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে ঔরংজীব তাঁহার প্রাণদণ্ড দেন এবং দারার পুত্র সুলেমানকে অল্প অল্প বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। এইভাবে আত্মীয় নিধনে সফল হইয়া ঔরংজেব নিশ্চিন্ত হইয়া সিংহাসনে বসেন।

ঔরংজেবের সিংহাসন লাভ

সিংহাসন লাভের পর ঔরংজেবের প্রথম কাজ ছিল দুই বৎসর ভ্রাতৃযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যের যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ করা। আর যাহাতে মুঘল রাজকুমারদের মধ্যে কলহ-বিবাদ না দেখা দেয় তাহার জন্য তিনি নিহত ভ্রাতাদের ও নিজের পুত্র-কন্যাদের সহিত বিবাহের ব্যবস্থা করেন। ফলে পারিবারিক বিবাদের কিছুটা নিবৃত্তি ঘটে।

পারিবারিক বিবাদের অবসান

ঔরংজেব প্রথমেই রাজ্যবিস্তারে মন দেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য পূর্বদিকে কামরূপ ও গোয়ালপাড়া পর্যত বিস্তৃত হওয়ায় অহোম রাজাদের সহিত মুঘলদের যুদ্ধ বাধে। শাহজাহানের শাসনকালে উভয় পক্ষের সন্ধি হয়। কিন্তু শাহজাহানের পুত্রগণ যখন গৃহবিবাদে মত্ত ছিল তখন অহোমরা মুঘল শাসনকর্তাকে পরাজিত করিয়া গুয়াহাটি অধিকার করিয়া লয়। ঔরংজেব সম্রাট হইবার পর বাঙলার শাসনকর্তা মীরজাফরকে অহোমদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু এই অভিযান সফল হয় নাই। প্রবল বর্ষায় অহোমদের আক্রমণে এবং মহামারীর প্রকোপে প্রায় সমস্ত সৈন্যই প্রাণ হারায় এবং ফিরিবার পথে মীরজুমলা মারা যান। মীরজুমলার পর শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি অহোমদের অধীনে আনিবার বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু অহোমদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া সেখানে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মুঘলদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। অবশ্য আরকানীদের নিকট হইতে চট্টগ্রাম কাড়িয়া লওয়া হয়, সন্দীপ হইতে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের তাড়াইয়া দেওয়া হয়। এই দুইটি জায়গায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

অহোম রাজার সহিত যুদ্ধ

চট্টগ্রাম ও সন্দীপ দখল

ঔরংজেব ভালভাবেই জানিতেন যে বিদেশী আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিতে হইলে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সুরক্ষিত করিতে হইবে এবং এই অঞ্চলে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তিনি ইউসুফজাইদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাহারা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আটক ও হাজারা জেলা আক্রমণ করিলে তাহাদের চরমভাবে পরাজিত করা হয়। ইহার পর আফ্রিদিরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা আফগানিস্তানের মুঘল শাসনকর্তাকে পরাজিত করে। 'খাটক' নামক উপজাতিরাও আফ্রিদিদের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দেয়। ঔরংজেব বিদ্রোহী আফগানদের পরাজিত করবার জন্য দক্ষ সেনাপতির নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠান। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। ঔরংজেব এই

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি

অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্য স্বয়ং সসৈন্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে গমন করেন এবং সেখানে প্রায় দেড় বৎসর অবস্থান করেন। একদিকে তিনি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে থাকেন, অপরদিকে কূটনীতির সাহায্যে পাঠানদের মুঘল-বিরোধী ঐক্যে ফাটল



ধরাইলেন। কয়েকজন পাঠান নেতাকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন এবং বেশ কিছু সংখ্যককে অর্থ দিয়া বশীভূত করিলেন। ফলে সীমান্ত অঞ্চলের উপজাতিগুলির মধ্যে

ঐক্যের ভাব তিরোহিত হইল। একদল ঔরংজেবের বশ্যতা স্বীকার করিল, অপরদল মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে থাকিল। ফলে মুঘল সৈন্যবাহিনীর পক্ষে বিদ্রোহীদের দমন করা অসম্ভব হইয়াছিল।

ঔরংজেবের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের স্বার্থের দিক হইতে মারাত্মক হইয়াছিল। ইহা কেবল অর্থবল ও লোকবলের দিক হইতেই ক্ষতিকারক ছিল না, রাজনীতির দিক হইতেও সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। আফগান যুদ্ধের সুযোগে রাজপুতানায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। মহারাষ্ট্রে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতি শক্তি সঞ্চয় করিয়া মুঘলদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়। রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে একমাত্র আফগান সৈন্য উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ঔরংজেবের নীতির ফলে আফগানরা বাদশাহী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে চাহিল না, ফলে রাজপুতানায় মুঘলদের বিপর্যয় ঘটে।

ফলাফল

ঔরংজেবের দীর্ঘ শাসনকালকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমার্ধে (প্রায় ২৫ বৎসর তিনি উত্তর ভারতের সমস্যা লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও এই সময়েই তিনি বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁহার শাসনকালের দ্বিতীয়ার্ধ কাটিয়াছিল দাক্ষিণাত্যে। এই সময় তিনি দাক্ষিণাত্যের সমস্যা লইয়া এতই ব্যস্ত ছিলেন যে উত্তর ভারতের দিকে নজর দিতে পারেন নাই।

ঔরংজেবের রাজত্বকালের প্রথমার্ধেই বেশ কয়েকটি সমস্যা দেখা দেয়। ঔরংজেব অনবরত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন, কখনো উত্তরাঞ্চলে, কখনো পূর্ব ভারতে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে গণ-অভ্যুত্থান দেখা দেয়। এইসব অভ্যুত্থান দমনেও তিনি ব্যস্ত ছিলেন। মুঘল সৈন্যের সংখ্যাও এই সময় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু মুঘল বাহিনীর শত্রুর উপর আঘাত হানিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছিল। অবিরত যুদ্ধে যোগ দেবার ফলে বহু জায়গীরদার নিঃস্ব হইয়া পড়েন। ফলে তাঁহাদের পক্ষে সম্রাটের বাহিনীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য যোগান দেওয়া সম্ভব হইতেছিল না, এইসব সৈন্যরা ঠিক সময়ে বেতনও পাইত না। ফলে তাহাদের মধ্যে একদিকে যেমন অসন্তোষ দেখা দিল অপরদিকে বেতন না পাওয়ায় তাহারা লুঠতরাজে বেশি আগ্রহ দেখাইল। সম্রাট এদিকে নজর দিতে না পারায় জায়গীরদারী প্রথা বংশানুক্রমিক হইয়া দাঁড়াইল। পূর্বে এরূপ ছিল না। ইহার ফলে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। বাদশাহ, জায়গীরদার ও সৈন্যবাহিনী সকলেই কৃষকদের আরও শোষণ করিতে উদ্যত হইলেন। আকবরের আমলে যেখানে ভূমি-রাজস্ব ছিল উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ সেখানে ঔরংজেবের রাজত্বকালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া অর্ধেক ধার্য হইয়াছিল। ইহা আদায় করা কিন্তু সহজ হইল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাহারা হয় বিদ্রোহ করিল, নয় গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে

বিভিন্ন সমস্যা

নিয়মানুবর্তিতার অভাব

রাজকোষে অর্থাভাব ও তার প্রতিক্রিয়া

চাষ-আবাদ প্রায় বন্ধ হইয়া গেল। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থা জানা ছিল না।

কৃষক, বণিক ও কারিগণ সম্প্রদায়ের মুঘল শাসন-বিরোধী মনোভাব বিভিন্ন অভ্যুত্থানগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আগ্রা ও দিল্লী অঞ্চলের জাঠ-কৃষকরা উচ্চহারে ভূমিকর ধার্য করিবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাহাদের নেতা গোকলার নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ বিরাট আকার ধারণ করে। তবে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে জাঠদের পক্ষে বেশীদিন যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। গোকলাকে বন্দী করিয়া হত্যা করা হয়। ইহার পর ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে সৎনামী সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে। ঔরংজেব দশ হাজার মুঘল সৈন্যের এক বাহিনী পাঠাইয়া এ বিদ্রোহ দমন করেন। ইউসুফজাই, খট্টক ও আফ্রিদি উপজাতিগুলির নেতৃত্বে আফগানরা অত্যাচারী মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাহাদের দমন করিতে গিয়া বহু মুঘল বাহিনী ধ্বংস হইয়া যায়।

বিভিন্ন গণ-অভ্যুত্থান—জাঠ ও সৎনামী

উপজাতি বিদ্রোহ

শিখরাও মুঘলদের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ সংগ্রাম চালাইয়া যায়। পাঞ্জাবের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ শিখদের দলে যোগ দিয়াছিল। নবম গুরু তেগবাহাদুর এই বিদ্রোহীদের ঐক্যবদ্ধ করেন এবং আনন্দপুরে এক দুর্গ স্থাপন করিয়া তাহাদের সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তোলেন। পাঞ্জাবের কৃষক সম্প্রদায় গুরু তেগবাহাদুরের আহ্বানে সাড়া দিয়া দলে দলে মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে থাকে। ইহা পাঞ্জাবে মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

মুঘল-শিখ বিরোধ

আকবর রাজপুতদের সহিত সদ্ভাব ও মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহাদের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। ঔরংজেব আকবরের রাজপুত নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য করেন। জিজিয়া কর পুনঃস্থাপনের ফলে রাজপুত জাতি অসন্তুষ্ট হয়। এই অসন্তোষ বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে যখন ঔরংজেব মারোয়াড় রাজ্যটি কুক্ষিগত করিতে যান। মারোয়াড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ কাবুল সীমান্তে সম্রাটের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সুযোগে ঔরংজেব মারোয়াড়ের রাজধানী যোধপুর অধিকার করিয়া লন। এদিকে যশোবন্ত সিংহ মারা যাইবার দুইমাস পরে তাঁহার স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। এই ঘটনায় ঔরংজেবের উচ্চাশা সাধনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হইল। তিনি তখন মারোয়াড়ের রানীকে নবজাত কুমার সহ দিল্লীতে আসিতে নির্দেশ দিলেন। তিনি নবজাত কুমারকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার মনস্থ করিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলেন। রানীর অনুচর রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাস সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাঁহাদের লইয়া নিরাপদে যোধপুরে ফিরিয়া যান। সেখানে তিনি বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মারোয়াড় হইতে মুঘল সৈন্যদের বিতাড়িত

ঔরংজেবের রাজপুত নীতি

করেন। মারোয়াড়ের নাবালক রাজা অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবারের রাজকন্যা। তিনি মেবারের রানা রাজসিংহের সাহায্য চান। তিনি সাহায্য করিবার পূর্বেই ঔরংজেব মেবার আক্রমণ করিয়া বসেন। ঔরংজেব স্বয়ং আজমীড় হইতে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কয়েক বছর যুদ্ধ চালাইবার পর ঔরংজেব বুঝিতে পারিলেন যে রাজপুতদের সহিত তিনি পারিয়া উঠিবেন না। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মেবারের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু মারোয়াড়ের সহিত যুদ্ধ তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত চলিয়াছিল।

রাজপুত নীতির ফলাফল

রাজপুতদের সঙ্গে এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে ঔরংজেবের সম্মান ক্ষুণ্ণ হইল। রাজপুতানার ঊষর মরুতে মুঘল সাফল্যের গৌরব ম্লান হইয়া গেল। সাম্রাজ্যের সর্বত্র ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। তাহা ছাড়া যে সময়ে মারাঠা ও আফগান শক্তি দমনের জন্য রাজপুতদের সহায়তা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, সেই সময়েই ঔরংজেবের সংকীর্ণ নীতির ফলে রাজপুত জাতি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রবল শত্রুতে পরিণত হয়।

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি

ঔরংজেব তাঁহার রাজত্বকালের প্রথমার্ধ উত্তর ভারতের সমস্যা লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ কিছু কম ছিল না। ঔরংজেব তাঁহার পূর্বপুরুষদের মতই দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। তবে পূর্ববর্তী মুঘল বাদশাহদের দাক্ষিণাত্য নীতির সহিত তাঁহার দাক্ষিণাত্য নীতির কিছুটা পার্থক্য ছিল। তাঁহার দাক্ষিণাত্য নীতি রাজনীতি দ্বারা যতটা পরিচালিত হইয়াছিল ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা তাহা অপেক্ষা বেশী পরিচালিত হইয়াছিল। ধর্মান্ধ ঔরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া মুসলমানদের ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হন। আবার মারাঠাদের উত্থানে তিনি হিন্দুদের নবজাগরণের সংকেত বুঝিতে পারেন। অতএব মারাঠাদের সমূলে বিনাশ করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার দাক্ষিণাত্য নীতির পিছনে অর্থনৈতিক কারণও ছিল। উত্তর ভারত হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত তাহাতে সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয়-নির্বাহ করা সম্ভব হইতেছিল না। উত্তর ভারতের নানা স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি জঙ্গী দাক্ষিণাত্য নীতি অনুসরণ করেন। ইহার জন্য তিনি ৬৫ বৎসর বয়সে স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে গিয়া উপস্থিত হন। প্রথমদিকে তাঁহার দাক্ষিণাত্য নীতি কিছুটা সফল হয়। তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিলে তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র আকবর পারস্যে পলায়ন করে। প্রথমেই তিনি বিজাপুরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং কিছুকাল যুদ্ধের পর বিজাপুর জয় করিয়া লইলেন (১৬৮৬ খ্রীঃ)। পর বৎসর গোলকুণ্ডাও মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল (১৬৮৭ খ্রীঃ)। ইহার পর তিনি মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং এই যুদ্ধ আমৃত্যুকাল চলিয়াছিল। ঔরংজেব শত চেষ্টা করিয়াও মারাঠা শক্তি ধ্বংস করিতে পারিলেন না।

শিবাজী : মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষের সূচনা

দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে মহারাষ্ট্রীয় বা মারাঠা জাতির বাসভূমি বলিয়া এই স্থানটির নাম মহারাষ্ট্র। এই অঞ্চলটি পর্বতময়, কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত ফসল উৎপন্ন হইত না। এই কারণে মারাঠারা আত্মনির্ভরশীল, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী হইয়া উঠে।

মারাঠা জাতির নবজাগরণ

ষোড়শ শতাব্দী হইতে মারাঠাদের মধ্যে নবজাগরণ লক্ষ্য করা যায়। ভীমা নদীর তীরে পন্ধরপুর বিঠোবাজী মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে ভক্তিবাদের যে প্রবল স্রোত বহিয়াছিল, তাহাতেই সমগ্র মারাঠা দেশ প্লাবিত হয়। এই ধর্ম-আন্দোলন সমগ্র দেশের চিত্ত মথিত হইয়াছিল। এই মারাঠা সাহিত্যেও নূতন ভাবসঞ্চার ঘটে, যাহা জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম করিয়া দেয়।

শিবাজীর বাল্যজীবন

শিবাজী। পুণা জেলার অন্তর্গত শিবনের দুর্গে ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে) শিবাজীর জন্ম হয়। তাঁহার মাতার নাম জিজাবাঈ। পিতা শাহজী তাঁহার কর্মস্থল কর্ণাটে থাকিতেন। শিবাজী মাতার সহিত পুণায় বাস করিতেন। দাদাজী কোণ্ডদেও নামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। মায়ের শিক্ষার গুণেই শিবাজীর জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। অসাধারণ বুদ্ধিমতী জিজাবাঈ নানা বীরত্বের কাহিনীর মধ্য দিয়া বালক শিবাজীর মধ্যে শৌর্য, বীর্য ও ধর্মের প্রতি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শিবাজীর চরিত্র গঠনে দাদাজী কোণ্ডদেও-এর অবদান কম ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারতের হিন্দু বীর ও মহাপুরুষদের জীবনী শুনিয়া বাল্যকালেই শিবাজীর মনে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মে।



শিবাজী

শিবাজীর সামরিক অভিযান

১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দে তোরণা দুর্গ অধিকার শিবাজীর প্রথম সামরিক কীর্তি। ইহার পর তিনি একে একে রায়গড়, চাকান, ইন্দ্রাপুর, কোঙ্কণ এবং পুরন্দরপুরের দুর্গগুলি অধিকার করেন। ১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে শিবাজী কোঙ্কণ প্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করেন। শিবাজীর এই ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বিজাপুরের সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পিতা শাহজীকে বন্দী করেন এবং পুত্রের সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। কিন্তু শাহজীর মুক্তির পর শিবাজী আবার কর্মক্ষেত্রে নামিলেন। বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে দমন করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে সেনাপতি আফজল খাঁর নেতৃত্বে

একটি বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু আফজল খাঁ বিচিত্র অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাহার সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত হয়। বিজাপুরের সুলতান বাধ্য হইয়া শিবাজীর স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

শিবাজীর শক্তিতে আতঙ্কিত হইয়া ঔরংজেব ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীকে দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ দখলের পর পুনে অধিকার করিলে এক রাত্রে শিবাজী কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত শায়েস্তা খাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করেন। শায়েস্তা খাঁ কোনক্রমে আহত অবস্থায় প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হন। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে শিবাজী মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর সুরাট লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ লাভ করেন।

মুঘল শক্তির সহিত সংঘর্ষ

শিবাজীর স্পর্ধায় রুষ্ট হইয়া ঔরংজেব ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কূটকৌশলী জয়সিংহের চেষ্টায় মুঘল শক্তির সহিত মিত্রতা স্থাপনে রাজী হইলেন। পরস্পরের সন্ধি দ্বারা শিবাজী ২৩টি দুর্গ মুঘল সম্রাটকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বিজাপুরের বিরুদ্ধে ঔরংজেবকে সাহায্যের আশ্বাস দেন। ইহার বিনিময়ে শিবাজীকে বিজাপুর রাজ্যের কোন কোন অঞ্চল হইতে চৌথ আদায়ের অধিকার স্বীকার করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হয়। জয়সিংহের অনুরোধে আগ্রায় ঔরংজেবের রাজসভায় শিবাজী উপস্থিত হন, কিন্তু উপযুক্ত সম্মান না পাইয়া উষ্মা প্রকাশ করিলে ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। কিন্তু চতুর শিবাজী কৌশলে প্রহরীদের ফাঁকি দিয়া আগ্রা হইতে পলায়ন করেন।

মুঘলদের সহিত সন্ধি

শিবাজী নিজ রাজ্যে ফিরিয়া রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাকে সংগঠিত করেন। ঔরংজেব তাঁহাকে হাতে রাখার জন্য 'রাজা' উপাধি দান করেন। শিবাজী কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। পুরন্দরের সন্ধি দ্বারা শিবাজী যে-সব দুর্গ মুঘল সম্রাটকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, এইবার সেইগুলি একে একে অধিকার করিয়া লন। ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করেন। দুই বৎসর পর তিনি সুরাট হইতে 'চৌথ' আদায় করেন।

১৬৭২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শিবাজী অপ্রতিহত বেগে ক্ষমতা বিস্তার করিতে থাকেন। ঔরংজেব এই সময় রাজপুত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। এই সুযোগে শিবাজী বারবার মুঘলদের পরাজিত করেন। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে রায়গড়ে মহাসমারোহে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গো-ব্রাহ্মণ প্রজাপালক' উপাধি ধারণ করিয়া রাজ্যশাসন শুরু করেন। এই সময় জিঞ্জি, ভেলোর ও কর্ণাটক অধিকার করিয়া তাঁহার রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন। এইরূপে উত্তরে দমন হইতে দক্ষিণে সাতারা, কোলাপুর এবং পশ্চিমে কর্ণাটক, মাদ্রাজ ও মহীশূরের কতকাংশ লইয়া শিবাজীর রাজ্য বিস্তৃত হয়। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে শিবাজী দেহত্যাগ করেন।

রাজ্যাভিষেক

শিবাজীর রাজ্যশাসন পদ্ধতি। শিবাজী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলিয়া শুধু সামরিক বিষয়েই নয়, দৈনন্দিন শাসন ব্যাপারেও তাঁহার দক্ষতা ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্যসাধারণ। সমসাময়িক মুঘল সম্রাটদের ন্যায় তিনিও ছিলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা। শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার তাঁহার নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হইত। তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিবার জন্য অষ্টপ্রধান নামে পরিচিত এক মন্ত্রিসভা ছিল, তাহাতে ছিলেন পেশোয়া, অমাত্য, মন্ত্রী, সচিব, পণ্ডিতরাও, সামন্ত, সেনাপতি ও ন্যায়াধীশ। শিবাজী শাসন-ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জায়গীরদারদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করিয়া দেন। তিনি সামন্ত সমাজের দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন।

অষ্টপ্রধান

রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্য শিবাজীর রাজ্য কয়েকটি প্রান্তে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রান্ত আবার কয়েকটি পরগণা বা তরফে বিভক্ত ছিল। প্রান্তের শাসনকর্তারা আটজন কর্মচারীর সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। রাজ্যের ক্ষুদ্রতম অংশ ছিল গ্রাম। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর গ্রামের শাসন পরিচালনার ভার ছিল। শিবাজী সমস্ত জমি জরিপ করাইয়া উৎপন্ন শস্যের দুই-পঞ্চমাংশ রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রজারা নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী শস্য অথবা অর্থ দ্বারা রাজস্ব দিতে পারিত। বীজ ও গো-মহিষ ক্রয়ের জন্য কৃষকরা সরকার হইতে অগ্রিম টাকা ঋণ হিসাবে পাইত। পার্বত্য দেশ বলিয়া মহারাষ্ট্রে জমি হইতে আয় বেশি হইত না ; সেইজন্য প্রতিবেশী রাজ্য ও 'মোঘলাই' প্রদেশসমূহ হইতে শিবাজী 'চৌথ (রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ) আদায় করিতেন। ইহা ছাড়া 'সরদেশমুখী' অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের এক-দশমাংশ তিনি এই একই অঞ্চল হইতে আদায় করিতেন। এই দুইটিকে 'নিষ্কৃতি কর' বলা যায়। মারাঠা বাহিনী ঐ সকল অঞ্চলে লুণ্ঠন করিবে না বলিয়া ঐ কর দুটি আদায় করা হইত।

রাজস্ব ব্যবস্থা

সামরিক শক্তি দ্বারাই শিবাজী তাঁহার রাজ্য গড়িয়া তোলেন। সুতরাং সৈন্যদলে যাহাতে শৃঙ্খলা অটুট থাকে সেইদিকে তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার সৈন্য অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অশ্বারোহী সৈন্যদল বর্গীর ও শিলাদার এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বর্গীররা রাজ্যসরকার হইতে অস্ত্রশস্ত্র ও পোশাক পাইত, শিলাদাররা নিজেরাই অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া সৈন্যদলে যোগ দিত। তাহারা অবশ্য যুদ্ধের সময় বেতন পাইত। সমর বিভাগের দায়িত্ব সেনাপতির উপর ন্যস্ত থাকিত। তিনি অষ্টপ্রধান সভার সভ্য ছিলেন। পঁচিশজন অশ্বারোহীর দায়িত্ব থাকিত হাবিলদার, পাঁচজন হাবিলদারের উপরে জুমলাদার এবং দশজন জুমলাদারের উপর ছিল হাজারী। হাজারীর উপরে পাঁচ-হাজারী। অশ্বারোহীদের সর্বাধিনায়ক ছিল সরনোবৎ। পদাতিক বাহিনীতে সর্বনিম্নে ছিল পাইক, তারপর ছিল নায়ক, নায়কের উপরে হাবিলদার, জুমলাদার, হাজারী, সাতহাজারী এবং সর্বশেষ সরনোবৎ। শিবাজী জায়গীর প্রথা তুলিয়া দিয়া প্রত্যেক যোদ্ধাকে তাহার পদমর্যাদা অনুযায়ী বেতন দিবার ব্যবস্থা করেন। সৈন্যদের কঠোর

সামরিক ব্যবস্থা

নিয়ম শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইত। লুণ্ঠিত দ্রব্য তাহারা পাইত না। শিবাজীর সামরিক শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল তাঁহার দুর্গগুলি। তাঁহার অধীনে ২৪০টি দুর্গ ছিল। প্রত্যেকটি দুর্গের ভার তিনজন সেনাপতির উপর ন্যস্ত ছিল। শিবাজী এক শক্তিশালী নৌবহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

শিবাজীর কৃতিত্ব। ভারতের ইতিহাসে যে সকল কর্মবীর ও মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, শিবাজী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সামান্য জায়গীরদারের পুত্র হইয়া একদিকে প্রবলপরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট ঔরংজেব, অপরদিকে বিজাপুরের সুলতান এই দুই প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া তিনি যে এক বিশাল সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বিশেষ কৃতিত্ব ও গৌরবের পরিচায়ক।

মারাঠা সাম্রাজ্যের স্রষ্টা

চরিত্রের ঔদার্যে ও যুদ্ধকালে হৃদয়বত্তা মানবিকতার দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহার মত সমরনায়ক ইতিহাসে বিরল। তাঁহার মাতা এবং গুরু রামদাসের শিক্ষার গুণে শিবাজী উচ্চ আদর্শ হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। ধর্মপ্রাণ হইলেও তাঁহার মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামী ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান সাধুদের তিনি সমান শ্রদ্ধা করিতেন। দরিদ্রের ছিলেন তিনি পরম বন্ধু। তিনি উঁচুদরের রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং কূটনীতিতেও দক্ষ ছিলেন।

শিবাজী কেবল স্বাধীন রাজ্যই স্থাপন করেন নাই, তিনি মারাঠা জাতিরও স্রষ্টা। তিনি মহারাষ্ট্রবাসীর যে নূতন তেজ ও আত্মবিশ্বাস লইয়া আসেন, যে নূতন ধারার প্রবর্তন করেন তাহারই ফলে মারাঠারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে এক বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছিল।

ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির সুদূরপ্রসারী পরিণতি। ঔরংজেব তাঁহার জীবনের শেষ ২৬ বৎসর দাক্ষিণাত্যেই কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অথচ ইহাতে স্থায়ী লাভ কিছুই হয় নাই। মারাঠা শক্তিকে ধ্বংস করিতে গিয়া নিজের ও মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার নীতির ফলেই মারাঠারা ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হয় এবং মুঘল সাম্রাজ্যের ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, ঔরংজেব বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা অধিকার করেন। ইহার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা এতই বৃদ্ধি পায় যে দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্য শাসন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তৃতীয়ত, তাঁহার দাক্ষিণাত্য নীতির কার্যকর রূপ হইল বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ। অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিবার ফলে বাদশাহের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া পড়ে। দাক্ষিণাত্যের যে সব অঞ্চল তিনি জয় করিয়াছিলেন সেইসব অঞ্চল হইতে রাজস্ব বিশেষ আদায় হইত না। ইহার ফলে মুঘল সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বেতন না পাওয়া জনিত অসন্তোষ তীব্র হইল। চতুর্থত, ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতি উত্তর ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল। এই অঞ্চলে মুঘল শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। সামন্তরা মুঘল শাসনকর্তাদের নির্দেশ অমান্য করিতেও সাহসী হইল। সুতরাং তাঁহার দাক্ষিণাত্য নীতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। দাক্ষিণাত্যে ঔরংজেবের কেবলমাত্র

দেহাবসানই হয় নাই, তাঁহার ও মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবিও অস্তমিত হইল। দাক্ষিণাত্য ক্ষত তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছিল।

ঔরংজেব কর্তৃক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন। ঔরংজেব মুঘল শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় পরিণত করেন। শাসনতান্ত্রিক সমস্ত ক্ষমতা তিনি নিজের হাতে লইয়াছিলেন—উজির, দেওয়ান ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর কোন দায়িত্ব দেওয়া হইল না। তিনি রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাহারও পরামর্শ লইতেন না। ইহার কারণ হইল নিজের উপর যেমন তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, অপরদিকে তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার আদেশ কেহ অমান্য করিলে তাহাকে চরম শাস্তি দেওয়া হইত। এমনকি রাজকুমারদের ক্ষেত্রেও তিনি একই নীতি অনুসরণ করিতেন। ইহার ফল কিন্তু ভাল হয় নাই। মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং তাহারা সাধারণ কেরাণিতে পরিণত হয়। তাহাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার উদ্যম ও দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা চলিয়া যায়। ফলে শাসনব্যবস্থার গতিশীলতা নষ্ট হইয়া যায়।

বেসামরিক শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন

ঔরংজেবের রাজত্বকালে মুঘল শাসনব্যবস্থার কাঠামো পূর্বেকার মতই ছিল। এই সময় প্রদেশের (সুবা) সংখ্যা ছিল ২১। উত্তর ভারতে ২৫ বৎসর অনুপস্থিত থাকিবার ফলে উত্তর ভারতের ১৪টি সুবার শাসনব্যবস্থার প্রতি নজর দিবার মত কেহ ছিল না। ফলে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীন হইয়া গেলেন। রাজস্ব আদায়ও বন্ধ হইয়া গেল।

সামরিক বিভাগেও তিনি পরিবর্তন আনিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সৈন্যসংখ্যা খুবই বৃদ্ধি পায় কারণ তিনি অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। মনসবদারদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। শাহজাহানের আমলে সামরিক খাতে যে অর্থ ব্যয় হইত তাঁহার আমলে তাহার দ্বিগুণ ব্যয় হইতে লাগিল। ঔরংজেব খুব মিতব্যয়ী ছিলেন। সর্ববিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণ নজর ছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মুঘল সৈন্যবাহিনীতে তিনি নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তন করিতে পারেন নাই। মুঘল সৈন্যবাহিনীর নৈতিক মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। এ কারণে ঔরংজেব বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য উৎকোচ প্রদান ও ষড়যন্ত্রের উপর বেশি নির্ভর করিতে শুরু করেন।

সামরিক বিভাগের পরিবর্তন

ধর্মীয় নীতি। ঔরংজেবকে সমসাময়িক লেখকগণ 'জিন্দাপীর' বা বাদশাহের ছদ্মবেশে দরবেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ইসলাম ধর্ম তাঁহার জীবনে একটি বিরাট স্থান দখল করিয়া ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন একমাত্র ইসলাম ধর্মই সত্য, অন্যসব ধর্মই মিথ্যা। দুর্ভাগ্যবশতঃ ধর্মমতের এই গোড়ামি তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। দেশের জীবনযাত্রা কে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী

ইসলাম একমাত্র ধর্ম

ঢালিয়া সাজাইবার উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দুদের সকল অধিকার হরণ করেন এবং শিয়া মতাবলম্বী মুসলমামদের নিপীড়ন করিতে সচেষ্ট হন। প্রথমেই শিয়া মতাবলম্বীদের উৎসবগুলি নিষিদ্ধ করিয়া দেন। হিন্দুদের পক্ষে মর্যাদাসূচক কোন চিহ্ন ধারণ করা বা হাতির পিঠে চড়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ হইয়া যায়। সবচেয়ে গুরুতর বোঝাস্বরূপ ছিল অ-মুসলমানদের উপর চাপানো মাথাপিছু কর বা জিজিয়া। আকবরের উঠাইয়া দেওয়া এই করের পুনঃ-প্রবর্তন করেন ঔরংজেব ১৬৭৯ খ্রীস্টাব্দে। ইহার ফলে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়।

ধর্মীয় নীতির কার্যকর রূপ

ধর্মীয় নীতির ফল

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মনে করেন যে, ঔরংজেবের ধর্মীয় নীতি তাঁহার রাষ্ট্রনীতির ভিত্তি ছিল না। তাহা ছাড়া তিনি ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে কোন নূতন নীতি অনুসরণ করেন নাই। চিরাচরিত ইসলামীয় আদর্শের ভিত্তিতেই তাঁহার ধর্মনীতি পরিচালিত হইয়াছিল। তিনি যে ভারতবর্ষের শাসক তাহা ভুলিয়া যান নাই এবং ভারতের অধিকাংশ মানুষই হিন্দু তাহাও তিনি জানিতেন। একারণে হিন্দু নিপীড়ন নীতি তিনি পুরাপুরি কার্যকর করেন নাই। কিন্তু বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী যখন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিল তখন তিনি উগ্র উলেমা সম্প্রদায়ের উপর বেশিমাত্রায় নির্ভরশীল হইয়া পড়েন। ইহারাই তাঁহাকে সিংহাসন লাভে সাহায্য করিয়াছিল। অতএব তাহাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে গোড়াপন্থী নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার ধর্মনীতি ব্যাখ্যা করিলেও ইহা সত্য যে তাঁহার ধর্মনীতির ফলে অমুসলমানদের মধ্যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ঔরংজেবের ধর্মীয় নীতির সমর্থনে যুক্তি

চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। ঔরংজেব হইলেন তৈমুর বংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, দৃঢ়চিত্ত, অসমসাহসী ও অসাধারণ শ্রমশীল ছিলেন। তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয় ছিল। দৈনন্দিন জীবনে তিনি ইসলাম ধর্মের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। পবিত্র কোরাণ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। সাহিত্য, ইসলামীয় আইনকানুন প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। তিনি উর্দু ও তুর্কী ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। ইউরোপীয় পর্যটকরা তাঁহার চারিত্রিক গুণাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বণিকরা তাঁহাকে প্রতিভাবান সুচতুর কূটনীতিজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রবার্ট অর্মি তাঁহাকে ভারতের সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

চরিত্রের মূল্যায়ন

তাঁহার চরিত্রে দোষেরও অভাব ছিল না। ধর্ম সম্বন্ধে অনুদার মনোভাবই তাঁহার চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল। তাহা ছাড়া তিনি সন্দিগ্ধপরায়ণ ছিলেন। তিনি কাহাকেও এমনকি নিজের পুত্রদেরও বিশ্বাস করিতেন না। তিনি সাহসী যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু পরিণামদর্শী ছিলেন না। কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না।

শাসক হিসাবে মূল্যায়ন। শাসক হিসাবে ঔরংজেব ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম বিষয়ে

তাঁহার সংকীর্ণতা হেতু তাঁহার চরিত্রের সদ্‌গুণগুলি সকলে ভুলিয়া যায়। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের ন্যায় বহু ধর্ম ও জাতিভিত্তিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। সকল শ্রেণীর প্রজার সদিচ্ছা ও অনুমোদন ভিন্ন যে এরূপ রাষ্ট্র শাসন করা সম্ভব নয় তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। প্রজার সুখই রাজার সুখ তাহা বুঝিবার মত মনের প্রসারতা ও হৃদয়ের ঔদার্য ছিল না বলিয়াই শাসক হিসাবে তিনি ব্যর্থ হন। ধর্মাবেগও মনের সংকীর্ণতার জন্য তিনি লক্ষ্য করেন নাই যে সাম্রাজ্যের দিকে দিকে তাঁহার বিরুদ্ধে জনগণের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে ; রাজপুত, মারাঠা, শিখগণ মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

শাসক হিসাবে ব্যর্থ : তাহার কারণ

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির কার্যকলাপ

পর্তুগীজদের আগমন। ইউরোপে রেনেসাঁসের ফলে নানারূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহার ফলে সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করা সহজ হয়। ইউরোপের পর্তুগাল নামক দেশটির অধিবাসীগণ এ বিষয়ে অগ্রণী ছিল। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা জলপথে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কালিকটের জামোরিন উপাধিধারী হিন্দু রাজার সহিত বন্ধুত্বও স্থাপন করেন।

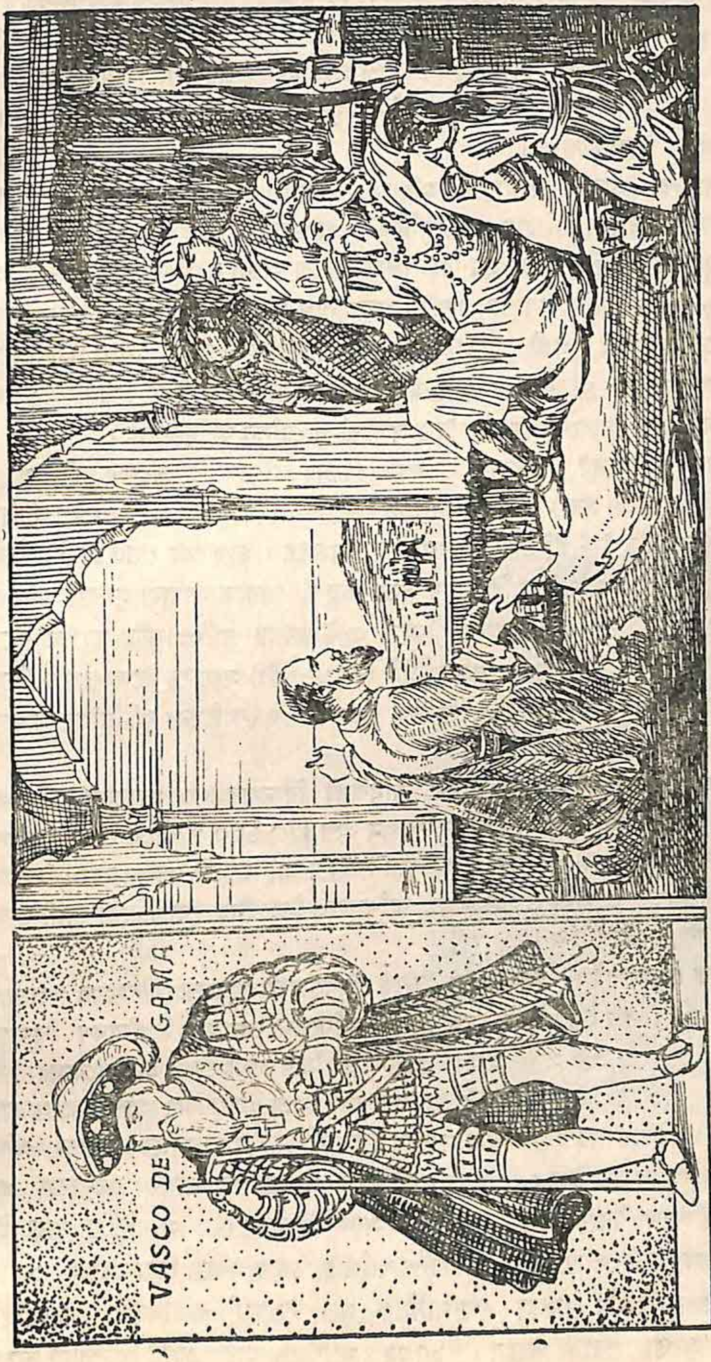
ভারতে আসিবার জলপথ আবিষ্কার

পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম ভারতের নূতন জলপথের আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাহারাই সর্বপ্রথম ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। পর্তুগীজদের আগমনের সময় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। সুলতানী শাহীর অন্তিম লগ্নে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। ফলে দক্ষিণ ভারতে পর্তুগীজদের পক্ষে নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হইয়াছিল।

বিভিন্ন স্থানে পর্তুগীজদের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন

জামোরিনের রাজ্যে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কুঠি নির্মিত হয়। কাব্রাল ছিলেন এই সময় ভারতে পর্তুগীজদের অধিনায়ক। তাঁহার সহিত জামোরিনের বিরোধ দেখা দিলে তিনি কোচিনের রাজার দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে নানা বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করেন। ইতিমধ্যে ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্তুগাল হইতে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিবার নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে আলবুকার্ক শাসন কর্তা হিসাবে ভারতে আসেন। তিনি ভারতে আসিয়াই রাজ্যজয় নীতি গ্রহণ করেন। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি গোয়া অধিকার করেন এবং পরের বছরেই মালাক্কা জয় করেন। ১৫১৫ খ্রীস্টাব্দে পারস্য উপসাগরের ওরমুজ দ্বীপ দখল করিয়া সেখানে পর্তুগীজ আধিপত্য সুদৃঢ় করেন।

পর্তুগীজদের শাসন নীতি



(বাঁদিকে) ভাস্কো-দা-গামা। (ডানদিকে) জামোরিনের দরবারে ভাস্কো-দা-গামা।

পরবর্তী পর্তুগীজ শাসনকর্তাদের আমলে পর্তুগীজরা কাথিয়াওবাড় উপকূলস্থ দিউ হইতে শুরু করিয়া বাংলার হুগলী, চট্টগ্রাম পর্যন্ত অনেকগুলি বন্দর দখল করিয়াছিল। এগুলির মধ্যে সুরাট, দমন, বেসিন, সালসেট, বোম্বাই, গোয়া, কোচিন, কুইলন, নেগাপত্তম, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম, সন্দীপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন অধিকৃত অঞ্চল

পর্তুগীজরা ভারতে তাহাদের অধিকৃত স্থানগুলি একশত বৎসরের অধিক সময় ধরিয়া নিজেদের দখলে রাখিতে পারিয়াছিল। প্রথমদিকে ভারতে পর্তুগীজ শক্তিকে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্মুখীন হইতে হয় নাই, কারণ গোয়া অঞ্চল মুঘল শক্তির আওতায় ছিল না। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় পর্তুগীজদের সঙ্গে মুঘল শক্তির সংঘর্ষ বাধে। সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে যুগলী হইতে তাহাদের বিতাড়িত করা হয়। ঔরংজেবের রাজত্বকালে শায়েস্তা খাঁ তাহাদের চট্টগ্রাম ও সন্দীপ হইতে বিতাড়িত করেন। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা তাহাদের নিকট হইতে সলসেট ও বেসিন কাড়িয়া লয়।

ওলন্দাজ কোম্পানী। ওলন্দাজ বণিকগণ প্রাচ্যের বাণিজ্যে (হল্যাণ্ডের অধিবাসীদের ডাচ বা ওলন্দাজ বলা হয়) অংশগ্রহণের জন্য তৎপর হইয়া উঠে। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপন করে। হল্যাণ্ডের ছোট ছোট বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার সভ্য ছিল। ভারতে তাহারা গুজরাট, করমণ্ডল উপকূল, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। সুরাটের বাণিজ্যকুঠিটি (১৭১৬ খ্রীঃ) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল। ইহা ছাড়া চঁচুড়া, কাশিমবাজার, পাটনা, নেগাপট্টম ও কোচিনের কুঠিগুলির মাধ্যমেও ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত।

ভারতে ওলন্দাজ বাণিজ্যকেন্দ্র

দিনেমার কোম্পানী। ডেনমার্কের অধিবাসী দিনেমারগণও ভারতের বাণিজ্যের অংশীদার হইবার জন্য একটি কোম্পানী স্থাপন করে। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঞ্জোর জেলার ট্রাঙ্কোবারে এবং ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে তাহারা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। দিনেমার ছাড়া বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া ও সুইডেনের বণিকরাও নিজ নিজ দেশে কোম্পানী স্থাপন করিয়া ভারতে আসিয়াছিল।

ইংরেজ কোম্পানী। ইংল্যাণ্ডের নিকট স্পেনের অপরাজেয় নৌবহরের পরাজয়ের (১৫৮৮ খ্রীঃ) পরে ইংরেজদের নিকট ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও উপনিবেশ বিস্তারের পথ সুগম হয়। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাণী প্রথম এলিজাবেথের নিকট হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাচ্যে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। ইহার পর ইংল্যাণ্ডের সরকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ক্রমান্বয়ে অধিক ক্ষমতা মঞ্জুর করিয়াছিল। ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের শাসক ক্রমওয়েল এবং ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় চার্লস যে সনদ দিয়াছিলেন সে দুইটির দ্বারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা লাভ করে। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় জেমস কোম্পানীকে মুদ্রা তৈয়ারী ও নিজস্ব সৈন্যবাহিনী রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি কোম্পানী ভারতে

উৎপত্তি ও বিকাশ

বাণিজ্য করিবার জন্য গঠিত হয়। এই দুইটি কোম্পানীর সহিত স্বার্থ সংঘাত দেখা দিলে ইংল্যাণ্ডের সরকার এই বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছিল। ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে পার্লামেণ্টে একটি আইনের মাধ্যমে এই দুইটি কোম্পানীর মিলন ঘটিয়াছিল। এইভাবে শক্তিশালী **ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর** উদ্ভব ঘটে। ফলে ভারতে কোম্পানীর কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স সুরাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে সুরাটে চারিটি কারখানা স্থাপন করিবার অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু পর্তুগীজদের ষড়যন্ত্রে এই অনুমতি নাকচ করা হয়। ইতিমধ্যে ইংরেজ ক্যাপ্টেন বেস্ট সুরাটের নিকট পর্তুগীজ নৌবাহিনীকে পরাজিত করেন। ফলে ইংরেজদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সম্রাট জাহাঙ্গীর বিলম্ব না করিয়া ইংরেজদের কারখানা স্থাপন করিবার অনুমতি দেন। এই প্রাথমিক সফলতাকে কার্যকর করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমস ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে স্যার টমাস রো-কে জাহাঙ্গীরের রাজসভায় ইংরেজ দূত হিসাবে পাঠান।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি ও কারখানা স্থাপন



স্যার টমাস রো

ইহার পর সুরাটের গুরুত্ব বাড়িতে থাকে। ব্রোচ, আমেদাবাদ ও আগ্রার কুঠিগুলি সুরাট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইত। ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা পর্তুগীজদের পরাজিত করিয়া ওরমুজ অধিকার করে। ফলে পারস্য উপসাগরে ইংরেজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। ১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সিস ডে চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে মাদ্রাজে সুরক্ষিত কারখানা স্থাপন করিবার অনুমতি লাভ করেন। ইহাই সেণ্ট জন দুর্গ হিসাবে খ্যাতিলাভ করে। ক্রমে করমণ্ডল উপকূলে মাদ্রাজের গুরুত্ব বাড়িতে থাকে। মাদ্রাজ একটি প্রেসিডেন্সিতে পরিণত হয়। মাদ্রাজের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিও ইংরেজরা ক্রয় করিয়া লয়।

সুরাট

মাদ্রাজ

বাংলায় বাণিজ্য করিতে আসিয়া প্রথমদিকে ইংরেজরা পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই তাহারা সফলতা অর্জন করে। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে হুগলীতে ও পরে কাশিমবাজার ও পাটনায় ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী মাদ্র

বাংলা

১০ পাউণ্ড খাজনায় ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের নিকট হইতে বোম্বাইয়ের ইজারা লাভ করে। কিছুদিনের মধ্যেই বোম্বাইয়ের সমৃদ্ধি ও জনসংখ্যা বাড়িতে থাকে। ফলে বোম্বাইয়ের শ্রীবৃদ্ধিতে সুরাটের পূর্বগৌরব ম্লান হইয়া যায়।

ইতিমধ্যে সম্রাট ঔরংজেব কোম্পানীর ঔদ্ধত্যে রুষ্ট হন। তিনি ইংরেজ কোম্পানীকে ন্যায়সঙ্গত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহার জন্য কোম্পানীকে বাৎসরিক নির্দিষ্ট শুল্ক দিতে হইত। কিন্তু বাদশাহের নির্দেশনামার অপব্যাখ্যা করিয়া ইংরেজরা ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাইত এবং শুল্ক ফাঁকি দিত। বাদশাহ ইহা বন্ধ করিবার জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেন। ইংরেজরা পরাজিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বাদশাহের নিকট নতি স্বীকার করে। ঔরংজেব তাহাদের মার্জনা করিয়া পুনরায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ দেন।

ফরাসী কোম্পানী। বাণিজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ভারতে সবচেয়ে শেষে আসে ফরাসীরা। ফরাসী কূটনৈতিক কোলবার্টের উদ্যোগে ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। এই কোম্পানীকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই সুরাট ও মসলিপত্তমে ফরাসীদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ভারতে ওলন্দাজদের বিরোধিতায় তাহাদের প্রাথমিক বিপর্যয় ঘটিলেও শেষ পর্যন্ত ফাঁসোয়া মার্ত্যাঁর নেতৃত্বে পণ্ডিচেরী অধিকার করিবার পরই ফরাসীদের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী ক্রমশঃ সুপ্রসন্ন হইতে থাকেন। ক্রমশঃ তাহারা কালিকট, মাহে, কারিকল এবং চন্দননগরে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ইংরেজদের তুলনায় ফরাসী কোম্পানীর ব্যবসার পরিমাণ অনেক কম ছিল। ফরাসী কোম্পানীর কোন শক্তিশালী নৌবহর ছিল না।

পণ্ডিচেরী ও চন্দননগর

সপ্তম অধ্যায় | মুঘল শাসনে ভারত

মুঘল যুগকে ভারতের ইতিহাসে গৌরবময় যুগ বলিয়া মনে করা হয়। ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে এই যুগের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত, সুলতানী শাসনের পতনের পর উত্তর ভারতে যে সব ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল সেগুলির অবলুপ্তি ঘটাইয়া মুঘল সম্রাটগণ প্রথমে উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং পরে দক্ষিণ ভারতেও ইহার প্রসার ঘটান। অর্থাৎ মুঘল সম্রাটগণ ভারতে একটি সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত, মুঘল যুগে নূতন শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়। এই শাসনব্যবস্থা মোটামুটি ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত ছিল। মুঘল সম্রাটগণ কেহই তাঁহাদের সাম্রাজ্যকে বৃহত্তর ইসলামিক সাম্রাজ্যের অংশ বা নিজেদের খলিফার অনুগত শাসক হিসাবে গণ্য করেন নাই। মুঘল সাম্রাজ্য ছিল সার্বভৌম রাষ্ট্র। সামাজিক ক্ষেত্রে

মুঘল শাসনের গুরুত্ব

রাজনৈতিক ঐক্য

মুঘল যুগে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইতে থাকে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় এক গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মুঘল সম্রাটদের মুদ্রানীতিও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করিয়াছিল। রৌপ্যমুদ্রার বহুল প্রচলন ঘটে। রাস্তাঘাটের উন্নয়নের ফলে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়। ইহা নগর জীবনের উন্নয়ন ব্যবসা-বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের প্রসারে সাহায্য করিয়াছিল।

মুঘল শাসনকালে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। প্রায় দুইশত বৎসর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুস্থিতি থাকিবার ফলে এক কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা গড়িয়া ওঠে।

কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা

শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ ছিলেন সম্রাট স্বয়ং, তিনি একধারে ছিলেন শাসক, প্রধান বিচারক ও সামরিক বিভাগের সর্বময় কর্তা। তিনি স্বেচ্ছাচারী হইলেও দায়িত্বহীনভাবে দেশ শাসন করিতেন না। সভাসদদের পরামর্শ তাঁহারা গ্রহণ করিতেন। তবে সভাসদগণ কখনই রাজ্যের সর্বেসর্বা হইতে পারিত না। শাসনকার্যে সুবিধার জন্য বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। প্রধানমন্ত্রী, উজির, দেওয়ান, মীর-বক্সী, মীর-সামান, সদর-উল-সদর, কাজী-উল-কাজাৎ উল্লেখযোগ্য ছিল। দেওয়ান রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন। সাম্রাজ্যের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিত। মীর-বক্সী ছিলেন সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী। ইহা ছাড়া বহু কর্মচারী নিযুক্ত করা হইত। ইহাদের নিজস্ব ক্ষমতা বলিয়া কিছু ছিল না। সম্রাটের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি মন্ত্রী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মধ্যে ক্ষমতা বা দায়িত্ব এমনভাবে ভাগ করিয়া দিতেন কাহারও পক্ষে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া অসম্ভব ছিল।

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য মুঘল সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশ বা সুবায় বিভক্ত ছিল। এ সমস্ত সুবার শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় শাসনের অনুরূপ ছিল। প্রদেশগুলির শাসনকর্তা

ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিবার নীতি

সুবাদার ছিলেন সম্রাটের প্রতিনিধি। তিনি সম্রাটের পক্ষ হইতে প্রদেশের সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রতিটি প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের এবং আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন, তিনি 'দেওয়ান' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি সরাসরি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং সুবাদারের অধীনতা হইতে মুক্ত ছিলেন। দেওয়ান ও সুবাদারের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করিয়া দিয়া এবং তাহাদিগকে ঘন ঘন বদলির ব্যবস্থা করিয়া সম্রাট প্রদেশগুলির উপর নিজ আধিপত্য বজায় রাখিতেন।

জায়গীরদারী ব্যবস্থ। যে সব মনসবদার নগদে বেতন লইতেন তাহাদের বলা হইত নকদী এবং যাহারা জায়গীর হইতে বেতন গ্রহণ করিতেন তাহাদের বলা হইত

জায়গীরদারী প্রথা

জায়গিরদার। সাম্রাজ্যের এক বিরাট অঞ্চল জায়গীর হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। জায়গিরদারদের নিজ ব্যয়ে একটি নির্দিষ্ট সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রাখিতে হইত এবং প্রয়োজনমত সম্রাটকে সাহায্য করিতে হইত। জায়গিরদারদের পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। সম্রাট অবশ্য ইচ্ছা করিলে পুত্রকে

পিতার অবর্তমানে জায়গির দিতে পারিতেন। জায়গীরদারদের মধ্যে কায়েমী স্বার্থ যাহাতে না দেখা দিতে পারে তাহার জন্য তাহাদের বদলি করিবার ব্যবস্থা ছিল। ভূমির উপর কোন অধিকার বা ভৌমিক পদমর্যাদার দাবী জায়গিরদাররা করিতে পারিতেন না। তাহারা কর্মচারীদের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতেন। জায়গীর অবশ্য সবসময়ে ভূমি-রাজস্বের মধ্যেই সীমিত ছিল না। শুল্ক আদায় ও নির্ধারণ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব জায়গীরদারগণ ছিলেন সম্পূর্ণভাবে রাজকর্মচারী। সম্রাটের উপর তাঁহারা সর্বদিক দিয়া নির্ভরশীল ছিলেন। জায়গিরদারদের অধীনে যে সব কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত তাহারাও সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইত।

জায়গিরদারদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা। মুঘল যুগে প্রধানতঃ তিনরকমের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যথা—গাল্পা-বক্সী, নাসক ও জাবাৎ। প্রথম দুইটি ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল এবং এই বাবস্থাগুলির রাজস্ব আদায় পদ্ধতি তেমন নির্দিষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। প্রথম ব্যবস্থায় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া জমিতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ নির্ধারিত হইত এবং সেই হিসাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব ধার্য হইত। নাসক ব্যবস্থা ছিল অনেকটা জমিদারী প্রথার মত। আকবর টোডরমলের সাহায্যে নূতন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন যাহা জাবাৎ বা পূর্ববর্তী দশ বৎসরের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল (ক) ইলাহীগজ বা 'জারিবে'র সাহায্যে সমস্ত জমি জরিপ, (খ) উৎপাদিকা শক্তি হিসাবে জমি ভাগ করা, (গ) প্রতি জমিকে পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীতে বিভক্ত করা, (ঘ) পূর্ববর্তী দশ বৎসরে উৎপন্ন শস্যের গড় নিরূপণ করিয়া তাহার এক-তৃতীয়াংশ রাজকররূপে ধার্য করা, এবং (ঙ) প্রতি শস্যের বাজারদরের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন প্রকারের শস্যের উপর বিভিন্ন হারে কর স্থাপন করা ইত্যাদি। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব ব্যাপারে প্রজাদের সহিত সম্রাটের প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয় এবং সেইহেতু এই ব্যবস্থাকে 'রায়তওয়ারী ব্যবস্থা' বলা যায়। মুর্শিদকুলি খাঁ দাক্ষিণাত্যে এই ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তাঁহার প্রবর্তিত 'বাটাই' ব্যবস্থায় উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ লওয়া হইত।

তিন রকমের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা

জাবাতি ব্যবস্থা

মুঘল যুগে সমাজজীবন। মুঘল যুগে সমাজ ও শাসক শ্রেণীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পর্যটক ও ব্যবসায়ীরা অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সমাজ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—বাদশাহ-আমীর-ওমরাহদের লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল শাসক তথা অভিজাত শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী লইয়া দ্বিতীয় শ্রেণী এবং কৃষক ও গরীব জনসাধারণ ছিল তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে জীবনযাত্রার মানের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহগণ আলস্যে, বিলাস-ব্যসনে মদ্যপানে এবং ব্যভিচারে মগ্ন থাকিতেন।

তিনটি শ্রেণী

ভূষণ। তাহাদের আহারে, আসবাবপত্রের বাহারে এবং পোষাক-পরিচ্ছেদে অতিরিক্ত বিলাসিতা দেখা যাইত। বিলাসিতায় অর্থ ব্যয় করাকেই একমাত্র কাম্য বলিয়া শাসকশ্রেণী মনে করিত। তাহারা যে বেতন পাইত তখনকার দিনে তাহা অচিন্ত্যনীয় ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র বেতনে তাহাদের চাহিদা পূরণ হইত না বলিয়া তাহাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যবসা-বাণিজ্য ও পণ্যদ্রব্য তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করিত। অভিজাতদের প্রাসাদোপম বাড়ি থাকিত। মনসরেট ও বার্ণিয়ে এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ লিখিয়াছেন।

অভিজাতদের বিলাস-বহুল জীবনযাত্রা

গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের পরই শাসকশ্রেণী আহার-বিহারে বা পান-ভোজনে অর্থ ব্যয় করিত। তাহাদের দ্বিপ্রাহরিক আহারে কম করিয়া ১০০ রকমের ভোগ্যবস্তু থাকিত। উচ্চমানের খাদ্যের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ ছিল বেশি। বাড়ির কাজে অসংখ্য লোক নিয়োগ করা হইত। ইহাদের বেতন ছিল খুবই কম। অভিজাতদের মধ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মহামূল্য অলঙ্কার ধারণ করিত।

বার্ণিয়ে লিখিয়াছেন যে অভিজাতদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ঋণগ্রস্ত। কারণ তাঁহারা বিলাসিতায় এত ব্যয় করিতেন যে তাহাদের ঋণ করিতে হইত। পুত্রকন্যার বিবাহে অভিজাতরা সাধ্যাতীত খরচ করিতেন। ঔরংজেব সরল জীবন যাপন করিতেন, কিন্তু কোন অভিজাতই এ বিষয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের গরিমা নষ্ট হইয়া যায়, তখনও কিন্তু অভিজাতদের জীবনযাত্রায় বিলাসিতা পূর্ণমাত্রায় ছিল। দেশের অর্থনীতির উপর অভিজাতদের জীবনযাত্রার প্রভাব পড়িয়াছিল। অভিজাতদের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক অবস্থা। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ ও বিভিন্ন বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ হইতে মুঘল আমলের অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। সে যুগে কৃষিকর্মের উপর ভিত্তি করিয়া মূল অর্থনৈতিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছিল। হস্তশিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি ঘটে। উন্নতির কারণ হইল শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। তুলা, নীল, তামাক প্রভৃতি কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। জায়গীরদার ও জমিদার কৃষিপণ্যের অধিক উৎপাদনের দিকে নজর রাখিতেন। ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পদ্রব্য তৈয়ারি ও কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুঘল যুগে উন্নতি ঘটিয়াছিল।

কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি

সমগ্র দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা মোটামুটি বজায় ছিল বলিয়া শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়াছিল। শ্রমশিল্পের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারী তত্ত্বাবধানে কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। এইসব কলকারখানায় নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে তৈরী হইত। কার্পাস শিল্পই এ যুগের সবচেয়ে বৃহৎ শিল্প

ছিল। শিল্পজাত দ্রব্য দেশবাসীর চাহিদা মিটাইয়া প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। গুজরাট, বুরহানপুর, জৌনপুর, পাটনা হইতে উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ পর্যন্ত বস্ত্র উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি বিস্তৃত ছিল। উড়িষ্যা হইতে পূর্ব বঙ্গ পর্যন্ত যাইবার সময় মনে হইত যে গোটা দেশটাই বস্ত্র উৎপাদনের স্থান। অন্যান্য অঞ্চলের অপেক্ষা বাংলাদেশেই বেশি বস্ত্র উৎপাদিত হইত। ঢাকার মসলিন ইউরোপের সকল দেশেই অতিশয় সমাদর লাভ করিয়াছিল।

সরকারী তত্ত্বাবধানে শ্রমশিল্পের প্রসার

এই যুগে মানুষের মজুরি খুবই কম ছিল। দক্ষ মজুররা তখনকার দিনে দৈনিক মজুরি পাইত তিন আনা বা ২০ পয়সার মত। তাহাদের জীবনে বিড়ম্বনাও কম ছিল না। সরকারী কর্মচারী আর অভিজাতদের দল অনেক সময় তাহাদের উপর অত্যাচার করিত। মুঘল আমলে আর্থিক অবস্থার অসম বণ্টন লক্ষ্য করা যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য বেশ কয়েকটি প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হইয়াছিল। রাজপথ ও নৌপথ উভয় পথেই ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও স্থল ও জল উভয় পথই ব্যবহৃত হইত। লাহোর হইতে কাবুল এবং মুলতান হইতে কান্দাহার পর্যন্ত দুইটি রাজপথের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। তবে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই আমদানি-রপ্তানি বেশি ছিল। সুরাট, ব্রোচ, বেসিন, গোয়া, কালিকট, কোচিন, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর ছিল। তবে সুরাট ছিল মুঘল যুগে সবচেয়ে বড় বন্দর। এখান হইতে বাণিজ্য-জাহাজগুলি পণ্যদ্রব্যে ভর্তি হইয়া পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরের বন্দরগুলিতে যাইত। রাজঘাটে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বড় বড় বণিকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল।

ব্যবসা-বণিজ্যের উন্নতি

বাণিজ্যিক ক্ষেত্র

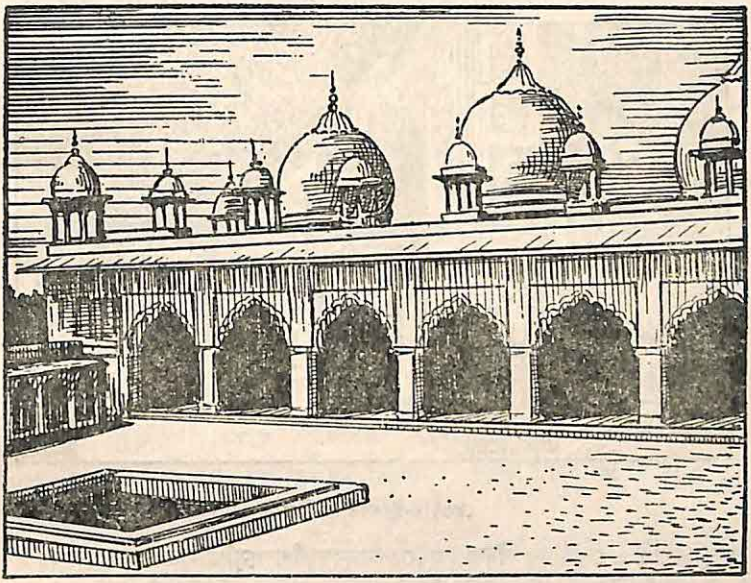
সুরাট ইংরেজ ও ওলন্দাজদের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুঘল যুগেই ইউরোপীয় বণিকরা সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে ভারতীয় বণিকদের ক্রমশঃ উৎখাত করে এবং সম্রাটের নিকট হইতে সুযোগ-সুবিধা আদায় করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটায়। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কেবল বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে নাই, এই কুঠিগুলিকে কেন্দ্র করিয়া কারখানাও স্থাপন করিয়াছিল। ভারতীয় কারিগর ও শিল্পী এইসব অঞ্চলে আসিয়া বসবাস শুরু করে। এই অঞ্চলগুলি পরে বড় বড় শহরে পরিণত হয়। এইভাবে মাদ্রাজ, কলিকাতা ও বোম্বাই শহর গড়িয়া উঠে।

ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ছিল ভারতের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু এই ব্যবসা হইতে যে অর্থসম্পদ পাওয়া যাইত তাহা কারিগরদের হাতে পৌঁছাইত না। দালাল শ্রেণীর লোকেরাই ইহা ভোগ করিত।

সাংস্কৃতিক জীবন। মুঘল যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি নানাভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছিল। শিল্প ও সাহিত্যে এ যুগে প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি সুলতানী যুগের শিল্পরীতির মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান রীতির যে সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় মুঘল যুগে তাহার সুষম সমন্বয় ঘটে। হিন্দু ও মুসলমান শিল্পধারার বিকাশ ও সংমিশ্রণে এক শিল্পরীতির উদ্ভব ঘটে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি



মোতি মসজিদ। আগ্রা

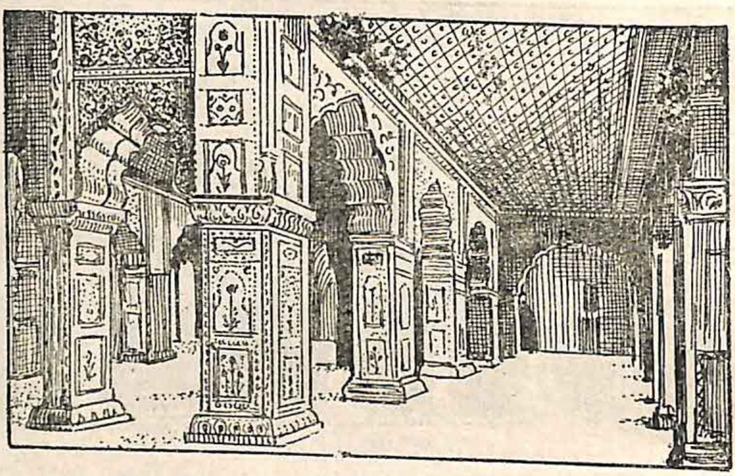
আকবর নিজে ছিলেন শিল্পরসিক। তাঁহার সময় মুঘল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যে মহিমময় বিকাশের সূচনা হয় তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে শাহজাহানের অনন্যসুন্দর হর্ম্যাবলীতে। আকবরের সময়কার শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির মধ্যে হুমায়ুনের সমাধি ভবন, আগ্রার প্রাসাদ দুর্গ, ফতেপুর সিক্রির সুরম্য রাজপ্রাসাদ ও সুউচ্চ সিংহদ্বার, বুলন্দ দরওয়াজা। বুলন্দ দরওয়াজা ও যোধবাঈয়ের প্রাসাদ ভাস্কর্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে আকবরই মার্বেল পাথরের ব্যবহার শুরু করেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্প: আকবরের রাজত্বকালে

জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত সৌধাবলীর মধ্যে সিকন্দ্রায় আকবরের সমাধিভবন এবং আগ্রায় নূরজাহানের পিতা ইতিমদ্দৌলার সমাধি ভবন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটিতে বৌদ্ধবিহারের গঠনভঙ্গীর ছাপ দেখা যায়, দ্বিতীয়টিতে হিন্দু প্রভাব সুস্পষ্ট। শাহজাহানের শাসনকালে মুঘল স্থাপত্য শিল্প উন্নতির চরমে পৌঁছায়। তাঁহার নির্মিত প্রাসাদগুলির স্থাপত্যরীতিতে

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে

পারসিক রীতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তবে এগুলির সূক্ষ্ম অলংকরণ রীতিতে হিন্দু প্রভাব রহিয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালে আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাবুল প্রভৃতি স্থানে বহু সুদৃশ্য প্রাসাদ, মসজিদ ও উদ্যান নির্মিত হইয়াছিল। দিল্লীর লালকেল্লায় শাহজাহানের দেওয়ান-ই-আম্, দেওয়ান-ই খাস, মুঘল স্থাপত্য শিল্পের অনুপম নিদর্শন। দিল্লীর জুম্মা মসজিদে পরিসর, ঋজুতা ও লালিত্যের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। লাহোরে জাহাঙ্গীরের সমাধি ভবনটিও একটি সার্থক শিল্পসৃষ্টি। আগ্রার মোতি মসজিদ



দেওয়ান-ই খাস। দিল্লী

মার্জিত রুচিবোধ ও সৌষ্ঠবের দিক হইতে অনবদ্য শিল্পসৃষ্টি। শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল তাজমহল। প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ বেগমের স্মৃতিরক্ষার জন্য তিনি এই মর্মরসৌধ নির্মাণ করেন। তাজমহল বিশ্বের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম বিস্ময়। ঔরংজেবের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্যের গৌরব ম্লান হইয়া আসে

বিভিন্ন প্রদেশে

মুঘল যুগে দক্ষিণ ভারতের শিল্পকীর্তিও রহিয়াছে। বিজাপুরের সুলতানের আনুকূল্যে স্থাপত্য শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটে। চাঁদ সুলতানার সমাধি মন্দির তাজমহলের সহিত তুলনীয়। এই যুগে হিন্দু স্থাপত্যের মধ্যে মথুরায় কেশবদেবের মন্দির ও বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর মন্দির হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যের মিলিত সুষমায় মণ্ডিত হইয়াছিল। মুঘল যুগে বাংলাদেশে প্রচলিত স্থাপত্যশৈলী খুব উন্নতি লাভ করে নাই। কিছু কিছু মন্দির ও বাড়িঘর কারুকার্যখচিত হইত এবং পোড়ামাটির টালির আস্তরণ দেওয়া হইত।

চিত্রশিল্প। চিত্রশিল্পে মুঘল যুগ এক অপূর্ব উৎকর্ষের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। এই সময়ে ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় প্রভাবের এক অপূর্ব নির্দর্শন চিত্রশিল্পে দেখা যায়। প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু ছিলেন। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান এবং বহু রাজপুত নৃপতি চিত্রশিল্পের অনুরাগী ছিলেন।

প্রতিকৃতি অঙ্কনে ও গ্রন্থ অলঙ্করণে মুঘল যুগের শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। এ যুগের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে বিষণদাস, জগন্নাথ, কেশব, মাধব, ওস্তাদ মনসুর, আবদুল সামাদ, ফরুক বেগ, জামসেদ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুঘল চিত্রশিল্পীদের প্রধান বিষয়বস্তু ছিল রাজ-দরবার, রাজপ্রাসাদের দৃশ্য ও মৃগয়া। বন্যজন্তু এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রও আঁকা হইয়াছিল। অর্থাৎ চিত্রশিল্পীদের চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি ছিল বস্তুনিষ্ঠ।

চিত্রশিল্পের স্বরূপ

ঔরংজেব চিত্রাঙ্কন সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। শোনা যায় আকবরের সময়ে অঙ্কিত অনেক ছবির উপর তিনি চুনকাম করিয়া দেন। তাঁহার শাসনকালে শিল্পীরা দিল্লী ছাড়িয়া বিভিন্ন প্রদেশে চলিয়া যান এবং সেখানকার প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উৎসাহ ও আনুকূল্য লাভ করেন। অনেকের মতে মুঘল চিত্রকলার নূতন উন্মেষ প্রকাশ পায় রাজপুত ও কাংড়া চিত্রশৈলীর মধ্যে। অবশ্য রাজপুত চিত্রশিল্পে ভাব ও আদর্শের অভিব্যক্তি মুঘল চিত্রশিল্পের তুলনায় ব্যাপকতর। প্রধানত রাধা-কৃষ্ণের লীলা ও পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নানা রাজপুত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের প্রতিক্রিয়া

রাজপুত ও কাংড়া চিত্র শিল্প

সঙ্গীত। একমাত্র ঔরংজেব ছাড়া মুঘল সম্রাটগণ সকলেই সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন। আকবরের সঙ্গীত-প্রীতিও ছিল সর্বজনবিদিত। দেশ-বিদেশ হইতে সঙ্গীতজ্ঞগণ তাঁহার দরবারে আমন্ত্রিত হইতেন। তানসের ছিলেন দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক। জাহাঙ্গীরও সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে বহু হিন্দী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। শাহজাহান নিজে সুগায়ক ছিলেন।

মুঘল যুগে বিভিন্ন প্রদেশে লোকগীতিগুলি খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। ইহার ফলে লোকসঙ্গীতের উন্নতি ঘটে। ভক্ত কবিরা মধুর সুরে গাহিয়া বেড়াইতেন। এইসব গানের অনেকগুলি এখনও লোকগীতি হিসাবে টিকিয়া আছে। আকবরের শাসনকাল হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ ভক্তিবাদী কবিদের মধ্যে ছিলেন তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ, একনাথ, শঙ্করদেব এবং গুরু গোবিন্দ।

ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস। অধিকাংশ মুঘল শাসকদের সাহিত্যপ্রীতি দেখা যায়। তাঁহারা অনেকেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অসংখ্য ফারসী, উর্দু, হিন্দীও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাভাষী সাহিত্যিক তাঁহাদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। আবুল ফজল, ফৈজী, হোসেন নাজিরী, বীরবল প্রভৃতি হইলেন যুগের উল্লেখযোগ্য কবি। এই সময় আবদুর রহিম নামে একজন ওমরাহ ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দু ও উর্দু ভাষায় রসোত্তীর্ণ কবিতা লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। আকবরের সময় মহাভারত, রামায়ণ, অথর্ববেদ, গণিতশাস্ত্র, লীলাবতী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ফারসী ভাষায় লিখিত আকবরের দরবারের কাব্যগুলিতে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নানা লক্ষণ দেখা যায়—যেমন প্রধান বেগম সাহেবার সঙ্গে হিন্দু দেবীর তুলনা। ফৈজী 'নল-দময়ন্তী' কাব্য রচনা করেন হিন্দু পুরাণ হইতে উপাখ্যান

শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা

সংগ্রহ করিয়া। মুঘল অন্তঃপুরে মহিলাদের মধ্যেও সাহিত্য প্রতিভার অভাব ছিল না। বাবরের কন্যা গুলবদন, শাহজাহানের কন্যা জাহানারা, ঔরংজেবের কন্যা জেবউন্নিসা সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস রচনায় মুঘল যুগ বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এইগুলির মধ্যে আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' এবং 'আকবরনামা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাদেশিক সাহিত্যের উন্নতি

হিন্দী সাহিত্যের অগ্রগতি মুঘল যুগের অন্যতম ঘটনা। আকবরের উদার নীতিতে হিন্দী ভাষা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মির্জা আবদুল রহিম. ভগবান দাস, বীরবল ইঁহারা সকলেই সুকবি ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। সুরদাস ব্রজভাষায় কবিতা লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তুলসীদাস রচিত 'রামচরিতমানস' হিন্দী সাহিত্যের এক অমূল্য গ্রন্থ। মুঘল আমলে বাংলা ভাষারও উন্নতি হইয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ এই যুগেই ঘটিয়াছিল। বাংলায় বৈষ্ণব গীতিকাব্য আরও বিকশিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বৃন্দাবনদাস, জয়ানন্দ প্রভৃতি সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব সাহিত্যের রচয়িতা। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যও এই যুগে রচিত হইয়াছিল। কাশীরাম দাস রচিত মহাভারত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতি এই যুগের সাহিত্য সমৃদ্ধির পরিচায়ক। মারাঠী ভাষা ও সাহিত্যেরও এই যুগে উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল। একনাথ ও তুকারামের সাধনায় মারাঠাদের নবজন্ম হয়। রামদাস ও বামন পণ্ডিত 'দাসবোধ' এবং ভক্ত তুকারামের 'অভঙ্গ' এই যুগের বিখ্যাত মারাঠী গ্রন্থ। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর ছিল উর্দু ভাষা অনুশীলনের সুপ্রসিদ্ধ কেন্দ্র। এই যুগের প্রধান উর্দু লেখক ছিলেন ওয়ালি, হাতিম খান, আজু প্রভৃতি।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে সম্প্রীতি

মুঘল যুগে হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের মেলামেশার মধ্য দিয়া নিজ নিজ ধর্মমতকে অপরের সহিত মিলাইয়া লইয়াছিল। ফলে ধর্মানুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য দেখা দেয়। হোলি, দেওয়ালী, মহর্‌রম প্রভৃতি উৎসবে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই অংশগ্রহণ করিত। সামাজিক আচার-ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ হইলেও সাধারণ লোক তাহার সংবাদ রাখিত না। এই যুগে জনসাধারণ রাজনীতি লইয়া কখনো চিন্তা করিত না।

আধুনিক যুগ

প্রথম অধ্যায় | মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ও পতন

ভারতে মুসল সাম্রাজ্য ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। নামে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিলেও কার্যতঃ মুঘল সম্রাটগণ দুইশত বৎসর গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালের শেষার্ধেই এই সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। শাহজাহান ইহার জন্য কিছুটা দায়ী ছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালের ঐশ্বর্য, সমারোহ ও সমৃদ্ধির অন্তরালেই মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতনের চিহ্ন ফুটিয়া ফুঠিয়াছিল। একথা ঠিক যে তাঁহার বিলাস প্রজাদের পক্ষে নিপীড়নমূলক হইয়া দাঁড়ায়। রাজদরবারের বিপুল ব্যয় ও বৈদেশিক যুদ্ধ চালাইবার জন্য তিনি প্রজাদের উপর গুরু করভার চাপাইয়া দিয়াছিলেন। আকবরের উদার ও ধর্মসহিষ্ণু নীতির পথও তিনি ত্যাগ করেন। তাঁহার আদেশে যেমন নূতন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ হয় তেমনি বহু পুরাতন মন্দির বিধ্বস্ত হয়। তাঁহার এই অনুদার নীতিই ঔরঙ্গজেবের সময়ে আরও তীব্র আকার ধারণ করে। তাঁহার রাজত্বকালে মুঘল বাহিনীতি দুর্নীতি ও উদ্যোগহীনতা দেখা দেয়। তাহারা পূর্বেকার রণদক্ষতা হারাইয়া ফেলে। মধ্য এশিয়া ও সীমান্ত যুদ্ধে ব্যর্থতাই ইহার কারণ। ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারস্যের (ইরানের) আধিপত্য স্থাপিত হয় এবং ইহাতে মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত নয়। সুতরাং শাহজাহানের রাজত্বকালেই মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি শুরু হয়, ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে ইহা পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে।

শাহজাহানের দায়িত্ব

ঔরঙ্গজেব এক বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমা আরও বৃদ্ধি করেন। ফলে তাঁহাকে নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য যেরূপ রাজনৈতিক বিচারবোধ ও মনের প্রসারতা দরকার তাহা তাঁহার ছিল না। ভারতের মত বিশাল দেশে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের সমর্থনের ভিত্তিতেই যে সাম্রাজ্য স্থায়িত্বলাভ করিতে পারে তাহা বুঝিবার মত প্রখর বুদ্ধি ও বিবেচনা তাঁহার ছিল না। তিনি তাঁহার শাসননীতিকে সংকীর্ণ ধর্মীয় মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত করিয়াছিলেন বলিয়া হিন্দুদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল।

ঔরংজীবের দায়িত্ব

ঔরংজেব মারাঠাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু মারাঠাদের ধ্বংস করিতে পারেন নাই। বরঞ্চ মারাঠাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়ে। দাক্ষিণাত্যে ব্যবসা-বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঔরংজেবকে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর দক্ষিণ ভারতে থাকিতে হইয়াছিল। ফলে উত্তর ভারতের অবস্থা তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখিতে ব্যর্থ হন। মারাঠাদের দমন করিতে না পারায় মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির মর্যাদাহানি ঘটে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও তিনি নজর দিতে পারেন নাই।

মারাঠা নীতি ও তাহার প্রতিক্রিয়া

ঔরংজেবের রাজপুত নীতিও বাস্তবানুগ ছিল না। রাজপুতনার কয়েকজন রাজার সঙ্গে তাঁহার বিরোধ মুঘল সাম্রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী হইয়াছিল। তাঁহার অদূরদর্শী নীতি রাজপুতদের মুঘল সাম্রাজ্যের শত্রুতে পরিণত করে। ইহাতে মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয় ঘটিয়াছিল।

রাজপুত নীতি

ঔরংজেবের নীতির ফলে দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে শতনামী, জাঠ ও শিখ বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইসব বিদ্রোহে কৃষক সম্প্রদায় বেশি সংখ্যায় যোগদান করিয়াছিল। উহা হইতে বুঝা যায় ঔরংজেবের শাসনকালে কৃষকদের শোষণ চরম সীমায় পৌঁছাইয়াছিল। ঔরংজেবের ধর্মান্ধতা ও হিন্দুদের প্রতি তাঁহার বৈষম্যমূলক নীতি ও ব্যবহার মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে আঘাত করিয়াছিল। ঔরংজেব জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করিয়া, উত্তর ভারতের হিন্দু মন্দির ধ্বংস করিয়া এবং হিন্দু প্রজাদের উপর কয়েকটি বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া বিরাট সংখ্যক হিন্দুদের মুঘল সাম্রাজ্যের শত্রুতে পরিণত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণ তাঁহার নীতির পরিবর্তন ঘটান, কিন্তু তাহাতেও মুঘল সাম্রাজ্য রক্ষা পাইল না। তবে ইহা বলা যায় যে, ঔরংজেবের ধর্মীয় নীতিই মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতনের জন্য একমাত্র কারণ ছিল না।

বিভিন্ন বিদ্রোহ

ধর্মীয় নীতি ও তাহার ফলাফল

ঔরংজেব তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। এ যুদ্ধ কখনও সাম্রাজ্যের উত্তরাংশে, কখনও পূর্বাঞ্চলে, আর কখনও বা দক্ষিণ ভারতে করিতে হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহাকে অধিক সংখ্যায় সৈন্যবাহিনী পাঠাইতে হইয়াছিল। ফলে মুঘল সৈন্য সংখ্যাও বাড়াইতে হয়। কিন্তু মুঘল সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নানা কারণে কমিয়া গিয়াছিল। এ কারণে ঔরংজেব যুদ্ধ অপেক্ষা উৎকোচ ও চক্রান্তের সাহায্যে যুদ্ধজয় ও বিদ্রোহ দমন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

ঔরংজেবের নূতন যুদ্ধনীতি ও বিদ্রোহ দমন নীতি

'জায়গীর' ভূসম্পত্তি বলিতে শর্তাধীনে বিলি করা জমি বুঝাইত। এইসব ভূসম্পত্তির অধিকারীদের বলা হইল জায়গীরদার। তাঁহাদের বড় বা ছোট আকারের সেনাবাহিনী পোষণ করিতে হইত। এই সেনাবাহিনীগুলি সম্রাটদের সেনাবাহিনীব প্রধান অংশ। ঔরংজেবের রাজত্বকালে জায়গীরদার ও মনসবদারদের সংখ্যা তাঁহার পিতার শাসনকাল অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে জায়গীর হিসাবে বিলি করিবার মতো যথেষ্ট পরিমাণ জমিরও অভাব ছিল। রাজকোষের তরফ হইতে তখন নানা ধরনের বহুসংখ্যক অতিরিক্ত কর দাবি করা হইতেছিল। তাহা ছাড়া অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকায় বহু জায়গীরদার নিঃস্ব হইয়া পরিয়াছিল। ফলে তাহাদের পক্ষে তখন আর সম্রাটের সৈন্যবাহিনীতে বিধিবদ্ধ নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য পাঠান সম্ভব হইতেছিল না। অনেক সময় পর পর কয়েক বৎসর ধরিয়া সৈন্যগণ বেতন পাইতেছিল না। ফলে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাহা ছাড়া ঔরংজেবের আমলে জায়গীরগুলি পিতা

জায়গিরদারী প্রথার কুফল

হইতে পুত্রে অর্থাৎ বংশ পরম্পরায় বর্তাইতেছিল। ফলে জায়গীরগুলির উপর সম্রাটের কর্তৃত্ব কমিয়া যায়।

ঔরংজেবের রাজত্বের শেষদিকে মনসবদারী প্রথাও দুর্বল হইয়া পড়ে। মনসবদারগণ সম্রাট কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেন। দাক্ষিণাত্যে অশান্ত রাজনীতির ফলে বেশি সংখ্যক মনসবদারের প্রয়োজন হয়। মনসবদারদের সম্রাটের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে বাছিয়া লওয়া সম্ভব হইত না। এদিকে নানা কারণে ভূমি-রাজস্বের আদায়ের পরিমাণও হ্রাস পায়। ফলে মনসবদার তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অর্থের অপেক্ষা কম অর্থ পাইতে থাকেন। ফলে তাহারা সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যয় কমাইয়া দেন। ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে মনসবদারগণ একটি শাসক-শ্রেণীভুক্ত কর্মচারীবৃন্দ হইতে উপাধিধারী গোষ্ঠীতে পরিণত হন। মনসবদারদের প্রদত্ত ভূমিস্বত্ব শেষে জায়গীরে পরিণত হয়।

মনসবদারী প্রথার দুর্বলতা

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান আয় ছিল ভূমি-রাজস্ব। এই সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয় মিটাইবার পক্ষে ভূমি-রাজস্ব হইতে আয় যথেষ্ট ছিল না। সাম্রাজ্যকে টিকাইয়া রাখিতে হইলে প্রয়োজন ছিল নূতন আয়ের পথ বাহির করা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো এবং পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনে জনসাধারণকে উৎসাহ দেওয়া ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষার্ধে সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়ে।

মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির অবনতি ভাঙন ও পতনের অন্যতম কারণ। ঔরংজেবের রাজত্বের শেষলগ্নে মুঘল বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিয়াছিল। স্বভাবতই তাহাদের যুদ্ধ করিবার মনোবল ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। অর্থাভাবে একটা বিরাট সৈন্যবাহিনী পোষণ করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। সৈন্যবাহিনীর সৈনিক ও সেনানায়করা মাসের পর মাস বেতন পাইত না। সেই যুগের সৈনিক মাত্রেই অর্থের জন্য চাকরি করিত, সৈনিক হইয়া দেশরক্ষার তাগিদ তাহাদের মধ্যে ছিল না। ফলে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিরোধ করা ইহাদের দ্বারা সম্ভব হয় নাই।

সামরিক শক্তির অবনতি

ঔরংজেবের রাজত্বের শেষদিকে মুঘল রাজদরবারে অভিজাতদের দুইটি দল বা গোষ্ঠী ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মাতিয়া উঠে। পরবর্তী ৪০ বৎসর এই দল দুইটিই মুঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল। প্রথম দলের নেতা ছিলেন আসাদ খাঁ ও তাঁহার পুত্র জুলফিকার খাঁ। আসাদ আসিয়াছিলেন ইরান হইতে। তিনি ধীরে ধীরে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জুলফিকার খাঁ মারাঠা যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখান এবং মীর বক্‌সীর পদে উন্নীত হন। ঔরংজেবের রাজত্বকালেই আসাদ খাঁ ও তাঁহার পুত্র জুলফিকার খাঁ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান দুইটি পদ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। স্বভাবতই তাঁহারা বিপুল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই দলের অন্যান্য ক্ষমতাবান ওমরাহ ছিলেন দাউদ খাঁ পন্নী, দলপৎ বুন্দেলা ও রাও রামসিং।

রাজদরবারে অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

দাক্ষিণাত্যের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই দাউদ খাঁর সমর্থক ছিলেন। আসাদ-জুলফিকার গোষ্ঠীর অধীনে প্রায় ৫০ হাজার সৈন্য ছিল। এই গোষ্ঠী জাতিভিত্তিক ছিল না। অর্থাৎ কেবলমাত্র ইরানীরাই এই দলে হর্তাকর্তা ছিল না।

জুলফিকার গোষ্ঠী

মুঘল দরবারে দ্বিতীয় দল বা গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন গাজিউদ্দিন ফিরোজ জঙ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় চিন কুলিচ খাঁ ও নিজাম উল্ মুলক খাঁ। হামিদ খাঁ ও আমিন খাঁ ইহাদের সমর্থন করিতেন। ইহারা সকলেই সাতহাজারী, পাঁচহাজারী মনসবদার ছিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন সুন্নী। ইহারা ছিলেন আসাদ-জুলফিকার গোষ্ঠীর বিরোধী। এই গোষ্ঠীকে বলা হইত 'চিন' গোষ্ঠী। জুলফিকার ও চিন কুলিচের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল। এই দুইজনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতা দখলের লড়াই প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া মুঘল দরবারের তথা মুঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করিয়াছিল।

চিন গোষ্ঠী

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজের পতন ঘটে এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারায়। ঔরংজেবের শাসনকালে শুরু হওয়া এই পতনের গতি তাঁহার মৃত্যুর পর আরও দ্রুত হয়। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর মুঘল বংশের আরও এগার জন সম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই এগার জনের মধ্যে অধিকাংশই নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন। মুঘল বংশীয় সম্রাটদের মধ্যে উত্তরাধিকার লাভের কোন নির্দিষ্ট বিধান না থাকায় একজন সম্রাটের মৃত্যু হইলে শাহজাদানের মধ্যে সিংহাসনের দখল লইয়া ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হইত। ইহাতে বিপুল লোকক্ষয় ও সম্পত্তির বিনাশ ঘটিত। এইসব গৃহযুদ্ধ মুঘল শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। অভিজাত শ্রেণী এই যুদ্ধের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া এই শ্রেণীতে দল ও উপদলের আবির্ভাব হয়।

দুর্বল সম্রাটদের শাসন

ঔরংজেবের মৃত্যু ও তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধে অভিজাতদের মধ্যে জুলফিকার গোষ্ঠী ও চিনগোষ্ঠীর সুদিন উপস্থিত হয়। ঔরংজেবের মৃত্যুর পূর্ব হইতেই তাঁহার পুত্ররা এই দুই গোষ্ঠীর সক্রিয় সাহায্য পাইবার জন্য সচেষ্ট হয়। উত্তরাধিকার যুদ্ধ যখন শুরু হইল তখন কিন্তু এই দুই গোষ্ঠী গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি না লইয়া নিজ নিজ গোষ্ঠীর দিক হইতে সুযোগ-সুবিধা আদায় করিতে থাকেন। তাহারা সুযোগমত দল বদল করিতে দ্বিধা করিলেন না। উদাহরণ হিসাবে জুলফিকার গোষ্ঠীর নাম করা যাইতে পারে। এই গোষ্ঠী প্রথমে ঔরংজেবের দ্বিতীয় পুত্র আজমকে সমর্থন করিয়াছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র মুয়াজ্জম (বাহাদুর শাহ) যুদ্ধে জয়লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই গোষ্ঠী আজমকে পরিত্যাগ করিতে বিলম্ব করে নাই। অপরদিকে মুয়াজ্জমও আসাদ-জুলফিকার গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করিতে দেরী করেন নাই। চিন গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে রাখিবার জন্য বড় বড় সরকারী পদ বা মনসব দেওয়া হয়। কিন্তু ইহাতেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অবসান হয় নাই। উজির মুনিম খাঁ ও জুলফিকার খাঁর মধ্যে ক্ষমতায়

উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও জুলফিকার গোষ্ঠীর ক্ষমতালাভ

লড়াইকে কেন্দ্র করিয়া অভিজাতদের মধ্যে দলাদলির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইল। এই দলাদলি রাজনৈতিক দিক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জুলফিকারের দল চাহিত রাজপুত ও মারাঠাদের সঙ্গে মিটমাট, আর মুনিম খাঁর দল ইহার বিরুদ্ধে ছিল।

এই সময় হইতে উজির, মীর বক্‌সী ও দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধির পদ লইয়া মুঘল দরবারে দল ও উপদলের ক্ষমতাশালী অভিজাতদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিল। মুনিম খাঁর মৃত্যুর পর (১৭১১ খ্রীঃ) উজির পদকে কেন্দ্র করিয়া ইহা আত্মপ্রকাশ করে। জুলফিকার এই পদটি পাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে তিনি সম্রাটপুত্রদের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেন। এমন কি তিনি চারিজন রাজকুমারের মধ্যে সাম্রাজ্য বিভাগের পরিকল্পনাও ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয় (১৭১২ খ্রীঃ)। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। জুলফিকার সবচেয়ে অপদার্থ শাহজাদা জাহান্দর শাহের (১৭১২-১৭১৩) পক্ষ লইয়া অপর দুই রাজকুমারকে পরাজিত করেন এবং নিজে উজির ও দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি হন। তাঁহার গোষ্ঠীভুক্ত ওমরাহগণ সাম্রাজ্যের লোভনীয় পদগুলি হস্তগত করে। সংক্ষেপে, সাম্রাজ্যের ক্ষমতা জুলফিকার গোষ্ঠীর হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত অভিজাতরা জুলফিকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হইতে দেরী করিল না। সম্রাটের আত্মীয় কোকলতাশ খাঁর নেতৃত্বে এক গোষ্ঠী পুরাতন চিন গোষ্ঠীর সঙ্গে এক হইয়া জুলিফকার খাঁর বিরুদ্ধে সক্রিয় হইয়া উঠে। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দেয়। ইীতমধ্যে বিহারের সুবাদার সৈয়দ হুসেন ও এলাহাবাদের সুবাদার সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ (সৈয়দ ভ্রাভৃদ্বয় নামে পরিচিত) সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র ফাররুখশিয়রের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহী হন। আগ্রার যুদ্ধে জুলফিকার খাঁ পরাজিত হন। ফলে জুলফিকার গোষ্ঠীর পতন ঘটিল। নূতন সম্রাট হইলেন ফার্‌রুখশিয়র। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি আবদুল্লা খাঁকে উজির এবং হুসেন খাঁকে মীর বক্‌সী পদে নিয়োগ করেন। বলিতে গেলে এই দুইজনেই দেশের সত্যিকার শাসক হইলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের সহিত সম্রাটের মতবিরোধ দেখা দিল। ১৭১৩ হইতে ১৭২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কার ইতিহাস হইল সম্রাটের সহিত সৈয়দ ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘর্ষের ইতিহাস। ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাট ফার্‌রুখশিয়রকে হত্যা করিয়া নিজেদের মনোমত শাহাজাদাদের পর পর সিংহাসনে বসাইতে থাকেন। ১৭২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সৈয়দ ভ্রাতারাই ছিলেন মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্তা। ইহারা পর বাহাদুর শাহের তৃতীয় পৌত্র অন্যান্য অভিজাতদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজিত করেন এবং মহম্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়া সম্রাট হন। তিনি দীর্ঘ তিরিশ বৎসর রাজত্ব (১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ) করেন। তাঁহার দীর্ঘ শাসনকালটি মুঘল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার শেষ সুযোগ আনিয়া

জুলফিকার গোষ্ঠীর পতন

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্ষমতা লাভ

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন

দিয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। অভিজাতদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন সুনিশ্চিত করিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অনেকটা দায়ী ছিল। ঔরংজেবের মৃত্যুর পরও উত্তরাধিকার লইয়া যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় তাহাতে অযোগ্য উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসাইয়া অভিজাত শ্রেণীর বিভিন্ন গোষ্ঠী সাম্রাজ্য শাসন সহজতর হইবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বিবেকবুদ্ধিহীনতা ও আত্মকলহ মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে দুর্বল করিয়া দেয়।

কলাফল

পূর্বে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে মুঘল রাজবংশের প্রতি আনুগত্য গভীর ছিল। এই আনুগত্যের বদলে তাঁহারা বহু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতেন। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর মুঘল রাজবংশের অধঃপতনের সুযোগে অভিজাতগণ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে রাষ্ট্রের বা সম্রাটের আনুগত্যের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং এক একটি স্বাধীন রাজ্যের পত্তন ঘটান। তাঁহাদের এই কার্যের ফলে যে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা তাঁহারা বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহার ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি বংশানুক্রমিক নবাব বংশের আবির্ভাব ঘটে। উদাহরণ হিসাবে বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদের নাম করা যায়।

স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি

মুঘল সম্রাটের প্রতি ইহাদের আনুগত্য ছিল নামমাত্র। মারাঠা সরকার এই সুযোগে দক্ষিণ ভারত ছাড়িয়া উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তারে মনোযোগী হয় এবং স্বল্পকালের মধ্যেই তাহারা মালব, গুজরাট ও বুন্দেলখণ্ড দখল করিয়া নেয়। ফলে মুঘলদের সাম্রাজ্য আগ্রা ও দিল্লী এলাকার মধ্যেই সীমীত হইয়া পড়ে।

মুঘল সাম্রাজ্যের এই ঘোরতর দুর্দিনে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন (১৭৩৯ খ্রীঃ)। তাঁহার আক্রমণের প্রতিরোধ করিবার মত ক্ষমতা মুঘল সম্রাটের ছিল না। নাদির শাহ কাবুল, পেশোয়ার ও পাঞ্জাব অধিকার করিয়া দিল্লীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। সম্রাট মহম্মদ শাহ কর্নাল নামক স্থানে তাঁহার সম্মুখীন হন। যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও বন্দী হইলে বিজয়ী নাদির শাহ সসৈন্যে দিল্লীতে প্রবেশ করেন এবং দেড় লক্ষ লোক হত্যা করেন। ইহার পর নাদির শাহ কোটি কোটি নগদ টাকা এবং বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদি লইয়া দেশে ফিরিয়া যান। যাইবার আগে অবশ্য তিনি মহম্মদ শাহকে আবার সিংহাসনে বসাইয়া গিয়াছিলেন। প্রতিদানে মহম্মদ শাহ সিন্ধু নদীর পশ্চিম তীরের সমস্ত অঞ্চল নাদির শাহকে ছাড়িয়া দেন। মহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন বটে কিন্তু মুঘল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরবের আর কিছুই রহিল না। যন্ত্রণায় লাঞ্ছনায় অবসাদে মুঘল সাম্রাজ্য মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া রহিল, নবজীবন সঞ্চার করিবে এমন শক্তি তাঁহার ত্রিসীমানায় ছিল না।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণ

নাদির শাহের আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিম লগ্ন ঘনাইয়া আনে। এই আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যেরই কেবলমাত্র মর্যাদাহানি ঘটে নাই, সাম্রাজ্যের দুর্বলতা প্রজাবর্গের নিকট গোপন রহিল না। মারাঠা সর্দারগণ ও বিদেশী বণিক সংস্থাগুলির উচ্চাশাও বৃদ্ধি পাইল। কেন্দ্রীয় শাসন বলিয়া কিছু অবশিষ্ট রহিল না। দেশের অর্থনীতিও ভাঙ্গিয়া পড়িল। একদিকে আফগানিস্তান ও সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত ভূভাগ মুঘল সম্রাটের হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা যেমন বৃদ্ধি পাইল অপরদিকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল অধীনে রাখা মুঘল সম্রাটের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ায় শাসনব্যবস্থায় চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। অভিজাতদের মধ্যে আত্মকলহ আরও তীব্র হওয়ায় সমগ্র দেশে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিল।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণের ফল

আনুষ্ঠানিকভাবে মুঘল যুগের অবসান ঘটে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু আসলে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর হইতেই এই সাম্রাজ্যের মৃত্যুঘণ্টা বাজিতে থাকে। বাহাদুর শাহ ছাড়া কোন সম্রাটই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। অভিজাতদের কোন না কোন গোষ্ঠীর হাতে তাঁহারা ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করেন। এই সময় মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বার্থপরতা ও আত্মকলহ দেখা দেয়। ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্থানী এই তিন দলে বিভক্ত হইয়া অভিজাতগণ ক্ষমতাবৃদ্ধির হীন, অন্তহীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। জুলফিকার গোষ্ঠী, চিন্ গোষ্ঠী, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, নিজাম-উল-মুল্‌ক প্রভৃতি ওমরাহদের মুঘল সাম্রাজ্য-বিরোধী নীতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ১৭০৭ হইতে ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সাতটি রক্তক্ষয়ী উত্তরাধিকার যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে বহু যুবরাজ, ওমরাহ, দক্ষ সেনাপতি ও প্রশাসক নিহত হন। অসংখ্য সৈন্যও নিহত হইয়াছিল, অতএব কার্যতঃ মুঘল সাম্রাজ্য বলিয়া আর কিছু রহিল না। ইহা কেবল ভারতবাসীর মনেই থাকিয়া যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবসূর্য অস্তমিত হইয়া পশ্চিমাকাশে লোহিতবর্ণের আলো যেন তথাকথিত মুঘল বাদশাহের মাধ্যমে বিকিরণ হইতেছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু ইতিমধ্যেই বাংলায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে ইংরাজ শক্তি সমগ্র উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। আর ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা দিন দিনই সঙ্গীন হইয়া উঠে।

সার্বিক অবক্ষয়

দ্বিতীয় অধ্যায়

আঞ্চলিক শক্তিগুলির উৎপত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি

১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ঔরংজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। মুঘল সাম্রাজ্যের যখন এই অবস্থা তখন মারাঠারা প্রবল হইয়া উঠিল। জাঠ, রোহিল প্রভৃতিরা দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিল। পাঞ্জাবে শিখদের অভ্যুদয় ঘটিল। ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ

ভারত আক্রমণ করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের চরম আঘাত দিয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্তারা স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিলেন। বাংলা ও অযোধ্যার নবাব এবং দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা হায়দ্রাবাদের নিজাম স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন।

বাংলার নবাবীর উত্থান। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা হইতে বাংলার ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ঐ সময় হইতে ঔরংজেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাংলা ছিল সম্পূর্ণভাবে মুঘল শক্তির অধীনে। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর পর আইনতঃ বাংলায় মুঘল প্রভুত্ব স্বীকৃত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহার স্বাধীন ইতিহাস শুরু হয়। এই ইতিহাসের সূচনা ঘটে মুর্শিদকুলি খাঁর সময় হইতে।

বাংলার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা

ঔরংজেব তাঁহার রাজত্বের শেষদিকে মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে সম্রাট ফাররুখশিয়ার ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে বাংলার সুবাদার পদে নিয়োগ করেন। পূর্বে সুবাদার এবং দেওয়ানের দায়িত্ব কখনও একই ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকিত না। মুর্শিদকুলি খাঁ একধারে দেওয়ান এবং সুবাদারের পদ পাইয়া বাংলার সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। তিনি বাংলায় এক স্বাধীন নবাব বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দিল্লীকে করদানও বন্ধ করিয়া দেন এবং মুর্শিদাবাদ শহরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭১৪ ও ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি বিহার ও উড়িষ্যাকেও বাংলার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লন। এই নূতন বাংলা কার্যত ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে ফারুখশিয়ার ইংরেজ বণিকদের যে সব বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দিয়াছিলেন সেগুলি মুর্শিদকুলি খানের বিরোধিতায় বাংলায় কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই।

মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকাল

স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয়

মুর্শিদকুলি বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যুর পর (১৭২৭ খ্রীঃ) তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হন। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলার নবাব হন। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে আলিবর্দী খাঁ সরফরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া গিরিয়ার যুদ্ধে তাঁহাকে হত্যা করিয়া বাংলার মসনদ দখল করেন। অর্থের বিনিময়ে মুঘল সম্রাট তাঁহাকে বাংলার সুবাদার বলিয়া স্বীকার করিয়া লন। বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা সিংহাসন দখল করিলেও আলিবর্দী কিন্তু শাসক হিসাবে অযোগ্য ছিলেন না। যুদ্ধ ও শাসনকার্যে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুজাউদ্দিন, সরফরাজ ও আলিবর্দী খাঁ

হায়দ্রাবাদ। দাক্ষিণাত্যের মুঘল সুবাদার আসফ জা মুঘল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হায়দ্রাবাদ নামে একটি নূতন রাজ্য গঠন করেন (১৭২৪ খ্রীঃ)। গোলকুণ্ড

দুর্গের অদূরে হায়দ্রাবাদ নামে একটি স্থানে নূতন রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত হয়। নিজাম উল-মুল্ক আসফ জা ছিলেন ঔরংজেবের পরবর্তী যুগের একজন ক্ষমতাশালী ওমরাহ। তাঁহার চেষ্টায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের অপসারণ সম্ভব হইয়াছিল। এই কাজের পুরস্কারস্বরূপ তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদ পান। ইহার পর তাঁহাকে মুঘল সাম্রাজ্যের উজীর পদ দেওয়া হয়। উজীর বা প্রধানমন্ত্রী হইয়াই তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙিয়া পড়া শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে তিনি ব্যর্থ হন। আমীর ওমরাহরা তাঁহার বিরোধিতা করে। পরিশেষে তিনি উজীরের পদ ছাড়িয়া দিয়া দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যান এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পত্তন ঘটান। প্রকাশ্যে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা না করিলেও কার্যতঃ তিনি স্বাধীন নবাব হিসাবেই রাজত্ব চালাইতেন। যুদ্ধ ঘোষণা ও সন্ধি স্থাপন, উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, জায়গীর বিতরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে দিল্লীর অনুমতি লওয়া প্রয়োজন বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে আসফ জা'র মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর হায়দ্রাবাদ রাজ্যে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দেয়। ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানী এই গৃহবিবাদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবে বিদেশী বণিকরা ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ পায়।

স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পত্তন

আসফ জা'র শাসনকাল

মহীশূর। মহীশূর রাজ্যটি দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ শক্তির প্রসারে বাধা দিতে সক্ষম হইয়াছিল। মহীশূর রাজ্যটি দুইদিকে পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট পর্বত ও দক্ষিণে কাবেরী নদী-বেষ্টিত একটি মালভূমিতে অবস্থিত থাকায় সেখানে শত্রুসৈন্য সহজে প্রবেশ করিতে পারিত না। মুঘল ও মারাঠাদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মূল ঘটনা হইতে ইহা দূরে ছিল। মহীশূরে কৃষিপণ্যের উৎপাদন প্রচুর হইত। ভূমি-রাজস্ব এখানে কমই ছিল এবং কুটির শিল্পও বেশ প্রসারলাভ করিয়াছিল।

মহীশূর রাজ্যের গুরুত্ব



হায়দর আলি

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে ওদিয়ারের হিন্দু বংশের রাজাকে তাঁহার মুসলমান সেনাপতি হায়দর আলি পদচ্যুত করিয়া সিংহাসন দখল করেন। তিনি প্রথমেই সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন করেন এবং জায়গীরদারদের উপর নির্ভর না করিয়া সরাসরি নিজের অধীনে স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গড়িয়া তোলেন। সরকারী

তহবিল হইতে তাহাদের বেতনের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি জায়গীর বণ্টনের প্রথাও বন্ধ করিয়া দেন। তিনি তাঁহার সৈনব্যাহিনীতে ফরাসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকদের নিয়োগ করেন। ইহারা হায়দরের সৈন্যদের ইউরোপীয় সামরিক প্রথায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হয়। হায়দর আলি পদাতিক সৈন্যবাহিনীর উপর বেশী করিয়া নির্ভর করিতেন। তাহা ছাড়া তাঁহার প্রথম শ্রেণীর একটি গোলন্দাজ বাহিনীও ছিল।

সামরিক ক্ষেত্রে সংস্কার

সামরিক বিভাগে বিরাট পরিবর্তন এবং মহীশূরের উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই হায়দর আলি মহীশূরকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। ১৭৬১-৬৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি অনেকগুলি যুদ্ধ চালাইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হস্‌কোট, দড্ডা, বালাহপুর, নান্দিদুর্গ, বেদনোর প্রভৃতি স্থান নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। তিনি মালাবার উপকূলে অবস্থিত মাঙ্গালোর বন্দর ও কান্নাড়া অঞ্চলটি জয় করেন।

হায়দর আলি মারাঠাদের ন্যায় পরদেশ আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিতেন না। বিজিত রাজ্যগুলিকে তিনি তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যবিস্তারের অনিবার্য ফলস্বরূপ দক্ষিণ ভারতের দুইটি প্রধান শক্তি মারাঠা ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে হায়দর আলি মারাঠাদের নিকট পরাজিত হন। ইহার পর তিনি বালাম ও কুর্গে অভিযান চালান। বালাম তিনি দখল করেন কিন্তু কুর্গের সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। ইতিমধ্যে তিনি মালাবার উপকূলে অবস্থিত কালিকট দখল করেন।

মারাঠা ও হায়দ্রাবাদের মধ্যে বিরোধ

হায়দরের শক্তিবৃদ্ধি হায়দ্রাবাদের নিজামকে ভীত ও ঈর্ষান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের সহিত নিজামের এক সন্ধি হয়। এই সন্ধি দ্বারা নিজাম উত্তর সরকার-এর বিনিময়ে হায়দার আলির বিরুদ্ধে ইংরাজদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পান। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে মারাঠা, ইংরেজ ও নিজাম এই তিন শক্তি হায়দার আলির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হইল। হায়দর মারাঠা ও নিজামকে অর্থ দিয়া ক্রয় করিতে সমর্থ হন। ইংরাজ এই সময় বড়মহাল আক্রমণ করে এবং শ্রীরঙ্গপত্তমের দিকে অগ্রসর হইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই সংবাদ পাইয়া হায়দার পুত্র টিপু পাল্টা আক্রমণ করেন। ফলে ইংরেজদের সহিত মহীশূরের যুদ্ধ বাধিয়া যায় (১৭৬৭ খ্রীঃ)।

শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

অযোধ্যা। সাদত খান্ বুরহান উল্ মুল্‌ক্ আযোধ্যার স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যায় সুবাদার নিযুক্ত হন। এই সময় অযোধ্যার প্রায় সব অঞ্চলেই জমিদার ও জায়গীরদারগণ স্বাধীন হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ছিল। তাহারা দিল্লীর বাদশাহকে কর দিতেও অস্বীকার করিয়াছিল। সাদাত খান দৃঢ়তার সহিত এই সমস্যার সমাধান করেন। তিনি জমিদারদের বে-আইনী

উৎপত্তি

কার্যকলাপ কঠোরহস্তে দমন করেন এবং তাহাদের ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য কর দিতে বাধ্য করেন। তিনি কার্যত স্বাধীনভাবে অযোধ্যা শাসন করেন এবং বংশানুক্রমিক নবাবীর ভিত্তিও রচনা করিয়া যান।

১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র সফ্‌দার জঙ্গ অযোধ্যার নবাব হন। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি একইসঙ্গে দিল্লীর সম্রাটের উজীরের পদ লাভ করেন। এই সময় তিনি এলাহাবাদ অঞ্চলটি অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত করেন। সফ্‌দার জঙ্গ ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অযোধ্যার নবাব ছিলেন। তিনি মারাঠাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া অযোধ্যা রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। তিনি রোহিলা ও পাঠানদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি মারাঠা ও জাঠদের সাহায্য লইতেও দ্বিধা করেন নাই। সফ্‌দার জঙ্গ-এর শাসনকাল অযোধ্যার ইতিহাসে এক স্মরণীয় যুগ। তাঁহার দরবারের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে একটি বিশেষ আদব-কায়দা গড়িয়া উঠে। তিনি লক্ষ্ণৌতে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বাধীন নবাব হিসাবে অযোধ্যা শাসন করিতে থাকেন।

সফদার জঙ্গের শাসন নীতি

শিখ শক্তির অভ্যুত্থান

তুর্কী-আফগান যুগে গুরু নানক শিখ ধর্ম প্রচার করেন। নানক ও তাঁহার পরবর্তী তিনজন শিখগুরু অঙ্গদ (১৫৩৮—১৫৫২ খ্রীঃ), অমরদাস (১৫৫২—১৫৭৪ খ্রীঃ) ও রামদাস (১৫৭৪—১৫৮১ খ্রীঃ) শান্তিকামী ধর্মপ্রচারক ছিলেন। শিখ সম্প্রদায়ও ছিল পুরোপুরি একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। সৎকাজ, সংযম অভ্যাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে মোক্ষলাভ তখন তাহাদের লক্ষ্য ছিল। হিন্দুদের আচার-ব্যবহারের সহিত তাহাদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। চতুর্থ গুরু রামদাসকে সম্রাট আকবর অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি অমৃতসরে রামদাসকে যে ভূমিদান করেন সেখানেই অমৃতসরের প্রসিদ্ধ স্বর্ণমন্দির স্থাপিত হয়।

শিখ ধর্মের সূচনা কাল

পঞ্চম গুরু অর্জন (১৫৮১—১৬০৬ খ্রীঃ) প্রথম 'আদিগ্রন্থ' সংকলন করেন। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরও তিনিই নির্মাণ করেন। শিখ সম্প্রদায়কে একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। শিখদের নিকট হইতে কর আদায় করিবার জন্য একশ্রেণীর কর্মচারীও তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার এই শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধিতে জাহাঙ্গীর বিরক্ত হন। তাঁহার পুত্র খসরু সম্রাটের বিদ্রোহী হইলে শিখগুরু অর্জন তাঁহাকে সাহায্য করেন। জাহাঙ্গীর গুরু অর্জনকে বন্দী করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই ঘটনায় শিখগণের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ ও প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের (১৬০৬-১৬৪৫ খ্রীঃ) সময় হইতে শিখজাতির মধ্যে সামরিক শিক্ষা প্রচলিত হয়। সপ্তম গুরু হররাই (১৬৪৫-১৬৬১ খ্রীঃ ধর্মীয় প্রচারে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। অবশ্য শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে যখন সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ শুরু হইল তখন যুবরাজ দারা শিখগুরু হররাই-

শিখ-মুঘল সম্পর্ক: গুরু অর্জনের প্রাণদণ্ড

এর শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সাহায্য চান। এই কারণে ঔরংজেব দিল্লীর মসনদে বসিয়াই শিখদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ নীতি অনুসরণ করেন। তিনি গুরু হররাইকে দিল্লীতে উপস্থিত হইবার জন্য নির্দেশ পাঠান। হররাই নিজে উপস্থিত না হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে প্রেরণ করেন। শিখদের ধর্মীয় গ্রন্থে ইসলাম-বিরোধী মন্তব্য রহিয়াছে বলিয়া ঔরংজেব ঐগুলিকে বাদ দিতে বলেন। গুরু হররাই-এর পুত্র ঔরংজেবের নির্দেশমত কাজ করায় হররাই পুত্রের প্রতি রুষ্ট হন এবং তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া শিশুপুত্র হরকৃষণকে তাঁহার উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেন। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে হরকৃষণ শিখদের গুরু হন। তিনি আট বৎসর বয়সে হঠাৎ মারা যান। ইহার পর তেগবাহাদুর ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে শিখ সম্প্রদায়ের গুরু হন।

তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ড

ঔরংজেব কাশ্মীরী পণ্ডিতদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিতে শুরু করিলে তেগবাহাদুর প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইহার ফলে তিনি ঔরংজেবের বিরাগভাজন হইলেন। ঔরংজেব তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তেগবাহাদুর ঔরংজেবের মনোভাব পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই কারণে দিল্লী যাইবার পূর্বেই পুত্র গোবিন্দসিংকে দশম গুরু মনোনীত করেন। দিল্লীতে পৌঁছাইবার পর ঔরংজেব তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বলেন। গুরু তেগবাহাগুর দৃঢ়তার সহিত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঔরংজেব তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। গুরু তেগবাহাদুরের আত্মদান শিখজাতিকে এক নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিল।



গুরু গোবিন্দ সিং

গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৭৫-১৭০৮ খ্রীঃ)। তেগবাহাদুরের হত্যাকাণ্ডে সমস্ত শিখজাতির মনে দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। ফলে তাহারা প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইল। তাহাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব পড়িয়াছিল দশমা এবং সর্বশেষ গুরু তেগবাহাদুরের পুত্র গোবিন্দের উপর। গুরু গোবিন্দ শিখদের অধিকতর সংঘবদ্ধ করিয়া একটি ঐক্যবদ্ধ এবং আত্মনির্ভরশীল স্বাধীন ভ্রাতৃসঙ্ঘে (খালসা) পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হন। তিনি প্রত্যেক শিখকে বিশেষ রকমের দীক্ষা (পহুন) গ্রহণ করিতে নির্দেশ দেন। দীক্ষার সময় কৃপাণ-স্পর্শে পবিত্র জলে স্নান করিয়া প্রত্যেক শিখকে

শপথ গ্রহণ করিতে হইত যে, তাহারা খালসার অন্তর্ভুক্ত হইয়া সর্বদা তাহাদের দেহে দীর্ঘ কেশ, কংহ (চিরুণী), কৃপাণ, কর্প্‌ (খাটো পাজামা) এবং কড় (লোহার বালা) বহন করিবে, নিজেদের 'সিং' বলিয়া পরিচয় দিবে এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কখনও পলায়ন করিবে না। ইহা ছাড়া তিনি 'আদিগ্রন্থ'কে গুরুর স্থানে অধিষ্ঠিত করেন। জাতিভেদ ও অন্যান্য সকল রকম সামাজিক পার্থক্য তিনি তুলিয়া দেন। এই নবজাগ্রত শিখশক্তিকে তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলেন। ঔরংজেব আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও শিখজাতিকে দমন করিতে পারিলেন না। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর গুরু গোবিন্দ বাহাদুর শাহ্‌কে সিংহাসন লাভে সাহায্য করেন। ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে জনৈক পাঠান আততায়ীর হাতে গুরু গোবিন্দের মৃত্যু হয়। তিনিই শিখদের শেষ গুরু। অতঃপর আদিগ্রন্থ তাহাদের গুরুর স্থান অধিকার করে। বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে গুরু গোবিন্দ শিখদের একটি সুসংহত রণকুশল ভ্রাতৃসঙ্ঘে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে শিখ সম্প্রদায়ের পুনর্জন্ম হইয়াছিল বলা যায়।

শিখদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন

পেশোয়ার অধীনে মারাঠা শক্তির বিকাশ

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিলাসপ্রিয় ও অলস প্রকৃতির ছিলেন। নয় বৎসর রাজত্ব করিবার পর তিনি ঔরংজেবের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) ঔরংজেবের হাতে বন্দী হন এবং মুঘল অন্তঃপুরে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। এই দুর্দিনে নতি স্বীকার না করিয়া মারাঠারা শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারামের নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালাইয়া যান এবং মুঘল সৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে রাজারামের মৃত্যু হয়। ইহার পর তাঁহার বিধবা পত্নী তারাবাঈ শিশুপুত্রের নামে অতিশয় যোগ্যতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। এইদিকে ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ মারাঠা রাজ্যে অভ্যন্তরীণ বিবাদ সৃষ্টি করিবার জন্য শাহুকে মুক্তিদান করেন। শাহু দেশে ফিরিয়া সিংহাসন দাবি করিলে তারাবাঈ তাহাকে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হন। ইহার ফলে মারাঠা রাজ্যে গৃহবিবাদ দেখা দিল। শাহুর শক্তিকেন্দ্র ছিল সাতারা আর তারাবাই-এর কোলাপুর। শাহু ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সাতারার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খুব অলস প্রকৃতির ছিলেন। তিনি রাজকার্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতেন না। তিনি পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীর উপর শাসন-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তিনি কোঙ্কণের বালাজী বিশ্বনাথ নামে জনৈক ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণের হস্তে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিলে মারাঠা ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়। এই অধ্যায় পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাস।

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ

বালাজী বিশ্বনাথ। ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে শাহু বালাজী বিশ্বনাথকে পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার বলে অল্পদিনের মধ্যে বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন।

১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ মুঘল সম্রাট ফারুখশিয়ারের প্রতিনিধি সৈয়দ হুসেন আলির সহিত একটি সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে শিবাজীর রাজ্যের যে সব অঞ্চল মুঘলরা দখল করিয়াছিল তাহা মারাঠাদের ফিরাইয়া দেওয়া হয়। খান্দেশ, গণ্ডোয়ানা, বেরার, কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদের কিছু অংশের উপর মারাঠাদের অধিকার স্বীকৃত হইল। তাহা ছাড়া দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশ হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার মারাঠারা লাভ করিল। এই চুক্তির ফলে মারাঠা রাজ্যের আয় যেমন বৃদ্ধি পাইল দাক্ষিণাত্যের আধিপত্য তেমনি মারাঠাদের হাতে চলিয়া গেল। ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র মারাঠা রাজ্য হইতে মুঘল সৈন্যও সরাইয়া লওয়া হইল। বালাজী বিশ্বনাথ এক বিরাট বাহিনী লইয়া দিল্লীতে গিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিম দশা লক্ষ্য করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য মারাঠাদের সাহায্য মুঘল বাদশাহের প্রয়োজন হইবেই। কিন্তু তিনি তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকর করিতে পারেন নাই। ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়।

মারাঠা সাম্রাজ্যের অগ্রগতি

প্রথম বাজীরাও। বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বাজীরাও পেশোয়া নিযুক্ত হন। তিনি অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন শাসক ছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বাজীরাও মারাঠা শক্তি বিস্তারের এবং হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প করেন। 'বৃক্ষ যখন শুকাইয়া আসিতেছে, তখন বৃক্ষমূলে আঘাত দিলে সব ডালপালা ভাঙ্গিয়া পড়িবে'—এইরূপ চিন্তাধারার বশবর্তী হইয়া মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটাইয়া তিনি সমগ্র ভারতে মারাঠা বা হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিবার পরিকল্পনা করেন। ইহাই হইল প্রথম বাজীরাও-এর 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী'র আদর্শ। এই আদর্শের সার্থক রূপায়ণের জন্য সমস্ত হিন্দু রাজা ও সামন্তদের নিকট সহযোগিতার আহ্বান জানাইলেন। এবং তাঁহার আহ্বানে অধিকাংশই সাড়া দিল। ইহার পর তিনি গৃহশত্রুদের পরাজিত করিয়া হায়দ্রাবাদের নিজামের সহিত চুক্তি করেন। এই চুক্তি অনুসারে ঠিক হয় যে বাজীরাও উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তি বিস্তার করিবেন, নিজাম দাক্ষিণাত্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবেন।

ইহার পর বাজীরাও উত্তর ভারত আক্রমণ করেন। অম্বররাজ জয়সিংহ এবং বুন্দেলরাজ ছত্রশাল তাঁহাকে সমর্থন জানাইলেন। বাজীরাও সহজেই মুঘল সম্রাটের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হন। সম্রাট মহম্মদ শাহ ইহাতে ভীত হইয়া নিজামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নিজাম মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু ভূপালের নিকট এক যুদ্ধে নিজাম ও মুঘল বাহিনী পরাজিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে মারাঠারা মালব, নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ লাভ

উত্তর ভারতে প্রথম বাজীরাও-এর সাম্রাজ্য বিস্তার

করিল। উত্তর ভারতে এই প্রথম মারাঠাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতের এই বিস্তৃত মারাঠা রাজ্যের শাসন ও রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্ত বাজীরাও গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড় ও নাগপুরের ভোঁসলে এই চারিজন মারাঠা নায়ককে মনোনীত করেন। পেশোয়া পুণা হইতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন এবং সকলেই পেশোয়ার প্রাধান্য মানিয়া চলিতেন। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যু হয়।

বালাজী বাজীরাও। পেশোয়া প্রথম বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়া পদে নিযুক্ত হন। শাহুর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। মৃত্যুর পূর্বে শাহু এক চরমপত্র দ্বারা বালাজী বাজীরাও-কে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব দান করিয়া যান। এইভাবে শিবাজীর বংশের পরিবর্তে পেশোয়া বংশই মারাঠা সাম্রাজ্যের অধিপতি হইল।

বালাজী বাজীরাও-এর সাম্রাজ্য বিস্তার : মারাঠা জাতির আদর্শের অবলুপ্তি

বালাজী বাজীরাও তাঁহার পিতার ন্যায় প্রতিভাশালী না হইলেও তিনি সুনিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার মহান আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আদর্শ বিসর্জন দেন এবং মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতের রাজ্যসমূহ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে শুরু করেন। তাঁহার সৈন্যদলের অত্যাচারে রাজপুত, জাঠ ও অন্যান্য হিন্দু শাসকগণ মারাঠাদের শত্রু হইয়া ওঠেন, ফলে হিন্দু রাজাদের সাহায্য ও সহযোগিতা হইতে মারাঠারা বঞ্চিত হইল। বালাজী বাজীরাও সৈন্যবিভাগেরও পরিবর্তন সাধন করেন। শিবাজীর আমলে মারাঠা পদাতিকরাই ছিল সৈন্যবাহিনীর মেরুদণ্ড। বালাজী বাজীরাও পদাতিকের বদলে অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং বেতন দিয়া মুসলমান ও ফিরিঙ্গীদের মধ্য হইতেও সৈন্য সংগ্রহ করেন। ইহার ফলে মারাঠা বাহিনী সংহতি ও জাতীয় প্রেরণা হারাইয়া ফেলিল।

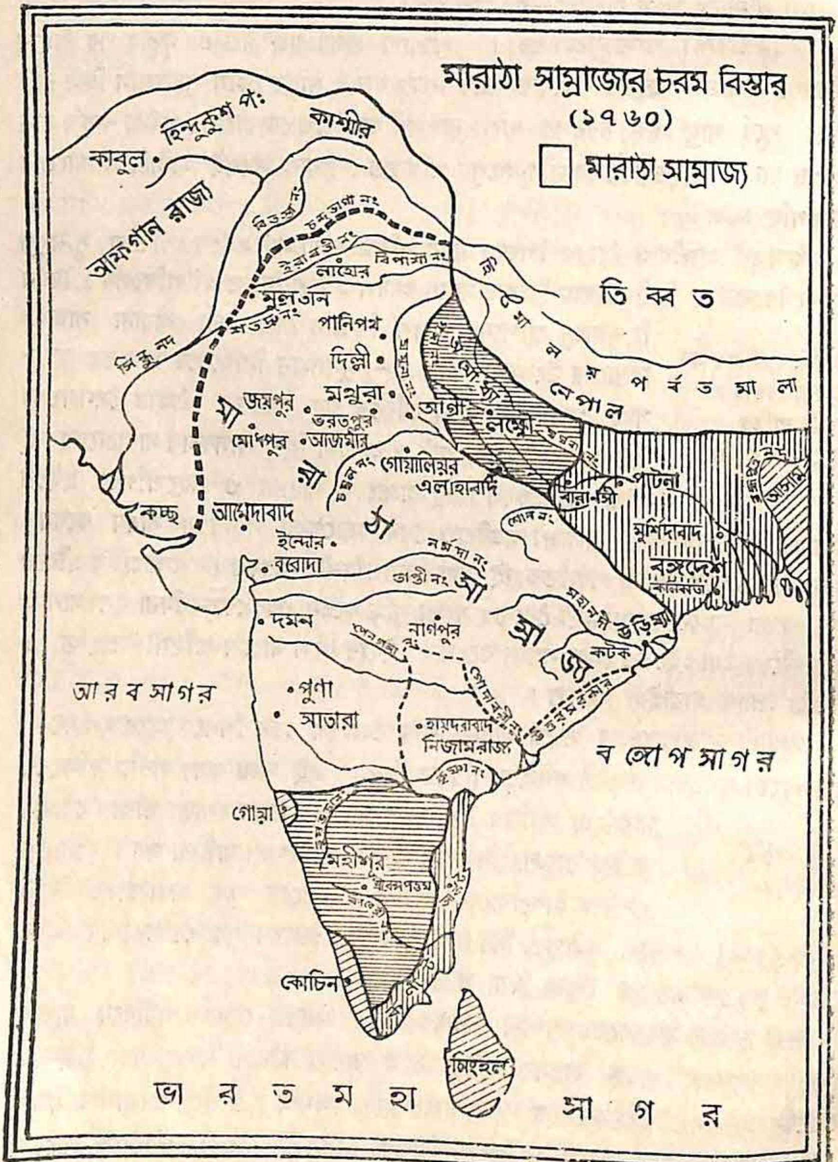
মারাঠা শক্তির চরম বিস্তার

বালাজী বাজীরাও-এর সময়ে মারাঠা শক্তি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময় কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণেও মারাঠারা হাজির হয়, ফলে আর্কটের নবাব বশ্যতা স্বীকার করেন। মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ মারাঠা আধিপত্য মানিয়া লয়। ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম উদ্‌গীরের যুদ্ধে মারাঠাদের নিকট পরাজিত হন। নিজাম, বিজাপুর, বিদর, ঔরঙ্গাবাদের একাংশ এবং দৌলতাবাদ সমেত কয়েকটি দুর্গ পেশোয়াকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

উত্তর ভারতে মারাঠাদের কার্যক্রম বিস্ময়করভাবে অগ্রসর হয়। পূর্বদিকে মারাঠা সৈন্য বাঙলাদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া চৌথ আদায় করিতে থাকে এবং উড়িষ্যায় তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ রাও সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করিয়া দিল্লী পর্যন্ত মারাঠা আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে লাহোর মারাঠাদের অধিকারে আসে। আটক-এর দুর্ভেদ্য দুর্গে পর্যন্ত মারাঠা পতাকা উড়িতে

থাকে। এইভাবে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই মারাঠা জাতি সিন্ধু ও হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১ খ্রীঃ)। মারাঠাদের এইরূপ শক্তিবৃদ্ধিতে দিল্লীতে মুসলমান ওমরাহরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেও মারাঠা শক্তিকে ধ্বংস করিবার সামর্থ্য



মুঘল সম্রাটের ছিল না, কিন্তু বিদেশী শক্তিকে সাহায্য করিবার যথেষ্ট ইচ্ছা ছিল।

আহম্মদ শাহ আবদালীর ভারত আক্রমণ

অপরদিকে মারাঠারা পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লওয়ায় আহম্মদ শাহ আবদালী তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন। উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত মুসলমান শক্তি আবদালীর সাহায্যে অগ্রসর হয়। কিন্তু মারাঠারা হিন্দু ও শিখ শক্তিকে একতাবদ্ধ করিয়া আবদালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা করে নাই। দিল্লীতে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে আবদালীর সহিত মারাঠাদের প্রাথমিক সংঘর্ষ ঘটে এবং মারাঠা সৈন্য পরাজিত হয়। বালাজী রাজীরাও এই খবর পাইয়া তাঁহার সতের বৎসর বয়স্ক পুত্র বিশ্বাস রাও এবং বিখ্যাত সেনাপতি সদাশিব রাও-এর নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী আবদালীর বিরুদ্ধে পাঠান। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারী পানিপথের প্রান্তরে আফগান ও মারাঠাদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইল। ইহাই পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মারাঠারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। মারাঠা পক্ষে হতাহতের সংখ্যা হইল বিপুল। মহারাষ্ট্রে প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারকে আত্মীয়-স্বজনদের দুঃখে কাঁদিতে হইয়াছিল। দুঃসংবাদ পাইয়া পেশোয়া বালাজী রাজীরাও ক্ষোভে ও নিরাশায় প্রাণত্যাগ করেন।

মারাঠাদের পরাজয়

এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি একেবারে ধ্বংস না হইলেও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং তাহাদের গৌরব ম্লান হইয়া যায়। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মারাঠাদের যে প্রতিপত্তি ও খ্যাতি ছিল, ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের পর আর তাহা রহিল না। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে বহু সহস্র মারাঠা সৈনিক নিহত হয়। ইহাদের মধ্যে রণদক্ষ সেনানায়ক ও সুযোগ্য কর্মচারী ছিল। এক আঘাতে মহারাষ্ট্রের একটি যুগের নেতৃবৃন্দ নিঃশেষ হইয়া গেলেন। এই যুদ্ধের পর পেশোয়ার ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দুই-ই লুপ্ত হইল। যদিও মাধব রাও-এর নেতৃত্বে মারাঠাগণ হৃতগৌরব কিছুটা ফিরিয়া পান, কিন্তু ঐক্যবদ্ধ মারাঠা জাতি আর কখনো পূর্বেকার দিনের গৌরব ফিরিয়া পায় নাই। মারাঠাদের ভারতে হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাও ধূলিসাৎ হইল।

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল

অপরদিকে মারাঠাদের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজরা বাঙলা ও কর্ণাটকে নিজেদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ পাইল। মারাঠারা যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ভারতে ইংরেজরা সহজে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিত না। এই কারণে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

তৃতীয় অধ্যায়

দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ ফরাসী সংঘর্ষ
কর্ণাটক যুদ্ধ

ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য ইউরোপীয় বণিকদের নিকট লোভনীয় ছিল। এই বাণিজ্যের জন্যই পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ ও ফরাসী বণিকরা কোম্পানী গঠন করিয়া

তাহাদের নিজ নিজ দেশের সরকারের নিকট হইতে সনদ গ্রহণ করিয়াছিল। এইভাবে ভারতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে বণিকদল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভারতের নানা স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। পর্তুগীজরা সর্বপ্রথম ভারতে আসে। তারপর একে একে ইংরেজ, ডাচ, ওলন্দাজ ও ফরাসীরা এদেশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া ভারতের সহিত অতি লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পর্তুগীজরাই দখল করিয়া ছিল। তবে বেশিদিন তাহারা ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য রাখিতে পারে নাই। ইংরেজ, ডাচ ও ফরাসী কোম্পানী ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য ভারতে আসে। ভারতের নানাস্থানে তাহারা বাণিজ্যিক কুঠিও স্থাপন করে। কিছুদিনের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা ইংরেজদের এই তিনটি বাণিজ্যকেন্দ্র সমৃদ্ধিশালী নগরীরূপে পরিগণিত হয়। ইংরেজরা পর্তুগীজ ও ডাচ প্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে হঠাইতে সক্ষম হইলেও ফরাসীরা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়। রাজ্য জয়ের জন্য তাহাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম শুরু হইয়া যায়। ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করিয়া ইংরেজ কোম্পানীর সমকক্ষ হইয়া উঠে। পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরে তাহাদের সুদৃঢ় ঘাঁটি ছিল। পণ্ডিচেরী দুর্গও বেশ সুরক্ষিত ছিল। ইহা ছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অনেক বন্দরে বেশ কয়েকটি ফরাসী বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজদের তুলনায় ফরাসী কোম্পানীর ব্যবসার পরিমাণ অনেক কম ছিল। তবে ভারতে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসীরাই সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল। ফলে ইহাদের মধ্যেই ক্ষমতা লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল।

বিভিন্ন বাণিজ্যকুঠি

ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকেন্দ্র

ইউরোপে ফ্রান্স ও ব্রিটেন ছিল পরস্পরের শত্রু। এই শত্রুতা দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। নৌপ্রাধান্য, বাণিজ্যিক প্রাধান্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি ঔপনিবেশিক প্রাধান্যের ভিত্তি বলিয়া উভয় দেশই বিশ্বাস করিত। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে অস্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধেও ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড ছিল পরস্পরের শত্রু। ভারতের দিক হইতে এই যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এই সময় হইতে ইউরোপ ও ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানীর ভাগ্য একসূত্রে গাঁথা হইয়া যায়। ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হইতে থাকে ভারতে, আর ভারতে দুই কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইউরোপে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।

ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী শত্রুতা

অস্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের প্রভাব ভারতে অনুভূত হয়। ডুপ্লে ভারতে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর তিনি ফরাসী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেন। ভারতের আঞ্চলিক রাজদরবারগুলির নানা ষড়যন্ত্রমূলক পরিস্থিতি তাঁহার স্বপ্নকে সফল করিবার বাস্তব পটভূমি রচনা করে। কিন্তু সমুদ্রে আধিপত্য না থাকায় ভারতে ফরাসী-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। ইংরেজরাও

চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল না। তাহারা শক্তিবৃদ্ধির দিকে নজর দিল। ফরাসী ও ইংরেজরা উভয়েই ভারতীয়দের লইয়া সৈন্যদল গঠন ইতিমধ্যেই করিয়াছিল।

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব: কর্ণাটকে যুদ্ধ। ইংরেজ ও ফরাসীরা জলপথে ভারতে আসিয়াছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই উপকূল অঞ্চলে রাজনৈতিক অনৈক্যের সুযোগে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছিল। বঙ্গোপসাগরের তীরে করমণ্ডল উপকূল অঞ্চলে (তামিলনাড়ুর আর্কট ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে) কর্ণাটকে রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ইংরেজ ও ফরাসীরা বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। এইখানে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি ছিল মাদ্রাজ আর ফরাসীদের ছিল পণ্ডিচেরী। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ইউরোপের ও অন্যান্য অঞ্চলে অবিরাম যে যুদ্ধ চলিয়াছিল তাহারই এক অধ্যায় হইল ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া বিভিন্ন শক্তির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একে অপরের শত্রু ছিল। ফলে ইহার ঢেউ ভারতের কূলেও পৌঁছাইল। প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চল ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যের এই ঘটনার অনিবার্য প্রভাব আসিয়া পড়ে বাংলাদেশে এবং ইহার ফলও হয় সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীকালের ঘটনা হইতে পরিষ্কার হইয়া যায় যে, কর্ণাটকের যুদ্ধগুলি ছিল ভারতের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে প্রতিক্রিয়া

দাক্ষিণাত্যের শাসকবর্গের নৌবহর ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই দাক্ষিণাত্যে মুঘল বাদশাহের কর্তৃত্ব লুপ্ত হইয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের শাসনকর্তা নিজাম উল্-মুল্ক মুঘল কর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়া কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অঞ্চলে তাঁহার একাধিপত্য মারাঠা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। অন্যদিকে কর্ণাটকেও এক স্বাধীন নবাবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। নিজাম উল্ মুল্ক যেমন মুঘল সার্বভৌমত্বের অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া বসিয়াছিলেন ঠিক তেমনি কর্ণাটকের নবাবও নিজামের ক্ষমতাকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন নরপতির মত শাসন করিতে শুরু করেন। মারাঠা লুণ্ঠন ও উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া কর্ণাটকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলারও সূচনা হইয়াছিল।

কর্ণাটকের রাজনৈতিক অবস্থা

মারাঠা ও উত্তর ভারতের রাজনীতি লইয়া নিজাম এতই ব্যস্ত ছিলেন যে কর্ণাটকের অবস্থার প্রতি তিনি নজর দিতে পারেন নাই। এই অবস্থার সুযোগে ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানী তাহাদের মধ্যে মামুলি সদ্ভাব রাখিয়া শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইয়া যাইতে-ছিল তাহা নয়, নিজ নিজ শক্তিবৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল।

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা কর্ণাটক লুণ্ঠন করিতে আসিয়া নবাব দোস্ত আলীকে হত্যা করে এবং তাঁহার জামাতা চাঁদা সাহেবকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। দোস্ত আলীর পুত্র সফদার আলী মারাঠাদের বার্ষিক কর দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজের প্রাণ ও রাজ্য কোনমতে রক্ষা করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে এক আত্মীয় কর্তৃক তিনি নিহত

হইলে তাঁহার শিশুপুত্রকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হইল। কর্ণাটকে এই জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে নিজাম শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপতের জন্য স্বয়ং কর্ণাটকে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে আনোয়ারউদ্দিন নামে এক অভিজ্ঞ কর্মচারীকে নবাব হিসাবে নিযুক্ত করেন। বলা বাহুল্য এই নিয়োগে পরিস্থিতি আরও জটিল হইল। ইহাতে ইংরেজ ও ফরাসীদের সুবিধা হয়। তাহারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কর্ণাটকের এই অবস্থাকে কাজে লাগায়।

উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া কর্ণাটকে গোলযোগ

প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৪৪-৪৭। ইউরোপে এই সময় ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ইহার ফলে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীরা পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই সময় ডুপ্লে ছিলেন পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা। তিনি ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য ধ্বংস করিয়া ফরাসী আধিপত্য স্থাপনে দৃঢ়-সঙ্কল্প ছিল। ইংরেজ নৌবাহিনী ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে পাণ্ডিচেরী আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ডুপ্লে মরিশাসের ফরাসী শাসনকর্তা লা বুর্দনের নিকটে সাহায্য চায়। লা বুর্দনে উপস্থিত হইলে ইংরেজ নৌবাহিনী পশ্চাদপসারণ করিল। ডুপ্লের আগ্রহাতিশয্যে লা বুর্দনে মাদ্রাজ অবরোধ করিলে ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ডুপ্লে আশা ও পরিকল্পনা সার্থকতার পথে অগ্রসর হইল।

ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের সূত্রপাত

আর্কটের নবাব এই নাটকীয় পরিস্থিতিতে নীরব দর্শক ছিলেন না। ইংরেজরা পাঁডচেরী আক্রমণে উদ্যত হইলে ডুপ্লে আনোয়ারউদ্দিনের সাহায্য প্রার্থনা করেন।



ডুপ্লে

নবাব ইংরেজদের পাণ্ডিচেরী পরিত্যাগের আদেশ দিলেন, কিন্তু ইংরেজরা ইহাতে কর্ণপাত করে নাই। মাদ্রাজ যখন অবরুদ্ধ হইল তখন ইংরেজরা আনোয়ারউদ্দিনের শরণাপন্ন হইলে তিনি ডুপ্লেকে অবরোধ তুলিয়া লইবার আদেশ দেন। ডুপ্লে ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। নবাবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি অবশ্য নবাবকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে মাদ্রাজ অধিকার করিয়া তিনি ইহা নবাবকেই দিবেন। কিন্তু ইহা পালনের ইচ্ছা ডুপ্লের ছিল না। ইতিমধ্যে ডুপ্লের সঙ্গে মতভেদের জন্য লা বুর্দনে মরিশাসে ফিরিয়া যান। ডুপ্লে ইংরেজ অধিকৃত সেণ্ট ডেভিডে দুর্গ অধিকার করিতে গিয়া ব্যর্থ হন। এদিকে কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দিন আশা করিয়াছিলেন ফরাসীরা মাদ্রাজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিবে। কিন্তু ডুপ্লে মাদ্রাজ হস্তচ্যুত করিতে রাজী না হওয়ায় আনোয়ারউদ্দিন সামরিক শক্তির সাহায্যে ইহা কাড়িয়া

লইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেণ্ট টোমের নিকট এক যুদ্ধে তাঁহার বিরাট সৈন্যদল মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যবাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। এই সময়ে ইংরেজরা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পণ্ডিচেরী আক্রমণ করিতে গিয়া ব্যর্থ হয়। এইভাবে সর্বত্র জয়লাভ করিয়া ডুপ্লে যখন ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তখন ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সন্ধি হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও যুদ্ধের অবসান হয়। ফরাসী সরকারের আদেশে ডুপ্লে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাদ্রাজ ইংরেজদের ফিরাইয়া দেন।

সেণ্ট টোমের যুদ্ধ

এই যুদ্ধে কোনপক্ষেরই লাভ হয় নাই এবং ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনরূপ সমাধানও হইল না। কেবলমাত্র ভারতের দেশীয় রাজাদের সামরিক দুর্বলতা ইংরেজ ও ফরাসীদের নিকট ধরা পড়ে। অল্পসংখ্যক ফরাসী সৈন্য লইয়া কর্ণাটকের নবাবের সৈন্যদলকে পরাজিত করায় ডুপ্লে খুব উৎসাহিত হইলেন এবং দেশীয় রাজাদের এই বিবাদে কোন না কোন পক্ষ লইয়া ফরাসী প্রভুত্ব স্থাপনের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

ফলাফল

দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ। শীঘ্রই ডুপ্লের সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। কর্ণাটকের নবাবী পদ লইয়া আগে হইতেই আনোয়ারউদ্দিন ও চাঁদা সাহেবের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। আবার ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম আসফ জার মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া তাঁহার দুই পুত্র নাসির জংগ-এর সহিত মুজাফ্ফর জংগ-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইল। এই গৃহ-বিবাদে ডুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসীরা মুজাফ্ফর জংগ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ লইয়া নাসির জংগ ও আনোয়ারউদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। আনোয়ারউদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলী কোনমতে ত্রিচিনপল্লী দুর্গে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইলেন। ফরাসী সৈন্য এবং চাঁদা সাহেবের পুত্র রাজাসাহেব ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিল। ইংরেজরা এতদিন নিশ্চেষ্ট ছিল। এখন তাহারা দেখিল যে ত্রিচিনপল্লী দুর্গের পতন হইলে দাক্ষিণাত্য হইতে ইংরেজ প্রভাব সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সে কারণে তাহারা নাসির জংগ ও মহম্মদ আলীর পক্ষ সমর্থন করিল এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

হায়দ্রাবাদে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গোলযোগ

ডুপ্লের হস্তক্ষেপ

ইংরেজদের যোগদান

এদিকে ডুপ্লে মুজাফ্ফর জংগকে হায়দ্রাবাদে নিজামের পদে স্থাপন করিলেন এবং হায়দ্রাবাদে সেনাপতি বুশির অধীনে একদল ফরাসী সৈন্যও মোতায়েন রাখিলেন। বিদ্রোহী সামন্তদের হাতে মুজাফ্ফর জংগ নিহত হন। এই অবস্থায় বুশী নিজাম উল্-মুল্ক্-এর তৃতীয় পুত্র সালাবৎ জংগকে হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে বসাইলেন। ফরাসী সৈন্যদের ভরণ-পোষণের জন্য নিজাম বুশীকে ইলোর, রাজমহেন্দ্রী, চিকাকোল ও মুস্তাফানগর এই চারিটি জেলা প্রদান করেন। এগুলি উত্তর সরকার প্রদেশ নামে খ্যাত হয়। চাঁদা সাহেব আগেই কর্ণাটকের সিংহাসন পাইয়াছিলেন। অতএব দেখা যায় যে যুদ্ধের

হায়দ্রাবাদে ফরাসী প্রাধান্য

কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান উন্নতিতে ইংল্যাণ্ডের অন্যান্য বণিকগোষ্ঠীও ঈর্ষান্বিত হয়। তাহারা এই লাভের ব্যবসা হইতে বঞ্চিত ছিল। তাহারা 'দি ইংলিশ কোম্পানী ট্রেডিং টু দি ইস্ট ইণ্ডিয়া' নামে আর একটি কোম্পানী গঠন করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উভয় কোম্পানীর মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। ফলে দুইটি কোম্পানীরই লোকসান হইতে থাকে। বহু কলহের পর দুইটি কোম্পানী সংযুক্ত হয় (১৭০৯ খ্রীঃ)। এই সম্মিলিত সংস্থাই পরাক্রান্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে পরিচিত।

দুইটি কোম্পনীর একীকরণ

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ ফাররুখশিয়ার ইংরেজদের আরও ৩৮টি গ্রাম ইজারা দেন। মুঘলদের কোষাগারে বার্ষিক ৩ হাজার টাকা নজরানা দিবার শর্তে ইংরেজদের পণ্য শুল্কমুক্ত করা হয়। তাহা ছাড়া দস্তক বা 'বিশেষ অনুমতি'র দ্বারা শুল্ক দফ্‌তর পরিদর্শন ছাড়াই ইংরেজদের পণ্যদ্রব্য চলাচলের সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

১৭১৭ সালের ফর্মান

কলিকাতা, ঢাকা, কাশিমবাজার ও বাংলার অন্যান্য কয়েকটি স্থানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিগুলির আশেপাশে তাঁতি-সম্প্রদায় নিজেদের বসতি গড়িয়া তোলে। একমাত্র কৃষ্ণনগরেই প্রায় আট হাজার তাঁতি কোম্পানীর জন্য বস্ত্র তৈয়ারী করিত। ইংরেজদের বাণিজ্য প্রসারে বাংলার নবাব খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের দ্রুত বৃদ্ধিতে তিনি শঙ্কিত হন। কিন্তু ইহার ফলে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত বাংলার নবাবের সংঘর্ষ অনিবার্য হইল।

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি

বাঙালি বণিক মহাজনদের দালাল হিসাবে ব্যবহার করিয়া কোম্পানী তাহার প্রয়োজনীয় পণ্য সোরা, রেশম, চিনি, আফিম, মশলা, সূতি ও রেশমী বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া লইত। এই সময় হইতেই কলিকাতা ইংরেজ কোম্পানীর কার্যকলাপের কেন্দ্র হইয়া উঠে। ফলে কোম্পানীর রপ্তানিতে বাংলার পণ্যের অংশভাগ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বাণিজ্যের প্রসার

মুর্শিদকুলি খাঁ ইংরেজ কোম্পানী ও তাহাদের কর্মচারীদের কাজকর্মের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন। অবশ্য তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত শত্রুতামূলক ব্যবহার করেন নাই। তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে ইংরেজ কোম্পানী কালক্রমে বাংলা জয় করিবে। এই অদূরদর্শিতা কেবলমাত্র তাঁহার ছিল না, পরবর্তী বাংলার নবাবদের প্রত্যেকেরই ছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁর নীতি

আলিবর্দী খাঁ (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রীঃ)। আলিবর্দী খাঁ শাসক হিসাবে যোগ্য ছিলেন। ইংরেজদের প্রতি প্রথমদিকে তাঁহার কোন বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল না। ইংরেজ কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিতে তিনি চাহেন নাই। তিনি মনে করিতেন বিদেশী কোম্পানীগুলি সংভাবে ব্যবসা করিলে তাঁহার রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে। তাঁহার শাসনকালে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে সংঘর্ষ দেখা দেয়। দাক্ষিণাত্যের দেখাদেখি ইংরেজ ও

নবাব আলিবর্দী খাঁর মনোভাব

ফরাসী কোম্পানী বাংলায় যাহাতে শান্তিভঙ্গ না করিতে পারে তাহার বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আলিবর্দী খাঁ অবশ্য কলিকাতার পাশে একটি বেষ্টনকারী দীর্ঘ খাল খনন করিতে ইংরেজদের অনুমতি দেন। উহা ছিল মারাঠা আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। পরে অবশ্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। ইংরেজ কোম্পানীর রাজনৈতিক কার্যকলাপে তিনি বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট ইংরেজরা কলিকাতায় দুর্গ সংস্কারের অনুমতি চাহিলে তিনি তাহা নামঞ্জুর করেন। কারণ দুর্গ সংস্কার করিবার পিছনে ইংরেজদের আসল মনোভাব তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার ঘোর দুর্দিন ঘনাইয়া আসিল।



আলিবর্দী খাঁ

সিরাজউদ্দৌলা। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হইলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজের ক্রোধের অনেকগুলি কারণ ছিল।



সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজের সহিত ইংরেজদের কলহের কারণ

এই কারণগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক। প্রথমত, তিনি যখন সিংহাসনে অভিষিক্ত হন তখন চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ইংরেজরা তাঁহাকে কোন উপহার পাঠায় নাই এবং অভিনন্দনও জানায় নাই। দ্বিতীয়ত, আলিবর্দীর জীবিতকালে একদিন সিরাজ ইংরেজদের কাশিমবাজারের কুটি এলাকায় প্রবেশ করিতে চাহিলে ইংরেজরা অনুমতি দেয় নাই। তৃতীয়ত, ইংরেজরা ভাবিয়াছিল যে সিরাজ বাংলার মসনদ হইতে খুব তাড়াতাড়ি বিতাড়িত হইবেন। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ইংরেজরা সিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী ঘসেটি বেগম আর পূর্ণিয়ার নবাব সৌকৎ জঙ্গকে সিরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। এমনকি ঘসেটি বেগমের দেওয়ান ও প্রিয়পাত্র রাজবল্লভের

প্রথমদিকে ডুপ্লে খুব সাফল্যলাভ করেন, কেননা উভয় রাজ্যেই তাঁহার মনোনীত প্রার্থী সিংহাসন লাভে সমর্থ হন।

ফরাসীদের বিস্ময়কর সাফল্যে ইংরেজরা যুগপৎ শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। ইংরেজরা সর্বশক্তি লইয়া ফরাসীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। এই সন্ধিক্ষণে ইংরেজদের ভাগ্যাকাশে রবার্ট ক্লাইভের আবির্ভাব ঘটে। ক্লাইভ মাদ্রাজের ইংরেজ শাসক সাণ্ডার্সকে বুঝাইলেন যে আর্কট আক্রমণ করিলে চাঁদা সাহেব ত্রিচিনপল্লী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে বাধ্য হইবে। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইলে তিনি বিদ্যুৎগতিতে আর্কট দখল করিয়া লন। চাঁদা সাহেব ও ফরাসীদের মিলিত বাহিনী আর্কট অবরোধ করিয়াও কিছু করিতে পারিল না ; বরঞ্চ চাঁদা সাহেব ও ফরাসীদের মিলিত সৈন্য ক্লাইভের নিকট পরাজিত হইল এবং চাঁদা সাহেব নিহত হইলেন। ১৭৫২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ মনোনীত প্রার্থী মহম্মদ আলী কর্ণাটকের সিংহাসনে বসিলেন এবং কর্ণাটকে ইংরেজের আধিপত্য স্থাপিত হইল। হায়দরাবাদে অবশ্য ফরাসী আধিপত্য কিছুদিনের জন্য টিকিয়া রহিল। ডুপ্লের কার্যকলাপ ফরাসী সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী কর্তৃপক্ষ গডেহু নামে এক ব্যক্তিকে পণ্ডীচেরীতে পাঠান। গডেহু ইংরেজদের সহিত সন্ধি করেন। এই সন্ধি অনুসারে ঠিক হয় উভয়পক্ষ ভারতীয় রাজন্যবর্গের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন অংশগ্রহণ করিবে না। এই চুক্তি অবশ্য কোন পক্ষই মানিয়া চলে নাই। ডুপ্লেকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হয়।

গডেহু চুক্তি

তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ। ডুপ্লের দেশে ফিরিয়া যাইবার পর ফরাসী শক্তির দ্রুত অধঃপতন ঘটিতে থাকে। ইংরেজদের সহিত মিটমাটের চেষ্টা হইল বটে কিন্তু স্থায়ী কোন চুক্তি সম্পাদিত হইল না। অস্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধান্তে আই-লা-স্যাপল সন্ধি কোন মৌলিক সমস্যারই সমাধান করিতে পারে নাই। এই সন্ধির পরও ভারতে ইংগ-ফরাসী ঔপনিবেশিক দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতে ছিল। এক সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান প্রয়োজন হইল ফলে দেখা দিল সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ)।

ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

অস্ট্রীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধে ফ্রান্স ইউরোপে নিজেকে আবদ্ধ রাখায় উপনিবেশের দিকে নজর দিতে পারে নাই। অপরদিকে ইংল্যাণ্ড উপনিবেশে ফ্রান্সকে চরম আঘাত হানিবার জন্য তৈয়ারী হইতে থাকে ; সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে যখন ফ্রান্সের সকল শক্তি নিয়োজিত হওয়া উচিত ছিল উপনিবেশে ও সমুদ্রবক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তখনই সে ইউরোপীয় যুদ্ধে নিজেকে জড়াইয়া ফেলে। ইংল্যাণ্ডের এই যুদ্ধে নীতি ছিল ফ্রান্সকে ইউরোপের মধ্যেই আবদ্ধ রাখা এবং সেই সুযোগে সামরিক শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ভারত সমেত অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে নিয়োজিত করিয়া ফ্রান্সকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করা। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপে যখন ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইল তখন এদেশে আবার ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং ফরাসী প্রভুত্বে স্বপ্ন

ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ

বিলীন হইয়া গেল। ইউরোপের যুদ্ধের সংবাদ ভারতে আসা মাত্র ক্লাইভ ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ করিয়া লন। অপরদিকে ফরাসী সেনাপতি কাউন্ট-ডি লালী দাক্ষিণাত্যে ইংজেদের সেণ্ট ডেভিড দুর্গ দখল করেন। ইহার পর মাদ্রাজ আক্রমণের উদ্দেশ্যে নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য হায়দ্রাবাদ হইতে বুশিকে লইয়া আসেন। বুশি চলিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজাম ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলেন। লালীর মাদ্রাজ অবরোধ ব্যর্থ হয়। ঠিক এই সময়ে পণ্ডিচেরীর নিকট নৌযুদ্ধে ফরাসী নৌবহর পরাজিত হইল। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা মসলিপট্টম আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণা, গঞ্জাম এবং ফরাসী অধিকৃত উত্তর সরকার (বর্তমান গুণ্টুর, গোদাবরী বিশাখাপত্তনম—অন্ধ্র রাজ্যের এই কয়টি জেলা) প্রদেশ দখল করে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি কর্ণেল আয়ার কূট বন্দীবাসের যুদ্ধে লালীকে পরাজিত ও বন্দী করেন। পণ্ডিচেরী ইংরেজদের হস্তগত হয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধির দ্বারা ইউরোপে শান্তি স্থাপিত হইল। ফরাসীরা চন্দননগর, পণ্ডিচেরী প্রভৃতি স্থান ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে তাহারা এই স্থানগুলি কেবল বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে ব্যবহার করিবে।

ইংরেজদের জয়

দাক্ষিণাত্যের প্রভুত্ব লইয়া ইংরেজ ও ফরাসীদের এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের ফলে ভারতে ফরাসীদের সাম্রাজ্য স্থাপনের সকল আশা নির্মূল হইয়া গেল। ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা তাহারা আর করে নাই। ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও উঠিয়া গেল। অপরদিকে ভারতে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি খুবই বৃদ্ধি পাইল এবং সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে ইংরেজ কোম্পানী দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। আর ফরাসীদের ইংরেজদের রক্ষণাধীন হইয়া ভারতে থাকিতে হইল। ভারতীয় রাজাদের অধীনে চাকরীরত থাকিয়া বিক্ষিপ্ত ফরাসী সৈন্যরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধরত থাকিয়াছিল। কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত সাফল্য সত্ত্বেও এইসব সৈন্যরা ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের কোনই রদবদল ঘটাইতে পারে নাই।

যুদ্ধের ফলাফল

ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ; ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তুলনায় ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল অনেক দুর্বল। ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মত স্বাধীন বাণিজ্য সংঘ ছিল না, ছিল ফরাসী সরকারের একটি বিভাগ। তখনকার ফ্রান্সের অন্যান্য সরকারী বিভাগের মত ফরাসী কোম্পানীটির শাসনব্যবস্থায়ও দক্ষতা ও শৃঙ্খলার বিশেষ অভাব ছিল। যেসব সরকারী কর্মচারীরা কোনরকমে ফরাসী কর্তৃপক্ষের অসন্তোষের উদ্রেক করিত তাহাদের লা বুর্দনে বা লালির মত কঠোর শাস্তি পাইতে হইত। সেই কারণে ভারতস্থিত ফরাসী কর্মচারীদের মধ্যে ক্লাইভের মত উদ্যোগী ব্যক্তির একান্ত অভাব দেখা যায়।

ফরাসী কোম্পানীর দুর্বলতা।

বাণিজ্যিক দিক হইতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ফরাসী কোম্পানীর অপেক্ষা ছিল অনেক বেশী সমৃদ্ধ। ইংরেজরা কখনোই ভুলিয়া যায় নাই তাহাদের কোম্পানী মূলত

একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। তাই এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিবার সময়েও তাহারা বাণিজ্যিক স্বার্থ কখনও অবহেলা করে নাই। অন্যপক্ষে এদেশে আসিয়া ফরাসী কোম্পানী ক্রমশই

ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর্থিক দুর্বলতা

ব্যবসা-বাণিজ্যকে অবহেলা করিতে থাকে। ডুপ্লে ভারতে ফরাসী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হইয়া রাজ্যজয় ও ভৌমিক অধিকার বিস্তারেই মন দিয়াছিলেন। ইহার ফলে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই কোম্পানীর আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় আর্থিক দিক হইতে ফরাসী সরকারের পক্ষে একটা বড় বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। তখন ইউরোপ ও আমেরিকায় ফরাসী সরকার যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় ডুপ্লের পরিকল্পনাকে সক্রিয় সমর্থন জানাইতে পারে নাই। ব্রিটেন ফ্রান্সের তুলনায় ইউরোপীয় রাজনীতির জটিলতা হইতে অনেক বেশী মুক্ত ছিল।

ভারতে ফরাসীদের উপযুক্ত সামরিক ঘাঁটির অভাব ছিল। অন্যপক্ষে বাংলাদেশ

উপযুক্ত সামরিক ঘাঁটির অভাব

ইংরেজদের এক্তিয়ারে থাকায় তাহাদের যে সকল আর্থিক দিক হইতে দারুণ সুবিধা হইয়াছিল তাহা নয়, সামরিক ঘাঁটি হিসাবেও তাহারা বাংলাদেশকে ব্যবহার করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। অন্যপক্ষে সরবরাহ ঘাঁটির দূরত্ব ফ্রান্সের পরাজয়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ।

ভারতে ফরাসী শক্তির পতনের মূল কারণ সমুদ্রবক্ষে আধিপত্য হ্রাস। সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব হারাইবার ফলে নৌ-শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধে ফরাসীদের

ফরাসী নৌ-শক্তির দুর্বলতা

পরাজয় ছিল অনিবার্য। ইংরেজ নৌ-বাহিনীর তৎপরতার ফলে ভারতস্থিত ফরাসীরা ফ্রান্স ও তাহাদের একটি প্রধান নৌ-ঘাঁটি মরিশাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ফলে খাদ্য বা সমরোপকরণ পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। ফরাসীদের এই বিচ্ছিন্নতা পণ্ডিচেরীর পতনেরও একটি প্রধান কারণ।

ফরাসীদের দুর্বলতার আর একটি বড় করণ, অনেক সময়ই তাহারা ভারতীয় রাজাদের সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিত। ইংরাজদের মধ্যে এই ধরনের নির্ভরতা

ভারতীয় রাজাদের উপর নির্ভরশীলতা

দেখা যায় না। এই নীতি সময়বিশেষে যে কত মারাত্মক হইতে পারে তাহার একটি উদাহরণ, হায়দার আলি ফরাসীদের সাহায্য করিয়া এক সঙ্কট মুহূর্তে ফরাসী বাহিনী হইতে নিজের সৈন্যদের ফিরাইয়া লইতে বাধ্য হন।

ইংরেজ পক্ষের স্যাণ্ডার্স, আয়ার কূট, রবার্ট ক্লাইভ প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা হইতে পারে এমন কর্মচারী বা সেনাপতি ফরাসী পক্ষে ছিল মুষ্টিমেয়। বুসী, মার্ত্যাঁ, ডুপ্লে আর

ফরাসী কর্মচারী ও সেনানায়কদের দুর্বলতা

সুফ্রঁ-এর মত সেনাপতি ফরাসী পক্ষে বেশি দেখা যায় নাই। ফলে বহু কারণে ফরাসী শক্তির অবনতি ঘটে। ফরাসীদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে ঐতিহাসক ভিনসেণ্ট স্মিথ মন্তব্য করেন, "গঠন পদ্ধতিতে, উদ্যোগে, প্রতিভায় এবং সম্পদে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উহার ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী

অপেক্ষা বহু পরিমাণেই নিকৃষ্ট ছিল। যে সরকার সমুদ্রপথ এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করিবে তাহার বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জনের কোন সম্ভাবনা বুশি এবং ডুপ্লের পক্ষে একক অথবা যৌথভাবে করা সম্ভব ছিল না। ফরাসী ব্যর্থতার জন্যে ডুপ্লে, লালী অথবা অন্যান্য কর্মচারীদের ব্যক্তিগত দুর্বলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা নিরর্থক। পণ্ডিচেরীকে কেন্দ্র করিয়া সেখান হইতে অগ্রসর হইয়া বাংলা দখলকারী ও সমুদ্র আধিপত্যকারী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়নের পক্ষেও ভারত জয় করা সম্ভব হইত না।"

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলার উন্নত অবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে উন্নত অঞ্চলগুলির অন্যতম হিসাবে গণ্য হইত। মুঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া রাজদরবারে ওমরাহদের মধ্যে যে দলাদলি ছিল তাহাতে বাংলা জড়িত ছিল না। বাংলার বস্ত্রশিল্পই ছিল সম্পদের ভিত্তি। এখানকার কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে কৃষিপণ্য উৎপন্ন করিত।

বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা বৃদ্ধি

ঔরংজেব যখন মুঘল সম্রাট সেই সময় ইংরেজ কোম্পানী মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছিল। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড হইতে সৈন্যসহ কয়েকটি জাহাজ ভারতে আনা হয়। ইহার মধ্যে তিনখানি জাহাজ বাংলায় উপস্থিত হইয়া হুগলী আক্রমণ করিয়া শহরের অনেক অংশ পোড়াইয়া দেয়। ইহাতে ঔরংজেব খুবই ক্রুদ্ধ হন। তিনি মুঘল সাম্রাজ্য হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করিবার জন্য নির্দেশ দেন। ফলে ইংরেজ কোম্পানী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। শেষ পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানী সম্রাটের নিকট নতি স্বীকার করে এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। ঔরংজেব তাহাদের মার্জনা করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ দেন। সম্রাটের সহিত বিরোধিতায় লিপ্ত হইবার জন্য বাংলায় নূতন কুঠি নির্মাণ করা ইরেজদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার ইংরেজ কুঠিসমূহের অধ্যক্ষ জব চার্নক গোবিন্দপুর মৌজায় কোম্পানীর কুঠি নির্মাণ করেন। ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার নূতন সুবাদার আজিম-উস্-সানকে ১৬০০০ টাকা উপঢৌকন দিয়া সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি মৌজার মালিক জমিদারদের নিকট হইতে কিনিবার অনুমতি পান। ইহার পর তিনি মাত্র এক হাজার তিন শত টাকায় এই তিনটি স্থান ক্রয় করেন। ইতিমধ্যে শোভা সিং নামক এক জমিদার বিদ্রোহী হইলে ইংরেজরা নিরাপত্তার জন্য এখানে দুর্গ নির্মাণেরও অনুমতি পায়। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে এই সুরক্ষিত দুর্গ ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে ফোর্ট উইলিয়ম নামে পরিচিত হয়।

পুত্র কৃষ্ণদাসকে তাহারা আশ্রয় দেয়। অথচ কৃষ্ণদাস তখন ছিলেন নবাবের বিচারাধীন। নবাব তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বলা সত্ত্বেও ইংরেজরা কৃষ্ণদাসকে নিজেদের আশ্রয়ে রাখিয়া দেয়। চতুর্থত, ফরাসী ভীতির অজুহাতে ইংরেজরা নবাবের অনুমতি না লইয়াই কলিকাতায় নূতনভাবে দুর্গ সুরক্ষিত ও কলিকাতার উত্তরের খাল অঞ্চল সুগঠিত করিতে থাকে। সিরাজ ইহা বন্ধ করিতে আদেশ দেন। কিন্তু ইংরেজরা তাঁহার আদেশ অমান্য করে। ফলে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

সিরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করেন এবং সসৈন্যে কলিকাতা যাত্রা করেন। তিনি কলকাতায় উপস্থিত হইয়া দুর্গ অবরোধ করিলে ইংরেজ অধ্যক্ষ ড্রেক অধিকাংশ ইংরেজ নরনারীদের লইয়া ফলতায় পলাইয়া যান। সিরাজ কলিকাতা অধিকার করিয়া মুর্শিদাবাদ ফিরিয়া আসেন। এই কলিকাতা অধিকারের সহিত অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী জড়িত। হলওয়েলের বৃত্তান্তে জানা যায় যে, একটি অল্পপরিসর কক্ষে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে ১২৩ জনের মৃত্যু হয়।

কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার

হলওয়েল-এর এই কাহিনী আধুনিক ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনে করেন ভারতীয় চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের জন্য এই কাহিনী তৈয়ারী করা হইয়াছিল। কলিকাতা পতনের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছাইলে সেখান হইতে ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে কলিকাতা উদ্ধারের জন্য পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে সিরাজ মনিহারির যুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সৌকৎ জঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছান। তিনি আশা করিতেছিলেন যে ইহার পর ইংরেজরা তাঁহার বিরোধিতা করিতে সাহসী হইবে না। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এই ভুল ভাঙিল। ইংরেজরা সহজেই কলিকাতা পুনরধিকার করিল। সিরাজ পুনরায় সসৈন্যে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী তিনি কলিকাতার সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইভ প্রথম সিরাজকে আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে কেহই প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিতে পারিলেন না। অবশেষে নবাব ও ইংরেজ পক্ষের মধ্যে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধি দ্বারা ইংরেজ কোম্পানী পূর্বেকার সুযোগ-সুবিধাগুলি ফিরিয়া পাইল এবং কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণের অধিকারও লাভ করিল।

অন্ধকূপ হত্যা কাহিনী

আলিনগরের সন্ধি



লর্ডক্লাইভ

ইতিমধ্যে ইউরোপে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধের ঢেউ ভারতে আসিয়া পৌঁছায়। ইংরেজরা বাংলা হইতে ফরাসীদের উচ্ছেদ করিতে চাহিল। ফরাসীরা যাহাতে ইংরেজের বিরুদ্ধে নবাবকে

সাহায্য করিতে না পারে তাহার জন্যই ফরাসী শক্তি ধ্বংস করা প্রয়োজন ছিল। ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজরা বাংলাদেশে ফরাসী ঘাঁটি চন্দননগর আক্রমণ করিল। ফলে চন্দননগরের পতন ঘটিল। এইভাবে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ কোম্পানী নবাবের সহিত শক্তি পরীক্ষায় উদ্যত হইল। এমনকি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে মনস্থ করিল। অবশ্য ইংরেজরা নবাবের সহিত সরাসরি যুদ্ধ অপেক্ষা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়া এই কাজ সম্পন্ন করিতে চাহিল। ঠিক এই সময় সিরাজের প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন কারণে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সহিত ইংরেজদের যোগাযোগ ঘটিল। ইংরেজদের পক্ষ হইতে ক্লাইভ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন মিরজাফরের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর একটি গুপ্ত সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহাতে ঠিক হইল সিরাজের বদলে

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র



ইংরাজদের সহিত মীরজাফরের ষড়যন্ত্র। (প্রাচীন চিত্র হইতে)

মীরজাফর নবাব হইবেন। এ ব্যাপারে ইংরেজ কোম্পানী সৈন্য দ্বারা মীরজাফরকে সিরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে। পরিবর্তে ইংরেজ কোম্পানী মীরজাফরের নিকট হইতে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা পাইবে।

পলাশীর যুদ্ধ। ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হইলে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন। নবাব সংবাদ পাইয়া তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনী

লইয়া অগ্রসর হইলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে পলাশী নামক গ্রামে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয় (২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। মোহনলাল ও মীরমদন প্রাণপণে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিলেন। মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায়দুর্লভের সৈন্য নিশ্চল হইয়া রহিল। তাহা সত্ত্বেও ইংরেজ সৈন্য পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইত না, যদি সিরাজ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের পরামর্শে যুদ্ধ বন্ধ না করিতেন। বীর মোহনলাল নবাবের কথায় যখন সংগ্রাম হইতে নিরস্ত হইলেন তখন ইংরেজেরা আক্রমণ শুরু করে এবং নবাবের বিভ্রান্ত সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। যেখানে পরাজয়ের সমূহ সম্ভাবনা সেখানেই ইংরেজরা জয়ী হইল। সিরাজ প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইত পলায়ন করিলেন। পরাজিত সিরাজ ধৃত ও নিহত হন।

মীরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতা : সিরাজের পরাজয়

পলাশীর যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় ও যুগান্তকারী ঘটনা। পলাশীর যুদ্ধের সামরিক ঔজ্জ্বল্য ছিল না একেবারেই। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে মাত্র ২৩ জন, নবাব পক্ষে ৫০৩ জন লোক প্রাণ হারায়। কিন্তু ফলাফলের দিক হইতে পলাশীর যুদ্ধ পৃথিবীর অনেক বড় বড় যুদ্ধের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজরা অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এই যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পলাশী যুদ্ধের ফলাফল

ক্লাইভ মীরজাফরকে বাঙলার নবাবরূপে স্বীকৃতি দিলেন। পরিবর্তে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরের নিকট হইতে চব্বিশ পরগণার জমিদারী লাভ করিল। এইভাবে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের পরোক্ষ সূচনা ঘটে।

ভৌমিক অধিকার লাভ

আর্থিক দিক হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এই কোম্পানী মীরজাফরের নিকট হইতে বিপুল পরিমাণ অর্থ পায়। ফলে আর্থিক দিক হইতে ইংরেজ কোম্পানী যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠে।

আর্থিক সুযোগ-সুবিধা

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল মূলতঃ একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। কাজেই পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কোম্পানী অনেক বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধাও আদায় করে। এই সময়ে এ দেশের ইংরেজদের বাণিজ্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠে।

বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা

পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইবার ফলে ইংরেজ কোম্পানী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনেকগুলি রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পায়। পলাশীর যুদ্ধে জয় ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের সূচনা করে। কৃষিজ দ্রব্য ও পণ্যদ্রব্য এই দুইটির উৎপাদনে বাঙলা ছিল তখনকার দিনে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ। বাঙলার সম্পদের সাহায্যেই ইংরেজরা দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের সহজেই পরাজিত করিতে সমর্থ হয়।

রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা

পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইবার ফলে ইংরেজ বণিক কোম্পানীর মানদণ্ড ধীরে ধীরে

রাজদণ্ডে পরিণত হইতে থাকে। প্রথমে বাঙলা এবং পরে সমগ্র ভারতেই ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্বে ইহারা ছিল এ দেশীয় শাসকদের অনুগ্রহ প্রত্যাশী। কিন্তু পলাশী বিজয়ের পর হইতে ধীরে ধীরে তাহারা এ দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে। দেশীয় রাজারা তাহাদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়।

প্রত্যক্ষ ও স্থায়ী ফলাফলের কথা বিবেচনা করিলে পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় যুগান্তকারী যুদ্ধ বিশ্বের ইতিহাসে বেশি ঘটে নাই। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইংরেজরা বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার কর্তৃত্ব হস্তগত করে। এই যুদ্ধ ইংরেজকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিতে সাহায্য করে। এই যুদ্ধই ইংরেজদের উত্তমাশা অন্তরীপ, মরিশাস ও মিশরে অধিকার স্থাপনে উৎসাহ দেয়। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত তাহার প্রতিভা স্ফুরণে যোগ্য পরিবেশের সন্ধান পায়, আর ব্রিটিশ অভিজাতরা তাহাদের প্রশাসনিক দক্ষতা দেখাইবার সুযোগ লাভ করে। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের পথ সুগম হয়। অপরদিকে আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে পলাশীর যুদ্ধে ভারতে মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূত্রপাত ঘটে। শুষ্ক মৃতপ্রায় অধঃপতিত মুঘল শাসনের পরিবর্তে ইউরোপের ভাবোজ্জ্বল সভ্যতার বীজ রোপিত হয়।

পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব

মীরজাফর। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ-সাহায্যপুষ্ট মীরজাফর নবাব হইলেন। ১৭৫৭ হইতে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নবাবী বর্তমান ছিল। তিনি নামেমাত্র নবাব ছিলেন, শাসনক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের হাতে চলিয়া যায়। এই সময় হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়, যদিও তাহারা আক্ষরিক অর্থে কোন শক্তির অধিকারী ছিল না। সর্ববিষয়ে ইংরেজদের কর্তৃত্বে বিরক্ত হইয়া মীরজাফর তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে স্থানীয় ডাচদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। ক্লাইভ বেদারার যুদ্ধে ডাচদের পরাজিত করেন। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ইংরেজদের সহিত নবাবের জামাতা মীরকাশিমের এক গোপন চুক্তি হয়। এই চুক্তি দ্বারা বাঙলার মসনদের বিনিময়ে মীরকাশিম বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রামের রাজস্ব কোম্পানীকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। মীরজাফরকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইল। বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে মীরকাশিম বাঙলার নবাব হইলেন।

মীরজাফরের পদচ্যুতি

মীরকাশিম। মীরকাশিম তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা নবাব ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করিয়া ইংরেজদের দৃষ্টি হইতে নিজ কার্যকলাপ গোপন রাখেন। তিনি মুঙ্গের দুর্গ নির্মাণ ও কামানের কারখানা স্থাপন করেন ও ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে নিজ সৈন্যদের সুশিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার এইসব কার্যকলাপে ইংরেজরা অসন্তুষ্ট হইল। তাহারা মীরকাশিমকে নবাব করিয়াছিল এই আশায় যে, তিনি মীরজাফর অপেক্ষা বেশী করিয়া ইংরেজদের অনুগত হইবেন। শীঘ্রই তাঁহার সহিত

ইংরেজ-মীরকাশিম বিরোধের কারণ

ইংরেজদের বিরোধ দেখা দিল। অভ্যন্তরীণ শুল্ক-সংক্রান্ত বিষয়ে এই বিরোধের সৃষ্টি হয়। সম্রাট-প্রদত্ত অধিকারবলে ইংরেজ কোম্পানী বাঙলায় বিনাশুল্কে ব্যবসা করিবার অধিকার পাইয়াছিল। ইহাকে 'দস্তক' বলা হইত। কিন্তু কোম্পানীর অসাধু কর্মচারীরা ইহার অপব্যবহার করিত। তিনি প্রথমে এই বিষয়ে কোম্পানীর নিকট প্রতিবাদ করেন। কোম্পানী তাঁহার প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করিল না। তখন তিনি শুল্কভারে পীড়িত দেশীয় বণিকদের উপর হইতে শুল্ক তুলিয়া দিয়া তাহাদের ইংরেজ বণিকদের সহিত সমান সুযোগ দিলেন। পাটনা কুঠির ইংরেজ অধ্যক্ষ এলিস ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া পাটনা অধিকার করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজরা মীরকাশিমকে গদিচ্যুত করিয়া পুনরায় মীরজাফরকে নবাব পদে স্থাপন করে (১৭৬৩ খ্রীঃ)। মীরকাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।


মীরকাশিম

কিন্তু মীরকাশিম কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হন। তিনি অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল বাদশাহ্ শাহ্-আলম তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বিহারের বক্সার নামক স্থানে তিন শক্তির মিলিত সৈন্যবাহিনী মেজর মুনরো পরিচালিত ইংরেজ বাহিনীর নিকট পরাজিত হইল। অযোধ্যার নবাব এবং মুঘল বাদশাহ্ পরাজিত হইয়াই ইংরেজদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন।

বক্সারের যুদ্ধ

বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। মীরকাশিমের বদলে পুনরায় মীরজাফর বাংলার নামেমাত্র নবাব হইলেন। ইংরেজরাই বাংলার সর্বেসর্বা হইল। মীরকাশিম শাসনব্যবস্থায় ও শুল্কের ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন আনিয়াছিলেন সেগুলি বাতিল করিয়া দেওয়া হইল।

বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল

এই যুদ্ধের ফলে অযোধ্যার নবাবের দুর্বলতা প্রকাশ পাইল। দিল্লীর বাদশাহ্ ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হইলেন। এই যুদ্ধের ফলে কেবলমাত্র বাংলাতেই ইংরেজ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল না, উত্তর ভারতে ইংরেজ শক্তি সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

গুরুত্বের দিক দিয়া বক্সারের যুদ্ধকে পলাশীর যুদ্ধের পরিপূরক বলা হইয়া থাকে। বক্সারের জয়লাভের ফলে ভারতে ইংরেজ শক্তি সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। এই যুদ্ধ

কেবলমাত্র বাংলাতেই ইংরেজ শক্তি সর্বেসর্বা হইল না ; এই যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের শক্তি এরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল যে ভারতে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে আর যুদ্ধ করিতে হইল না। ইহার পর তাহারা যে সব যুদ্ধ করিয়াছিল সেগুলি অধিকাংশই ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য।

বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব

পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা যে সব অধিকার পাইয়াছিল বক্সারে জয়লাভে সেই সব অধিকারের বৈধতা স্বীকৃত হইল। এই যুদ্ধের ফলে দিল্লীর বাদশাহ্ ইংরেজদের অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন। উত্তর ভারতের রাজনীতিতে ইংরেজরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হইল।

যুদ্ধের দিক দিয়া বক্সারের যুদ্ধকে আসল যুদ্ধ বলা হয়। পলাশীর যুদ্ধ ঠিক যুদ্ধ ছিল না। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের প্রকৃত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং প্রায় এক হাজার সৈনিক নিহত বা আহত হইয়াছিল। অপরদিকে ষড়যন্ত্র পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয়ী করে। পলাশীর যুদ্ধের পর কেহ কেহ আশা করিয়াছিল যে হয়তো সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে ইংরেজকে পরাজিত করা যাইবে, কিন্তু বক্সারের পর সে আশা একেবারে নির্বাপিত হইল। এদিক হইতে দেখিলে পলাশীর যুদ্ধের চরম পরিণতি হিসাবে বক্সারের যুদ্ধকে গণ্য করা যায়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানী যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল বক্সারের যুদ্ধের পর তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বাংলা ও বিহারের উপর ইংরেজ প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা তথা ভারতে কোম্পানীর সার্বভৌমত্বের পথ সুগম হয় এবং ভারতীয় জনগণ এবং রাজন্যবর্গের নিকট কোম্পানীর সম্মান খুব বৃদ্ধি পায়। পলাশীর যুদ্ধ যদি বাংলার উপর ইংরেজ প্রভুত্বের সূত্রপাত বলিয়া মনে করা হয় তাহা হইলে বক্সারের যুদ্ধকে পলাশীর যুদ্ধের পরিপূরক হিসাবে গণ্য করা যায়।

পলাশী ও বক্সার

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর মুঘল সম্রাট শাহ্ আমলের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় অধিকার (দেওয়ানি) লাভের পর হইতে এই অঞ্চলে কোম্পানীর প্রভুত্ব আইনসঙ্গতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলা সুবায় সর্বেসর্বা হইল ইংরেজ কোম্পানী। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে আসিলেও এইভাবে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হিসাবে দেখা ছিল।

দেওয়ানি লাভ

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে মূলতঃ ব্যবসা করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে যে অনৈক্য, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয় তাহার পূর্ণ সুযোগ লইয়া ইংরেজ কোম্পানী ধীরে ধীরে সকলের অলক্ষ্যে নিজেদের শক্তিশালী করিয়া তোলে। প্রথমদিকে ইংরেজরা ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ

করে নাই। কিন্তু ফরাসীরা যখন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদে প্রভাব স্থাপন করিল তখন ইংরেজরাও ফরাসী প্রভাবকে বাধা দিবার জন্য ফরাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিল। ইহার ফলে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজরা তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। ইতিমধ্যে পলাশীর যুদ্ধের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর ইংরেজরা এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টায় থাকিল। তাহাদের সর্বপ্রথম সুযোগ আসিল বক্সারের যুদ্ধের পর। অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর বাদশাহ বিজয়ী ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভারতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ

দেওয়ানী লাভের পর (১৭৬৫ খ্রীঃ) হইতেই ভারতীয় রাজ্যগুলির সহিত কোম্পানির সম্পর্ক শুরু হয়। ১৭৬৫ হইতে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর সহিত ভারতীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই যুগে ইংরেজ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মহীশূর, মারাঠা ও আফগান শক্তি। ইহাদের আক্রমণের হাত হইতে ইংরেজ শাসিত অঞ্চলকে রক্ষা করিবার জন্য কয়েকটি ভারতীয় রাজ্যকে মধ্যবর্তী রাজ্য হিসাবে ইংরেজরা ব্যবহার করে। মহীশূর ও মারাঠাদের ক্ষমতা ধ্বংস হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী ভারতীয় রাজ্যগুলির সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন লইয়া আসিল। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে কোনটিই আর স্বাধীন রহিল না। তাহারা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ কোম্পানীর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল।

ভারতীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার খুব সহজে ঘটে নাই। দক্ষিণ ভারতে এবং বাংলায় আধিপত্য স্থাপনের ক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানীকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের শত্রু ছিল ফরাসীরা। ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল এবং এই দ্বন্দ্বের লক্ষ্য ছিল ভারতে কে আধিপত্য করিবে। পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইবার পর সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ইংরেজদের প্রায় একশত বৎসর লাগিয়াছিল। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের (১৮৪৯ খ্রীঃ) অবসানে ইংরেজরা ভারতে সর্বশক্তিমান হয়। এই সময়ের মধ্যে এক একটি রাজ্য দখল করিয়া সেখানে ইংরেজরা নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। কোন কোন দেশীয় নৃপতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলে একত্রিত হইয়া ইংরেজ-বিরোধী জোট তাঁহারা গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সদ্ভাব না থাকায় ইংরেজদের সুবিধা হয়। সমগ্র ভারতের স্বার্থের দিকে দেশীয় নৃপতিরা নজর না দিয়া নিজ নিজ রাজ্য ও বংশের গৌরব বৃদ্ধি বা শক্তিবৃদ্ধির দিকেই মনোযোগী ছিলেন।

সাম্রাজ্য প্রসারে দীর্ঘ সময় লাগিবার কারণ

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইংরেজদের অনুকূলে ছিল না। হায়দর আলির অধীনে মহীশূর-মারাঠা রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং হায়দ্রাবাদ ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মত ক্ষমতা রাখিত। ইহারা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজদের বিরোধিতা করিতে পারিত তাহা হইলে ইংরেজদের পক্ষে দক্ষিণ ভারতে টিকিয়া

থাকা সম্ভব হইত না। কিন্তু এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ লাগিয়াই ছিল। ফলে এগুলিকে পরাজিত করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

সমগ্র ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বা শাসনের অন্তর্ভুক্ত করিবার পিছনে সুনির্দিষ্ট নীতি বা উদ্দেশ্য কাজ করিয়াছিল। প্রথমত, ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে কলকারখানার জন্য প্রয়োজন ছিল কাঁচামালের। ভারতবর্ষ ছিল কৃষিপ্রধান দেশ। অতএব সমগ্র ভারতবর্ষ যদি ব্রিটিশ শাসনের আওতায় আসে তাহা হইলে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সুবিধা হইবে। দ্বিতীয়ত, ভারত হইল জনবহুল দেশ। ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার হিসাবে ইহার মূল্য ছিল অসীম। ইংরেজ কোম্পানী এ কারণে সমগ্র ভারতে নিয়ন্ত্রিত ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্তন করিয়া ভারতে অর্থনৈতিক শোষণের পথ সুগম করিতে চাহিল। তৃতীয়ত, প্রথমে ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হইত। ইহা যখন প্রায় নিঃশেষিত হইল তখন ইংরেজরা কৃষকদের নিকট হইতে সংগৃহীত ভূমি-রাজস্ব হইতে স্বদেশে অর্থ পাঠাইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে যুগে ভূমি-রাজস্ব ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের আয়ের প্রধান উৎস।

ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ব্রিটিশ নীতি

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে কয়েকজন গভর্নর জেনারেলের অসাধারণ সাহস, ধৈর্য, প্রচণ্ড কর্মশক্তি, উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেসলী, লর্ড ময়রা, লর্ড অকল্যান্ড, লর্ড হার্ডিঞ্জ ও লর্ড ডালহৌসীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের শাসনকালেই শক্তিশালী ভারতীয় রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা হরণ করা হয় এবং তাঁহাদের রাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে যে সব রাজ্য টিকিয়া থাকে তাহাদের কাহারও পক্ষেই ইংরেজদের বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা ছিল না।

কয়েকজন বড়লাটের অবদান

ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ শক্তির অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান বাধাস্বরূপ ছিল মারাঠা জাতি। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মারাঠারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া পুনরায় পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। দিল্লীর বাদশাহকে হাতের পুতুলে পরিণত করিয়া সমগ্র ভারতে আধিপত্য স্থাপন ছিল মারাঠাদের লক্ষ্য। স্বভাবতই ইংরেজরা ইহাতে শঙ্কিত হইল। ইতি-মধ্যে মারাঠা রাজ্যে পেশোয়া পদ লইয়া অভ্যন্তরীণ বিবাদ শুরু হইল। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে পেশোয়া মাধব রাও মারা যান। তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথ রাও-এর চক্রান্তে তিনি নিহত হন। রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা নিজেকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু মারাঠা নেতা ফড়নবীশ ইহার বিরোধিতা করেন। তিনি নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্রকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

মারাঠাদের শক্তি বৃদ্ধি

অভ্যন্তরীণ বিবাদ ও ইংরেজদের হস্তক্ষেপ

অধিকাংশ মারাঠা নেতা এ বিষয়ে তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। ফলে পেশোয়া পদ হইতে রঘুনাথ বিতাড়িত হইলেন। রঘুনাথ কিন্তু এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিলেন না। পেশোয়া পদ পাইবার জন্য তিনি বোম্বাই-এর ইংরেজ কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হইলেন। ইংরেজরা রঘুনাথের সহিত একটি সন্ধি স্বাক্ষর করিল। ইহাকে সুরাটের সন্ধি (১৭৭৬ খ্রীঃ) বলা হয়। এই সন্ধির দ্বারা ঠিক হইল রঘুনাথ ইংরেজ কোম্পানীকে সলসেট দ্বীপ ও বেসিন বন্দর দিবেন। ইহার বদলে ইংরেজ কোম্পানী তাঁহাকে পেশোয়া বলিয়া স্বীকার করিল। কিন্তু হেস্টিংস-এর নেতৃত্বে কলিকাতা কাউন্সিল সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিলেন না। কলিকাতা হইতে কর্নেল আপটন নামে এক ইংরেজকে মারাঠাদের সঙ্গে নূতন সন্ধি করিবার জন্য পাঠানো হইল। রঘুনাথ রাও-এর বদলে নারায়ণ রাও-এর নাবালক পুত্র মাধব রাও নারায়ণ পেশোয়া হন। ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে **পুরন্দরের সন্ধি** নামে এক নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ সুরাটের সন্ধিই গ্রহণযোগ্য বলিয়া অনুমোদন করেন।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ। সুরাটের সন্ধির সংবাদে মারাঠারা ইংরেজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। তাহারা ইংরেজদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। এই উদ্দেশ্য হইল গৃহবিবাদের সুযোগ লইয়া ইংরেজ আধিপত্য স্থাপন করা। ফলে তাহারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইংরেজ সৈন্য রঘুনাথের সমর্থনে পুণার দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু এই সৈন্যদল তলগাঁও-এর যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তাহারা সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। এই সন্ধিতে ইংরেজ কোম্পানী মারাঠাদের যে সকল অঞ্চল জয় করিয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিল এবং রঘুনাথ রাওকে মারাঠাদের হাতে অর্পণ করিল। এই সন্ধির ফলে ইংরেজ কোম্পানীর সম্মান ও প্রতিপত্তি ভূলুণ্ঠিত হয়। হেস্টিংস এই অপমানজনক সন্ধি মানিলেন না। অতএব যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এই সময় মারাঠা, হায়দর আলি ও নিজামের মধ্যে যে ইংরেজ-বিরোধী শক্তিজোট গঠিত হয়, হেস্টিংস কূটনীতি ও সামরিক তৎপরতার সাহায্যে তাহা ভাঙিয়া দেন। কোন পক্ষই কিন্তু এই যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করিতে পারিল না। এই সময় অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মারাঠা নেতা মহাদাজী সিন্ধিয়া ইংরেজদের সহিত মৈত্রী স্থাপনে সচেষ্ট হন। ফলে উভয় পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ করিতে সম্মত হইল। ফলে সলবই-এর সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই

সলবই-এর সন্ধি

সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মাধব রাও-এর বার্ষিক ভাতা ঠিক হইল। ইংরেজরা সলসেট দ্বীপ পাইল। সলবই-এর সন্ধিতে মারাঠাদের শক্তি প্রমাণিত হয়। ইংরেজরা প্রায় কুড়ি বৎসর মারাঠাদের ঘাঁটাইতে সাহসী হইল না। মারাঠারাও ইংরেজদের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হইল।

মারাঠা শক্তি যে ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু তাহা ইংরেজরা বুঝিতে পারিল। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণের উপদেষ্টা

নানা ফড়নবীশ

নানা ফরনবীশ মারাঠা রাজ্যের প্রকৃত কর্ণধার হইলেন। তিনি যে দূরদর্শিতা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অনন্য-সাধারণ। ওয়েলেসলি যখন অধীনতামূলক মিত্রতার প্রস্তাব মারাঠাদের নিকট পাঠান,

নানা ফরনবিশের নির্দেশে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে মারাঠা কর্ণধারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মারাঠাদের দুর্দিন দেখা দিল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ। নূতন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও নিতান্ত অকর্মণ্য শাসক ছিলেন। মারাঠ্য রাজ্যের সর্বত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। ফলে মারাঠা সাম্রাজ্যের ঐক্য শিথিল হইয়া পড়ে। বেরারে ভোঁসলে, বরোদায় গাইকোয়াড় ও ইন্দোরে হোলকার নিজ নিজ স্থানে প্রধান হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া শক্তিক্ষয় করিতে লাগিলেন। এই সময় পেশোয়াকে কে ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করিবে তাহার সিদ্ধান্তের জন্য দৌলতরাও সিন্ধিয়া ও যশোবন্তরাও হোলকারের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। পেশোয়া নিজে সিন্ধিয়ার সঙ্গে যোগ দিলে হোলকার তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়। হোলকার পুণা দখল করিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে পেশোয়া পদে অভিষিক্ত করেন। এই অবস্থায় পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও অনন্যোপায় হইয়া ইংরেজ কোম্পানীর শরণাপন্ন হন এবং বেসিনের সন্ধি (১৮০২ খ্রীঃ) দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ওয়েলেসলির নেতৃত্বে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ইহাতে উল্লসিত হইলেন। ইংরেজের সহায়তায় পেশোয়া পুণায় ফিরিয়া গেলেন। ইহার বিনিময়ে অবশ্য ইংরেজরা তাঁহার নিকট হইতে অর্থ ও কিছু রাজ্যাংশ আদায় করিল। মারাঠা নেতাগণ কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেন না। ফলে সিন্ধিয়া, ভোঁসলে আর হোলকারের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ করিতে হইল। যুদ্ধে প্রথমে ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া পরাজিত হইলেন। ফলে তাঁহারা উভয়েই অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য হইলেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বহু অঞ্চল ইংরেজদের ছাড়িয়া দিতে হইল। এদিকে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সঙ্গে যখন ইংরেজদের যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন হোলকার নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের পরাজয়ের পর তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিলেন। ইংরেজ সেনাপতি মারে ও মনসন তাঁহার হাতে পরাজিত হন। ইহার পর ডিগের যুদ্ধে সেনাপতি লেক হোলকারের সৈন্যদলকে হটাইয়া দিলেও সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিতে পারিলেন না। হোলকার ভরতপুরের বিখ্যাত দুর্গে অবস্থান করিতে থাকেন। ইংরেজরা বারবার ভরতপুর দুর্গ অধিকার করিতে যাইয়া ব্যর্থ হয়, তাহাদের বহু সৈন্য

মারাঠা রাজ্যে গোলযোগ

সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের পরাজয়

হোলকারের সহিত যুদ্ধ



নানা ফরনবীশ

ক্ষয় হয়। এই ব্যর্থতার সংবাদ ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিলে কর্তৃপক্ষ ওয়েলেসলির কার্যাবলীতে অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দেন। ইহার পর দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হইল ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে। ইংরেজদের সম্মানে প্রবল আঘাত পড়িল। হোলকার নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেন। ইংরেজদের সহিত মারাঠাদের চরম নিষ্পত্তির দিন পিছাইয়া গেল।



পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বেসিনের সন্ধি (১৮০২ খ্রীঃ) অনুসারে ইংরেজদের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অপমান-সূচক সন্ধি বেশিদিন মানিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ইংরেজ প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে উদ্যোগী হইলেন। অন্যান্য মারাঠা নেতাগণও ইংরেজের বিরুদ্ধে শেষবার শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে রাজি হইলেন। ফলে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হইল (১৮১৭ খ্রীঃ)। মারাঠাদের সহিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। মারাঠারা প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াও আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ভোঁসলে পাঞ্জাবে পলাইয়া গেলেন। হোলকার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি স্বীকার করিয়া ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিলেন। যুদ্ধশেষে পেশোয়া পদ তুলিয়া দেওয়া হইল এবং পেশোয়ার রাজ্য কোম্পানীর হস্তগত হইল।

মারাঠাদের পরাজয়

ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত ক্ষমতা দুইটি শক্তিরই ছিল—সম্মিলিত মারাঠা রাজ্য ও মহীশূর। অবশ্য এই দুইটির মধ্যে মহীশূরই ছিল অধিকতর কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী। তাঁহার সেনাবাহিনীও ছিল সুশিক্ষিত, রাজ্যটিও খুব সম্পদশালী ছিল। ইহার কৃষিপণ্য, কুটির শিল্প এবং আকরিক লৌহ পররাজ্যগ্রাসী ইংরেজদের নজরে পড়িয়াছিল। এ কারণে মহীশূর আক্রমণের পিছনে সাম্রাজ্যবাদী নীতিই কাজ করিয়াছিল। হায়দার আলিই সর্বপ্রথম বুঝিতে পারেন যে ইংরেজরাই ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রধান শত্রু এবং তাহাদের সঙ্গে মৈত্রীমূলক চুক্তি করা অসম্ভব। দাক্ষিণাত্যে নিজাম রাজ্য ও মারাঠা

মহীশূরের গুরুত্ব

রাজ্যের সহিত ক্রমাগত সংঘর্ষের মধ্য দিয়া মহীশূর প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে থাকে এবং বহু বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ অগ্রগতির একমাত্র প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পর হায়দর আলি নিজাম ও মারাঠা রাজ্যের কতকাংশ জয় করিয়া রাজ্যবিস্তারে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মারাঠাদের নিকট তিনি পরাজিত হন। অপরদিকে নিজাম তাঁহার বিরুদ্ধে মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। অতএব হায়দারকে একাই মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজ—এই তিন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

হায়দর আলির ক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৬৭-৬৯ খ্রীঃ) হায়দর সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। কূটনীতিতেও কম ছিলেন না। তাই মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করিলে তিনি প্রচুর অর্থ দিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট করেন। ফলে মারাঠারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়ে। তিনি নিজামকেও ইংরেজ পক্ষ হইতে সরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। ইহার পর হায়দর তাঁহার সমস্ত শক্তি লইয়া ইংরেজদের সহিত এককভাবে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি কর্ণাটক প্রদেশ আক্রমণ করিয়া ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে বারংবার পরাজিত করেন। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি সহসা এক বিরাট সৈন্যবাহিনী লইয়া মাদ্রাজের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন। মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভয়ে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। শর্ত অনুযায়ী ঠিক হয় যে, ভবিষ্যতে নিজাম বা মারাঠারা যদি হায়দরকে আক্রমণ করে তবে ইংরেজরা তাঁহাকে সাহায্য করিবে।

ইংরেজদের সহিত সন্ধি

১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করিলে তিনি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ইংরেজদের নিকট সামরিক সাহায্য চাহিয়া পাঠান। কিন্তু ইংরেজরা তাঁহাকে কোন সাহায্য করিল না। ইহার ফলে হায়দর ইংরেজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০—৮৪ খ্রীঃ)। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ উপলক্ষে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে ইংরেজরা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল মাহে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল। হায়দর আলি প্রবল আপত্তি জানাইলেও ইংরেজরা তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি নিজাম, ভোঁসলে ও মহাদাজী সিন্ধিয়ার সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজ-বিরোধী একটি জোট গঠন করেন এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সত্তর হইতে আশী হাজার সৈন্য লইয়া তিনি শ্রীরঙ্গপত্তম হইতে বাহির হইয়া পোর্টোনোভা এবং কাঞ্জিভেরাম লুণ্ঠন করেন। কর্নেল বেইলীর অধীনে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন। বক্সারের যুদ্ধবিজয়ী মন্‌রো কাঞ্জিভেরামের একটি পুকুরে গোলা-বারুদ ফেলিয়া দিয়া মাদ্রাজে পলাইয়া যান। হায়দর কর্ণাটকের রাজধানী অধিকার করিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজরা মারাঠাদের অর্থের দ্বারা ও নিজামকে গুণ্টুর অঞ্চল দান করিয়া তাহাদের হায়দরের পক্ষ হইতে বিভিন্ন করিতে সমর্থ হইল। সেনাপতি আয়ারকূট পোর্টোনোভার যুদ্ধ

হায়দরের ইংরেজ-বিরোধী জোট গঠন

হায়দরকে পরাজিত করেন কিন্তু তাঞ্জোরের নিকট এক যুদ্ধে হায়দরের পুত্র টিপু ইংরেজ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। এই সময় অকস্মাৎ হায়দরের মৃত্যু ঘটিল। এখানেই যুদ্ধের শেষ হইল না। টিপু সাফল্যের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে ইংরেজ কোম্পানী টিপুর সহিত ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি করিলেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে উভয় পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থানগুলি ফিরাইয়া দেয়।

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ১৭৮৪ খ্রীঃ

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০—৯২ খ্রীঃ)। টিপু তাঁহার পিতা হায়দরের মতই নির্ভীক, উদার ও সংকল্পে অটল ছিলেন। তিনি তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষী ছিলেন, কারণ তিনি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ইংরেজরাই হইল ভারতের প্রকৃত শত্রু। ইংরেজদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের কথা কোনদিনই তিনি চিন্তা করেন নাই। ইংরেজরা ইহা ভালোভাবেই জানিত বলিয়া তাহারা টিপুর ক্ষমতা ধ্বংস করিবার জন্য তৎপর হইল। ইতিমধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল হইয়া ভারতে আসেন। তিনি প্রথম হইতেই টিপুকে শত্রু বলিয়া মনে করেন এবং টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রথমদিকে ইংরেজরা ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ইংরেজ সেনাপতি মেডোস টিপুর নিকট পরাজিত হন। কর্নওয়ালিস নিজেই যুদ্ধের দায়িত্ব লইয়া ব্যাঙ্গালোর অধিকার করেন। কিন্তু টিপুর সুচতুর রণকৌশলের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া তিনি পরাজিত হন (১৭৯০ খ্রীঃ)। ইহার পর নূতন সৈন্য দল ও রসদ সংগ্রহ করিয়া কর্নওয়ালিস টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম পর্যন্ত অগ্রসর হইলে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হন। শ্রীরঙ্গপত্তমের চুক্তি অনুসারে টিপু তাঁহার রাজ্যের অর্ধাংশ কোম্পানী, নিজাম ও মারাঠাদের নিকট সমর্পণ করিলেন এবং তিন কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই টাকার জামিনস্বরূপ টিপুর দুই পুত্রকে ইংরেজদের নিকট অর্পণ করা হইল।

টিপুর ইংরেজ বিরোধী মনোভাব

শ্রীরঙ্গপত্তনের চুক্তি



টিপু সুলতান

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূরের যুদ্ধ (১৭৯৯ খ্রীঃ)। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ এবং শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির (১৭৯২ খ্রীঃ)। অপমান টিপু কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। তিনি আবার নিজেকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি ইংরেজ-শত্রু ফরাসীদের

সাহায্য আশা করিতেছিলেন। তিনি মরিশাস দ্বীপপুঞ্জে রাজদূত পাঠান। কিছুসংখ্যক ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক টিপুর সাহায্যে মহীশূরে আসে। ইংরেজ আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপন্ন স্বাধীনতা রক্ষার বাসনায় তিনি আফগানিস্তান, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে সাহায্যের জন্য দূত পাঠান। এইভাবে নানারূপ প্রচেষ্টার দ্বারা টিপু মহীশূরের স্বাধীনতা রক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি এই সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি টিপুকে ধ্বংস করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই তিনি টিপুর নিকট এক চরমপত্র পাঠাইলেন। এই পত্রে ফরাসীদের মহীশূর হইতে বিতাড়িত করিতে, ইংরেজ দূতকে অভ্যর্থনা করিতে এবং নিজাম ও মারাঠাদের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইবার নির্দেশ দেওয়া হয়। টিপুর মত স্বাধীনচেতা নরপতি এই ধরনের হুমকিতে ভয় পাইবেন না তাহা ওয়েলেসলি ভালোভাবেই জানিতেন। এ কারণে বিলম্ব না করিয়া ইংরেজ সৈন্য মহীশূর আক্রমণ করিল। যুদ্ধ মাত্র দুইমাস চলিয়াছিল। বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও টিপু পরাজিত ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। বিজয়ী ইংরেজ সেনা টিপুর প্রাসাদ লুণ্ঠন করে। টিপুর রাজ্যকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ ভাগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। মহীশূরের প্রাচীন হিন্দু বংশের এক নাবালককে সিংহাসনে স্থাপন করা হইল। মহীশূরের নূতন রাজা সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে রহিলেন।

টিপুর যুদ্ধ প্রস্তুতি

ফলাফল

টিপুর পরাজয়ে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। ওয়েলেসলির পক্ষে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগ করা সহজ হইল। টিপুর পতনে ইংরেজরা তাহাদের অন্যতম প্রধান শত্রুর বিরোধিতা হইতে যেমন মুক্তি পাইয়াছিল, ফরাসীদের তেমনি এক শক্তিশালী মিত্র চলিয়া যাইবার ফলে ভারতে তাহাদের প্রভাব বিস্তারের আশা নির্মূল হইল। এই কারণে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, মহীশূর জয় ভারতে ব্রিটিশ শক্তির দিক হইতে পলাশীর যুদ্ধের পর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সামরিক, আর্থিক ও ভৌগোলিক দিক হইতে ইহার মূল্য অপরিসীম।

গুরুত্ব

লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি

ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যে সকল ইংরেজ শাসক স্থায়ী অবদান রাখিয়া গিয়াছেন লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী এবং সাম্রাজ্য বিস্তারই তাঁহার মূলনীতি ছিল। তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে তিনি তাঁহার নীতিকে নিঃসন্দেহেই সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতের সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাই ১৭৯৮ হইতে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার শাসনকাল ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

পটভূমিকা

ব্রিটিশ ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ওয়েলেসলি ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতের রাজ-

নৈতিক প্রাধান্যে অধিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন ভারতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় তাঁহার পূর্ববর্তী গভর্নর জেনারেলদের অনাক্রমণ নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা ছাড়া তিনি লক্ষ্য করেন যে, ভারতে তখন কেন্দ্রীয় শক্তি বলিয়া কোন কিছু ছিল না ; ফলে দেশীয় রাজন্যবর্গ অহরহ কলহে লিপ্ত থাকিতে চায়, এমনকি বিদেশী শক্তির সাহায্য লইতেও পিছপা হয় না। তিনি স্থির করিলেন যে ভারতে এই রাজনৈতিক শূন্যতা দূর করিয়া ব্রিটিশ শক্তিকে সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব

টিপু সুলতানের ক্ষমতা চূর্ণ করিয়া ওয়েলেসলির নিজের উপর বিশ্বাস বাড়িয়া যায়। তিনি ভারতে একচ্ছত্র ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারে পূর্ণভাবে মনোযোগী হন। তিনি **অধীনতামূলক মিত্রতা** (Subsidiary Alliance) নীতি গ্রহণ করেন। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির দুইটি রূপ ছিল। একটি হইল কূটনৈতিক, অপরটি হইল যুদ্ধ। যাহারা এই নীতি গ্রহণ করিল না তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই নীতি অনুসারে (ক) দেশীয় নৃপতিকে কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। (খ) যে কোন দেশীয় নৃপতি এই মৈত্রীতে আবদ্ধ হইতে পারিত কিন্তু ইহার শর্ত হিসাবে তাঁহাকে নিজ ব্যয়ে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখিতে হইবে। (গ) ভারত সরকারের অনুমোদন ছাড়া তিনি কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না। ইংরেজ কোম্পানী এরূপ রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। (ঘ) প্রতিবেশী কোন রাজ্যের সহিত বিরোধ দেখা দিলে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। বড় রাজ্যগুলির রাজারা ইংরেজদের পরিচালনায় সৈন্যদল রাখিবে এবং তাহাদের ব্যয়নির্বাহের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ এলাকা কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিবে। ছোট ছোট রাজ্যগুলি কোম্পানীকে কর দিবে। অর্থাৎ এই চুক্তি অনুসারে সমস্ত দেশীয় রাজাকে ইংরেজ কোম্পানীর হাতে তাহাদের স্বাধীনতা অর্পণ করিতে হইবে। এই নীতি ঘোষিত হওয়ার পর হীনবল নিজাম সর্বপ্রথম এই নীতি গ্রহণ করিয়া ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করেন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, হোলকার ও সিন্ধিয়া উপর্যুপরি আক্রমণে অতিষ্ঠ হইয়া বেসিনের সন্ধি দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসানে পরাজিত সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে উভয়েই এই নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সিন্ধিয়া আহম্মদনগর, বেরার

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির স্বরূপ



লর্ড ওয়েলেসলি

ও গঙ্গা-যমুনার দোয়ার অঞ্চল, জয়পুর, যোধপুর এবং অনেকগুলি দুর্গ ইংরেজদের হাতে তুলিয়া দিলেন। ভোঁসলে কটক অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেন।

সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি

ওয়েলেসলি একদিকে যেমন শক্তিশালী শাসকদের অধীনতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন, অপরদিকে দুর্বল রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হইলেন। এসব ক্ষেত্রে তিনি অগ্রসর নীতি প্রয়োগ করেন। এখানে মনে রাখা দরকার যে অধীনতামূলক মিত্রতা ও অগ্রসর নীতি দুইটি পৃথক্ নীতি নয়, উভয়েই একই উদ্দেশ্য লইয়া প্রয়োগ করা হইয়াছিল অর্থাৎ ভারতে ইংরেজদের সার্বভৌম শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। সুরাটের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তিনি সুরাটকে কোম্পানীর শাসনাধীনে আনিলেন এবং তাঞ্জোর দখল করেন। ইহার পর কর্ণাট রাজ্যটি গ্রাস করেন। অযোধ্যার নবাবকে গোরক্ষপুর, রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা-যমুনা-দোয়াবের নিম্ন অঞ্চল কোম্পানীকে দান করিতে বাধ্য করিলেন। ওয়েলেসলি ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। কোম্পানীর রাজ্যসীমা তিনি বিশেষভাবে বর্ধিত করেন। তাঁহার ভারত ত্যাগের সময় ভারতে রাজনৈতিক অধিকার লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এমন কোন শক্তি আর এই দেশে রহিল না। মারাঠাদের দমন করা ইংরাজদের পক্ষে আর কষ্টসাধ্য হইল না।

ওয়েলেসলি অবশ্য অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির উদ্ভাবক ছিলেন না। তবে তাঁহার পূর্বে এই নীতির প্রয়োগের তেমন উগ্রতা প্রকাশ পায় নাই। এই নীতিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতিরূপে বলপ্রয়োগের দ্বারা সকল রাজ্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করাও হয় নাই। ওয়েলেসলি এই নীতির সাহায্যে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন।

গুর্খা ও তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ময়রা গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসেন। ইতিহাসে তিনি 'মার্কুইস অব হেস্টিংস' নামে অধিক পরিচিত। তিনি ওয়েলেসলির অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণ করিয়া ভারতে ইংরেজ রাজ্যসীমার বিস্তৃতি ঘটান। ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলিকে ইংরেজ প্রভাবিত করার দায়িত্ব লইয়া তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি মারাঠা শক্তি নির্মূল করিবার জন্য তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু করেন এবং তিনি রাজপুতানায় ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। গুর্খাদের পরাজিত করিয়া তিনি সগৌলির সন্ধি (১৮১৭ খ্রীঃ) দ্বারা বর্তমান কুমায়ুন, গাড়োয়াল জেলা ও তরাই-এর অধিকাংশ লাভ করেন। ইহার ফলে শতদ্রু হইতে ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রভুত্ব সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি ব্রহ্মদেশের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন (১৮২৪ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে ব্রহ্মরাজ পরাজিত হইয়া ইয়ান্দাবুর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে ব্রহ্মরাজ ইংরেজদের প্রচুর অর্থ এবং আসাম, মণিপুর, কাছাড়, জয়ন্তিয়া, আরাকান ও টেনাসেরিম ছাড়িয়া

দিতে বাধ্য হন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট-এর আমলে দুর্ভেদ্য ভরতপুর দুর্গ ইংরেজ অধিকারে আসে।

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-১৮৩৫) রাজ্যবিস্তার অপেক্ষা শাসন সংস্কারের প্রতি বেশী আগ্রহী ছিলেন বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। তিনি সামরিক শক্তি দ্বারা রাজ্যবিস্তারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু কৌশলে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শক্তি বিস্তারে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। এইভাবে তিনি মহীশূর, কাছাড়, কুর্গ ও জয়ন্তিয়া পরগণা ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। লর্ড এলেনবরার (১৮৪২-১৮৪৪) আমলে সিন্ধুদেশ জয় করিয়া ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক

গুরু গোবিন্দের আকস্মিক মৃত্যুতে শিখগণ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের এই বিভ্রান্তি দূর করেন বান্দা বাহাদুর। তাঁহার নেতৃত্বে শিখগণ আরও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পাঞ্জাবে যে সব মুঘল ঘাঁটি ছিল সেগুলির কোনটিই তাঁহার আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। সেরহিন্দ অঞ্চল তিনি দখল করিয়া সেখানে গুরুর নামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং জমিদারী প্রথা তুলিয়া দেন। মুঘল বাদশাহ তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে বান্দা বাহাদুর পরাজিত হইয়া মুঘলদের হাতে বন্দী হন। তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়।

বান্দা বাহাদুর

বান্দা বাহাদুরের মৃত্যুর পরেও শিখ জাতির সামরিক শক্তি বিশেষ হ্রাস পায় নাই। অবশ্য তাঁহার মৃত্যুর পর শিখ সম্প্রদায় দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়। এক দলকে 'বান্দাপন্থী' ও অপর দলকে 'তৎখালসা' বলা হইত। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে ভাই মালী সিং-এর মধ্যস্থতায় এই দুই দলের মিলন সম্ভবপর হয়।

শিখদের মধ্যে অনৈক্য

শিখ 'মিস্‌ল'। 'মিস্‌ল' শব্দের অর্থ হইল সমান বা বৈষম্যহীন। পাঞ্জাবে যখন বিশৃঙ্খলা চলিতেছিল ঠিক সেই সময় শিখ সম্প্রদায় আত্মরক্ষার জন্য কয়েকজন নেতার নেতৃত্বে দলবদ্ধ হয়। এরূপ এক-একটি দলকে 'মিস্‌ল' বলা হইত। কালক্রমে শিখদের মধ্যে বারটি মিসলের উদ্ভব ঘটে। প্রত্যেকটি মিসলের প্রধানকে সর্দার বা মিসলদার বলা হইত। সর্ববিষয়ে সর্দার ছিলেন মিসলের হর্তাকর্তা। মিস্‌লের সদস্যদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বলিয়া কিছু ছিল না। প্রত্যেক সদস্যই সামরিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে সমান সুযোগ-সুবিধা পাইবার অধিকারী ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিখ জাতির মধ্যে কোন রাজনৈতিক একতা ছিল না। প্রত্যেক মিস্‌লের নায়ক এক-একটি স্বতন্ত্র রাজ্যখণ্ড শাসন করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুকারচাকিয়া মিস্‌লের অধিপতি মহান সিং-এর পুত্র পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিং বাহুবলে বিভিন্ন মিস্‌লের অধীনে রাজ্যগুলি অধিকার করিয়া শিখজাতিকে সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় শক্তিতে পরিণত করেন।

মিস্‌ল-এর সংগঠন

মহারাজ রণজিৎ সিং। শিখদের অনৈক্যের সুযোগ লইয়া ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে কাবুলের অধিপতি জামান্ শাহ্ পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে রণজিৎ সিং তাঁহাকে সাহায্য করেন। প্রতিদানে জামান্ শাহ্ রণজিৎকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়া লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি আফগান রাজ্যের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইহার পর তিনি জম্মুর দিকে অগ্রসর হইয়া মীরওয়াল ও নারওয়াল দখল করেন। জম্মুর রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে রণজিৎ সিং অমৃতসর জয় করিলে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

রণজিৎ সিং-এর ক্ষমতা বিস্তার

তাহার পর একে একে শতদ্রু নদীর পশ্চিমে অবস্থিত শিখ সর্দারগণ তাঁহার আধিপত্য মানিয়া লইলেন। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি লুধিয়ানা দখল করেন এবং শতদ্রু নদীর পূর্ববর্তী অঞ্চলে তাঁহার অধিকার বিস্তারের সুযোগ দেখা দেয়। ইহাতে শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ শিখ রাজ্যগুলির শাসকগণ রণজিৎ সিং-এর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ইংরেজদের শরণাপন্ন হইল। সামরিক ও কূটনৈতিক কারণে ইংরেজরা শতদ্রু নদীর পূর্বদিকে রণজিৎ সিং-এর অগ্রগতিতে বাধাপ্রদান করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে রণজিৎ সিং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টো যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। তিনি পরস্পর আত্মরক্ষামূলক চুক্তি সংপর্কে আলাপ-আলোচনার জন্য চার্লস মেটকাফকে রণজিৎ সিং-এর দরবারে পাঠাইলেন। রণজিৎ সিং এই সময় সমস্ত শিখ রাজ্যগুলির উপর তাঁহার আধিপত্য দাবি করেন। ইহা লইয়া দীর্ঘদিন আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল। রণজিৎ ইংরেজদের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি ইংরেজদের সহিত চুক্তি করিতে সম্মত হইলেন। ফলে ইংরেজদের সহিত অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯ খ্রীঃ) স্বাক্ষরিত হয়। ইহার দ্বারা রণজিৎ ও ইংরেজদের মধ্যে চিরস্থায়ী মিত্রতা স্থাপিত হয়। রণজিৎ প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি শতদ্রু অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে আর রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিবেন না। ইংরেজরাও শিখ রাজ্যের কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। রণজিৎ এই সন্ধির পর আরও ত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যে তিনি কখনও অমৃতসরের সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন নাই। এই

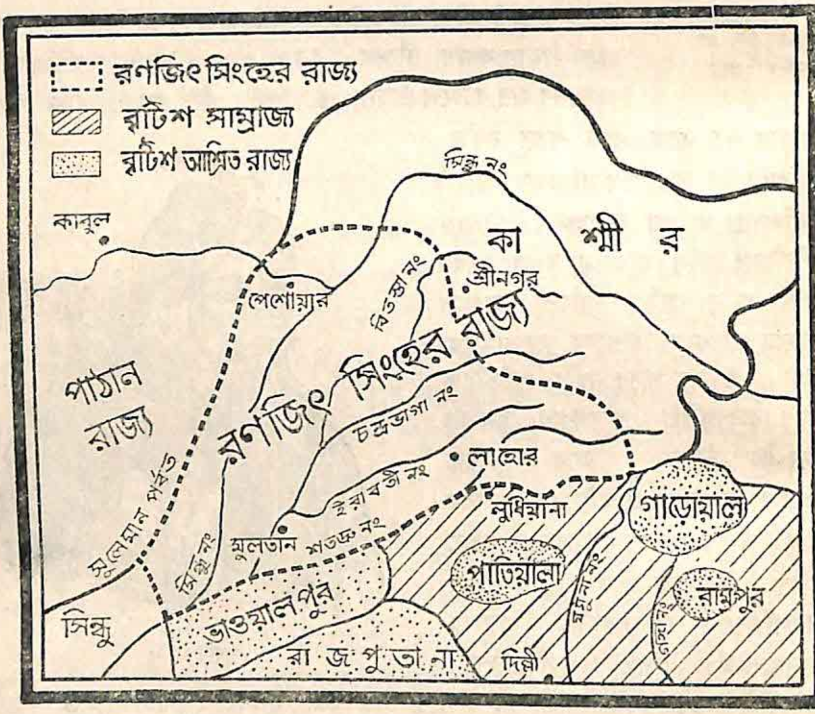


রণজিৎ সিং

ইংরেজ-রণজিৎ সিং সম্পর্ক

অমৃতসরের সন্ধি, ১৮০৯

সন্ধির ফলে শতদ্রু নদী রণজিৎ-এর রাজ্যের পূর্বসীমা ধার্য হয়, শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত শিখ রাজ্যগুলি ইংরেজদের আশ্রয়ে থাকিয়া যায়। অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে রণজিৎ সিং-এর রাজ্যবিস্তারের সম্ভাবনা চিরতরে লোপ পায়। এই সন্ধির দ্বারা ইংরেজদের নিকট তাঁহার একরকম কূটনৈতিক পরাজয় হইয়াছিল। অপরদিকে ইংরেজরা এই সন্ধির দ্বারা প্রভূত পরিমাণে লাভবান হয়।



শতদ্রু নদীর পূর্বে রাজ্যবিস্তারের সম্ভাবনা রুদ্ধ হইলে রণজিৎ উত্তর-পশ্চিমে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়া বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। ১৮০৭ হইতে ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গোর্খাদের নিকট হইতে কাংড়া অধিকার করেন। তিনি লাডাক অধিকার করেন। তাঁহার অধিকার ক্রমশঃ মুলতান, কাশ্মীর ও পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। মুলতান হইতে কাশ্মীর ও পেশোয়ার পর্যন্ত রাজ্যগুলি, পশ্চিমে কোহাট, বান্নু, টঙ্ক, ডেরাইসমাইল খান, ডেরা গাজী খান, পেশোয়ার প্রভৃতি অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আফগানদের হায়দারুর যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তিনি 'আটক' তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে সমর্থ হন। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে খাইবার গিরিবর্ত্মের নিকট বিখ্যাত জামরুদ দুর্গ তিনি নির্মাণ করেন। এদিকে রণজিৎ সিং-এর রাজ্যবিস্তারে ইংরেজরা ক্রমেই আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। তৎকালীন গভর্নর জেনালের উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সিন্ধু

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে রাজ্যবিস্তার

অঞ্চলে রণজিৎ সিং-এর অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য কূটনৈতিক দূতরূপে আলেকজাণ্ডার বার্নেসকে রণজিৎ সিং-এর দরবারে পাঠান। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং শতদ্রু তীরবর্তী একটি স্থানে উপস্থিত হইয়া রণজিৎ সিং-এর সহিত চিরস্থায়ী মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে কাবুলের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা শাহ্ সুজাকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে রণজিৎ সিং, শাহ্ সুজা এবং ইংরেজদের মধ্যে এক 'ত্রিশক্তি মৈত্রীচুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির ফলেই প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বেই রণজিৎ সিং পরলোকগমন করেন।

চিরস্থায়ী মিত্রতা নীতি

ইংরেজদের বিরুদ্ধে রণজিৎ সিং যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাহাদের সহিত চিরস্থায়ী মৈত্রীতে আবদ্ধ হইয়া তিনি নিজে দুর্বলতাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংরেজদের নিকট রণজিৎ সিং-এর যে কূটনৈতিক পরাজয় হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে ইহাও সত্য যে রণজিৎ ছিলেন খুবই বাস্তববাদী। তিনি ইংরেজদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তিনি টিপু সুলতানের পরিণাম সম্বন্ধেও জানিতেন। মারাঠাদের পরাজয়ের কথাও তাঁহার জানা ছিল। এ সব কারণেই তিনি ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ইংরেজ-বিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়াছিল। ইহার ফল কিন্তু ভাল হয় নাই।

রণজিৎ সিং-এর মূল্যায়ন

ইংরেজ শক্তির পাঞ্জাব অধিকার : শিখ যুদ্ধ। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে রণজিৎ সিং-এর মৃত্যু হয়। পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিং তাঁহার অসাধারণ সামরিক প্রতিভার সাহায্যে যে শিখ রাজনৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং শিখদের মধ্যে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা অধিকদিন স্থায়ী হইল না। মহারাজ রণজিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর শিখ রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই কোন রাজা অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ষড়যন্ত্র শিখ জাতিকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছিল। ইহা ইংরেজদের সাহায্য করিল। তাহা ছাড়া শিখ জাতির ন্যায় স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ইংরেজদের নিকট অসহ্য হইয়া দাঁড়ায়। শিখরাজ্যের সীমান্তে ইংরেজদের তৎপরতা শিখদের মনে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে। ফলে উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইতিমধ্যে শাসনব্যবস্থার চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিল। তাঁহার বংশধরগণের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া খালসা সৈন্যদলই রাজ্যমধ্যে সর্বেসর্বা হইয়া উঠে। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে রাণীমাতা ঝিন্দন রণজিৎ সিং-এর নাবালক পুত্র দলীপ সিং-এর অভিভাবকরূপে শাসনকার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। দুর্দান্ত খালসা সৈন্যদলকে স্ববশে রাখা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তিনি তাহাদের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহাদিগকে ইংরেজ-শাসিত অঞ্চল আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন। অপরদিকে ইংরেজরাও এই সময় তাহাদের সাম্রাজ্যের পরিসীমা বর্ধিত করেন এবং পাঞ্জাবে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্‌গ্রীব ছিল। সুতরাং তাহারাও এই বিষয়ে শিখদের প্ররোচনা দিল। ইহার

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ

প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুকদী, ফিরোজশা, আলিওয়ালা ও সোব্রাও এই চারিটি যুদ্ধে অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াও প্রধানতঃ সেনাপতিদের দোষে শিখ সৈন্যদল পরাজিত হয়। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে সোব্রাও-এর যুদ্ধের পর ইংরেজ বাহিনী শতদ্রু অতিক্রম করিয়া লাহোর অধিকার করে। অতঃপর লাহোরের সন্ধি দ্বারা উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী শিখরা সমগ্র জলন্ধর দোয়াব সহ শতদ্রুর পশ্চিম তীরস্থ সমস্ত অঞ্চল ইংরেজদের ছাড়িয়া দিল। পাঞ্জাবে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখিবারও ব্যবস্থা হইল। কিছুকাল পরে লাহোরের সন্ধিকে পুনরায় সংশোধন করা হয় এবং পাঞ্জাবের শাসনভার একজন ইংরেজ কর্মচারীর উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে শিখ নেতাদের সহিত কোম্পানীর আর একটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার দ্বারা ব্রিটিশ রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে আটজন শিখ সর্দারকে লইয়া গঠিত একটি কাউন্সিলের উপর পাঞ্জাবের শাসনভার দেওয়া হয়। লাহোরে একদল ব্রিটিশ সৈন্য থাকারও ব্যবস্থা হয়। ইহার ব্যয়ভার অবশ্য শিখ সরকারকে বহন করিতে হইত। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়।

লাহোরের সন্ধি, ১৮৪৭

প্রথম শিখ যুদ্ধ শেষ হইবার দুই বৎসর পর দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ) শুরু হয়। ইংরেজ কর্তৃত্ব শিখদের অসহ্য মনে হইল। তাহারা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইতে ছিল। ইতিমধ্যে ইংরেজরা রাজমাতা ঝিন্দনকে লাহোর হইতে নির্বাসিত করে এবং মুলতানের শাসনকর্তা ইংরেজ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া পদত্যাগ করিলে শিখগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। মুলতানের শাসনকর্তা বিদ্রোহী শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ফলে শিখরাজ্যে এই বিদ্রোহ জাতীয় অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র লর্ড ডালহৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়; ভারতবর্ষের অন্য কোন যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য এরূপ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইংরেজরা ভগ্নোদ্যম হয় নাই। গুজরাটের যুদ্ধে শিখরা পরাজিত হয় এবং রাওলপিণ্ডিতে সমগ্র শিখ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। বিজয়গর্বে ডালহৌসী এক ঘোষণাপত্র দ্বারা দলীপ সিংকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সমগ্র পাঞ্জাব ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ফলে ইংরেজ শক্তি সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইল। তাহাকে বাধা দেবার মত আর কোন শক্তি ভারতে রহিল না। শিখশক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে দেশীয় রাজাদের সংগ্রামের অবসান হইল বলা যায়। ইহার পর ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সিপাহী, জমিদার, কৃষকশ্রেণী ও জনসাধারণের সংগ্রামের সূচনা হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ

লর্ড ডালহৌসী ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার। লর্ড হার্ডিঞ্জের পর ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করাই তাঁহার প্রধান

উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। তাঁহার সাম্রাজ্যবাদের পিছনে দুইটি উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়ঃ (ক) রাজ্য অধিকারের আকাঙ্ক্ষা; (খ) দেশীয় রাজাদের কুশাসন হইতে দেশীয় রাজ্যগুলিকে মুক্ত করিয়া সেখানে সুশাসন প্রবর্তন করা। তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যে চারিটি উপায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা হইল, (১) প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্যবিস্তার; (২) স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা রাজ্য অধিকার; (৩) কুশাসনের অজুহাতে রাজ্য গ্রাস; ও (৪) হস্তান্তর নীতির প্রয়োগ দ্বারা রাজ্যবিস্তার।

সাম্রাজ্য বিস্তারঃ ডালহৌসীর নীতি

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে শিখরা পরাজিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ডালহৌসী এক ঘোষণাপত্র দ্বারা সমস্ত পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পাঞ্জাবে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল এবং খালসা সেনাবাহিনীকে ভাঙিয়া দেওয়া হয়। ব্রিটিশ ভারতে পাঞ্জাব সংযুক্তির ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা আফগানিস্তানের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ইহাকে একটি প্রাকৃতিক সীমারেখা দান করিল।

পাঞ্জাব অধিকার

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধি ও বণিকদের সহিত দুর্ব্যবহার করায় ডালহৌসী ব্রহ্মদেশের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে ইংরেজগণ জয়লাভ করে এবং পেগু প্রদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়। ইহার ফলে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগ ইংরেজদের অধীনে আসিল। ডালহৌসী জোরজবরদস্তি করিয়া কয়েকটি রাজ্য অধিকার করিয়া ব্রিটিশ রাজ্যসীমা বাড়াইয়াছিলেন। সিকিমের রাজা দুইজন ইংরেজকে বন্দী করিলে ডালহৌসী সিকিম রাজ্যের কতকাংশ দখল করিয়া লন।

ব্রহ্মদেশের একাংশ ও মালয় উপদ্বীপ অধিকার



লর্ড ডালহৌসী

ডালহৌসী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন, দেশীয় শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অনেক উন্নত এবং বাঞ্ছনীয়। এই কারণে পররাজ্য গ্রাস করিতে তিনি কোনরূপ কুণ্ঠা বা দ্বিধাবোধ করেন নাই। ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিস্তারের জন্য লর্ড ডালহৌসী **স্বত্ববিলোপ নীতি** (Doctrine of Lapse) নামে এক নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতির তাৎপর্য হইল, ইংরেজের অধীন কিংবা ইংরেজের অনুগ্রহে সৃষ্ট কোন দেশীয় রাজার যদি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয় তাহা হইলে তাঁহার রাজ্য ইংরেজ

সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং এই দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে অপুত্রক রাজা দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলে তাহা স্বীকার করা হইবে না। ডালহৌসী এই নীতির স্রষ্টা নহেন। এই নীতি ডালহৌসীর শাসনকালের বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাঁহার পূর্বতন শাসকগণ এই নীতি প্রয়োগ করেন নাই। ডালহৌসীই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের জন্য সর্বপ্রথম এই নীতি কঠোরভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

স্বত্ববিলোপ নীতি

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে সাতারা রাজ্যের রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে ডালহৌসী



উপরোক্ত নীতির বলে সাতারাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। অনুরূপভাবে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্বর্তী জয়ৎপুর ও মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর, ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ঝাঁসী ও ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে নাগপুর রাজ্য গ্রাস করেন। এই একই কারণে ডালহৌসী কর্ণাটক ও তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব নৃপতিগণের বৃত্তি ও পদমর্যাদার বিলোপসাধন করেন। দুইজনই অপুত্রক অবস্থায় মারা যান। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেব-এরও বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ

রাজ্যবিস্তারে লর্ড ডালহৌসীর তৃতীয় নীতি ছিল কুশাসনের অভিযোগে দেশীয় রাজ্যগ্রাস। এই নীতি প্রয়োগ করিতে গিয়া তিনি ঘোষণা করেন যে, কোন রাজ্যের দায়িত্বহীন শাসনব্যবস্থা কোম্পানীর উপর ভারতবাসীর বিশ্বাসকে নষ্ট করিয়া দিবে। এই নীতির প্রথম প্রয়োগ হইল অযোধ্যায়। তিনি অযোধ্যার নবাবকে বৃত্তিভোগী করিয়া অযোধ্যা প্রদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁহার রাজ্যে রক্ষিত ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ হওয়ায় বেরার প্রদেশ ও অপর কয়টি জেলা ইংরেজদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এক্ষেত্রে ডালহৌসী হস্তান্তর নীতির প্রয়োগ করেন। সিন্ধুর খৈয়রপুরের আমীরকে জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত করিয়া তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল কোম্পানী গ্রাস করে। ইহা ছাড়া আসামে অবস্থিত কাছাড় রাজ্য, উড়িষ্যার কয়েকটি রাজ্য কোম্পানীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

কুশাসনের অভিযোগে রাজ্যবিস্তার

'স্বত্ববিলোপ নীতি' প্রয়োগকালে ডালহৌসী এদেশের চিরাচরিত প্রথা, হিন্দুদের 'ধর্মীয় সংস্কার, ঐতিহ্য ও রাজনীতির প্রতি কোনরূপ সমবেদনা দেখান নাই। শুধু রাজ্য দখল করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সম্মানীয় রাজবংশ সম্বন্ধে তিনি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশের মানুষ উত্তেজিক হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে যে মহাবিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল তাহার জন্য ডালহৌসীর দায়িত্ব কম ছিল না। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে আট বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য ডালহৌসী দেশে ফিরিয়া যান। তিনি যে ভারতের শ্রেষ্ঠ গভর্নর জেনারেলদের অন্যতম সে বিষয়ে দ্বিমত নাই। তাঁহার শাসনকালে কোম্পানীর অধিকার ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং কোম্পানীর রাজ্যসীমা পশ্চিমে আফগান সীমান্ত হইতে পূর্বে ফরাসী ইন্দোচীন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই বিরাট অঞ্চলে ভালোভাবে যাহাতে শাসন করা সম্ভব হয় তাহার ব্যবস্থাও তিনি করেন।

স্বত্ববিলোপ নীতির প্রতিক্রিয়া

29/8/88

ষষ্ঠ অধ্যায় | কোম্পানীর শাসনকালে ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে অযোধ্যার নাবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল বাদশাহ শাহ আলম উভয়েই কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ গভর্নর হিসাবে দ্বিতীয়বার বাংলায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কোম্পানীর স্বার্থ এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে মর্যাদাহীন এবং ইংরেজদের আশ্রিত বাদশাহ শাহ আলমের সহিত ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সন্ধি স্বাক্ষর করেন। সন্ধির শর্তানুসারে কোম্পানী বাদশাহের সম্মান রক্ষার্থে কারা এবং এলাহাবাদ অঞ্চল দুইটি বাদশাহকে প্রদান করে। ইহার বিনিময়ে কোম্পানী বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা করদানের শর্তে বাংলা সুবার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে।

দেওয়ানী লাভ

কোম্পানী কর্তৃক দেওয়ানী লাভ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যায়। বাংলা সুবার উপর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কোম্পানী যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল, দেওয়ানী লাভ সেই প্রভাব প্রতিপত্তিকে এখন হইতে আইনসম্মত করা হইল। দেওয়ানী লাভ বাংলার উপর কোম্পানীর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। এখন হইতে কোম্পানী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়।

দেওয়ানীর তাৎপর্য

দ্বৈত শাসনব্যবস্হা। দেওয়ানী লাভের পর ক্লাইভ বাংলা সুবায় এক অভিনব শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মুঘল বাদশাহের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ ছাড়াও ক্লাইভ বাংলার নবাবের নিকট হইতে দেশরক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসন বিভাগ ও শাসনকার্যের দায়িত্ব নামে নবাবের উপর থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীন রহিল। এই ব্যবস্থার ফলে শাসনব্যবস্থা দুইভাগে ভাগ হইয়া যায়। নবাবের হাতে দায়িত্ব রহিল, কিন্তু ক্ষমতা থাকিল না; আবার কোম্পানীর হাতে ক্ষমতা রহিল, দায়িত্ব থাকিল না। ইহার ফলে জনসাধারণকেই কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাই ক্লাইভের দ্বৈত শাসনব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ফলে দেশে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহা ভাঙিয়া পড়ে।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থা কাহাকে বলে?

ইহার স্বরূপ ও দোষত্রুটি

কেন্দ্রীভূত শাসনের উদ্ভব। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণের সময় হইতে শুরু করিয়া ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতের শাসন-ক্ষমতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অধিষ্ঠিত ছিল। কোম্পানীর প্রায় একশত বৎসরকাল শাসনে ভারতে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই সময়ের মধ্যে কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়া ধীরে ধীরে ভারতে কোম্পানীর শাসনের উপর আপন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট (১৭৭৩ খ্রীঃ), পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট (১৭৮৪ খ্রীঃ) ও

কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল

১৭৯৩ হইতে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সনদ আইনগুলির দ্বারা ভারত শাসনের ক্ষেত্রে আপন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করে।

রেগুলেটিং আইনের (১৭৭৩ খ্রীঃ) স্বরূপ

রেগুলেটিং আইন দ্বারা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভূমি ও রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পরিচালনা এবং সামরিক ও বেসামরিক শাসনকার্যের দায়িত্ব দেওয়া হইল ফোর্ট উইলিয়ম-স্থিত গভর্নর জেনারেলের উপরে। তিনি বাংলার গভর্নর জেনারেল হিসাবে খ্যাত হইলেন। গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিলকে বোম্বাই ও মাদ্রাজস্থিত ইংরেজ সরকারের কার্যকলাপ তদারক এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হইল। কলিকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন করা হইল। ইংল্যাণ্ডের আইন-কানুন অনুসারে এখানে বিচারকার্য পরিচালিত হইবে ঠিক হয়।

পিটের ভারত আইন

গুরুত্ব

অজস্র ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও রেগুলেটিং অ্যাক্টই প্রথম উদাহরণ যাহার মাধ্যমে পার্লামেণ্ট ভারতে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হয়। ইহার পর ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর একটি আইন বিধিবদ্ধ করে। ইহাকে 'পিট-এর ভারত আইন' বলা হয়। এই আইন ভারতের শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। প্রথমেই গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারকে গভর্নর জেনারেলের অধীনে আনা হইল। ইহা ছাড়া শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলকে কোন কোন ক্ষেত্রে কাউন্সিলের মতামত অগ্রাহ্য করিবার অধিকার দেওয়া হইল। পিটের ভারত আইন ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ ছিল। এই আইনের ফলে গভর্নর জেনারেল স্বৈর ক্ষমতার অধিকারী হইয়া পড়েন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ আইনের দ্বারা বাংলার গভর্নর জেনারেলকে ভারতের গভর্নর জেনারেল আখ্যায় ভূষিত করা হয়। সপরিষদ গভর্নর জেনারেল সমগ্র ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করেন। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ আইনের দ্বারা গভর্নর জেনারেল বাংলার শাসনভার হইতে মুক্তি পান এবং বাংলার জন্য একজন ছোটলাট নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাহা ছাড়া, আইন প্রণয়নের জন্য একটি আইন পরিষদও গঠন করা হয়। এই আইন ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থার সূচনা করে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে কার্যনির্বাহক ক্ষমতা হইতে পৃথক করিয়া এই আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নজির স্থাপন করে।

বিভিন্ন সনদ আইন

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ আইন দ্বারা বড়লাটের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়। তিনি প্রত্যক্ষভাবে বা তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করা, আইন পরিষদের অধিবেশন বন্ধ রাখা, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, বেরার, ব্রহ্মদেশের অধিকৃত অঞ্চল প্রভৃতির শাসনভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্বাধীনে চারিটি সরকারী বিভাগ ছিল—স্বরাষ্ট্র, অর্থ, সামরিক এবং রাজনৈতিক বা বৈদেশিক বিভাগ। বড়লাটের অনুমতি

ছাড়া কোন প্রাদেশিক সরকারের অর্থ ব্যয় করার অধিকার রহিল না। অর্থাৎ সমগ্র দেশের সরকারী আয় ব্যয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ কঠোর ও সম্পূর্ণ হইল। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্মের প্রতিটি বিভাগে একজন করিয়া সচিব নিযুক্ত হইল। তাহারা সকলেই ছিলেন উচ্চপদস্থ সিভিল সার্ভেণ্ট। ইহা ছাড়া প্রতিটি প্রদেশে হিসাবরক্ষক, কোষাধ্যক্ষ, পোস্ট মাস্টার জেনারেল এবং আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইলেন।

বড়লাটই শাসন-ব্যবস্থার কর্ণধার

ভারতীয় জেলাগুলিতেও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রচুর ক্ষমতা থাকিলেও তাহাদের প্রতিটি কাজের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহি করিতে হইত। অর্থদপ্তরের অনুমতি ছাড়া এক কপর্দকও খরচ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। এইভাবে কোম্পানীর শাসনকালে কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসনের মধ্য দিয়া ভারতকে শোষণ করিবার সব বন্দোবস্ত ইংরেজ সরকার করিয়াছিল।

জেলার শাসন

ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের শাসনকালে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন। ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত শাসনব্যবস্থার কুফল বুঝিতে পারিয়া ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালের শুরুতেই ইহা তুলিয়া দেওয়া হয়। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ হইতে কোষাগার কলকাতায় স্থানান্তরিত হইলে ইহার উপর জগৎশেঠ ও অন্যান্য ভারতীয় মহাজনদের প্রভাব কমিয়া যায়। রাজস্ব ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত করিবার জন্য হেস্টিংস ১৭৭৩-৭৫ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা, পাটনা ও মুর্শিদাবাদের তৎকালীন টাকশালগুলি বন্ধ করিয়া দেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন



ওয়ারেন হেস্টিংস

এইভাবে টাকা তৈয়ারীর উপর কলিকাতার একচেটিয়া অধিকার বর্তায়। তখন হইতেই জগৎশেঠ ও তাঁহার পরিবারদের দৈনদশা শুরু হয়। তিনটি ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ভারতীয় মহাজনদের দেশের অর্থনীতির উপর প্রভাব কমিয়া যায়। এই ব্যাঙ্কগুলি ব্যাঙ্ক নোট বাজারে ছাড়িত এবং ঋণ ও রাজস্ব সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি করিত। ব্রিটিশদের কাজে নিযুক্ত ভারতীয় বেনিয়াদের জায়গায় ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থাগুলিই ক্রমে ব্রিটিশ ভারতকে শোষণ

করিবার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে বোর্ড অফ রেভেনিউ নামক একটি প্রশাসনিক সংস্থা গঠন করিয়া রাজস্ব দপ্তর এই সংস্থার অধীনে আনা হয়।

রাজ্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী প্রশাসনিক সংগঠনেও মন দেয়। তরবারি বা কূটকৌশলের সাহায্যে যে সাফল্য কোম্পানী অর্জন করে তাহাকে সংহত করিবার জন্য দ্রুত প্রশাসনিক বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস শাসন-সংস্কারে কিছুটা নজর দেন, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। কর্নওয়ালিসের আমলে সাম্রাজ্য সংহত করিবার কাজ ব্যাপকভাবে চলে। কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের কাজের শর্ত ও নিয়মকানুন পরিবর্তন, বাংলদেশে বিচারব্যবস্থার সংস্কার এবং রাজস্ব ব্যাপারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করিয়া তিনি অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়া যান।

কর্নওয়ালিসের শাসন সংস্কার



লর্ড কর্নওয়ালিস

কোম্পানীর আমলে বিচার ব্যবস্থা। কোম্পানীর যুগে যে শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে তাহাতে বিচারব্যবস্থার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হেস্টিংস সর্বপ্রথম বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁহার প্রবর্তিত কমিটি অব সার্কিটের সুপারিশ অনুসারে প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া মফস্বল দেওয়ানী আদালত এবং মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত গঠিত হয়। জেলায় কালেক্টরগণ দেওয়ানী আদালতের বিচারক হন এবং ফৌজদারী আদালতের বিচারক হন কাজী। ইহা ছাড়া কলিকাতায় দুইটি পৃথক্ বিচারালয় স্থাপন করা হয়। এই দুইটির নাম হইল যথাক্রমে সদর দেওয়ানী আদালত এবং সদর নিজামত আদালত। এই দুই আদালতে যথাক্রমে মফস্বল দেওয়ানী আদালত ও মফস্বল ফৌজদারী আদালত হইতে পাঠানো আপীলগুলির মীমাংসা হইত। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারের দায়িত্বে ছিলেন গভর্নর ও তাঁহার কাউন্সিলের দুইজন সদস্য। সদর নিজামত আদালতের উপর ইংরেজ বিচারকরা নজর রাখিতেন।

বিচারব্যবস্থার কাঠামো

হেস্টিংসের আমলে

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস বিচার বিভাগে পুনরায় সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি ছয়টি প্রাদেশিক কাউন্সিল বা পরিষদের বিচার ক্ষমতা ছয়টি দেওয়ানী আদালতে হস্তান্তরিত করেন। প্রতিটি দেওয়ানী আদালতে কার্যাদির পরিচালনায় দায়িত্ব কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কিছু পরেই এই আদালতের

সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১৮টি করা হয়। ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার দায়িত্বও জেলা আদালতের বিচারকদের দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যাণ্ডের আইন অনুসারে এখানে বিচারকার্য পরিচালিত হইত। অপরদিকে দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালতের কাজ চলিত ভারতীয় আইন অনুযায়ী। ফলে এদেশে দুইপ্রকারের আইন প্রচলিত হইল এবং স্বভাবতই বিচারক্ষেত্রে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইল। হেস্টিংস-এর শাসনকালে অবশ্য আদালতের কার্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হয়। হেস্টিংস-এর পর লর্ড কর্নওয়ালিস বিচারব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন লইয়া আসেন। তিনি প্রথমেই সদর নিজামত আদালত কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল এই বিচারালয়ের বিচারকার্যের সর্বেসর্বা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তনের পর দেওয়ানী বিচারব্যবস্থাকে রাজস্ব বিভাগ হইতে পৃথক করা হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে কালেক্টরদের বিচার ক্ষমতা বাতিল করা হয় এবং তাহা দেওয়ানী বিচারকদের হাতে দেওয়া হয়। জেলা বিচারালয়গুলির উপর চারিটি প্রাদেশিক আপীল আদালত স্থাপন করা হয়। এই সকল আপীল আদালতে ইংরেজ জজ নিযুক্ত করা হয়। ফৌজদারী ভ্রাম্যমান বিচারালয়গুলির দায়িত্বও ইংরেজ বিচারকদের হাতে দেওয়া হয়। বিচার-ব্যবস্থার সর্বনিম্নে ছিল সদর আপীল ও মুনসেফী আদালত। কর্নওয়ালিসের শাসনকালে বিচার বিভাগ ও আইন সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য বিধি-সমূহ রচনা করা হয়, ইহা 'কর্নওয়ালিস কোড' (Cornwallis Code) নামে পরিচিত। ইহাকে কর্মচারীদের সততা, দায়িত্ববোধ, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নির্দেশ ছিল।

বিচারব্যবস্থার জটিলতা

কর্নওয়ালিসের সংস্কার

কর্নওয়ালিস কোড

লর্ড কর্নওয়ালিসের পর বিচার বিভাগের সংস্কার করেন লর্ড বেণ্টিঙ্ক। তিনি ভ্রাম্যমান প্রাদেশিক আপীল আদালতগুলি তুলিয়া দেন এবং কালেক্টরদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করেন। উচ্চ আদালতে ইংরেজী ভাষায় ব্যবহার আবশ্যিক করেন। তাঁহার শাসনকালে গভর্নর জেনারেল পরিষদের আইন সদস্য হিসাবে লর্ড মেকলে ভারতীয় দণ্ডবিধি রচনা করেন। ইহার ফলে ভারতের সকল ব্রিটিশ এলাকায় একই ধরনের আইন প্রচলিত হইল। ইহার পূর্বে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ বিভিন্ন আইন ও নিয়মকানুন চালু ছিল। ফলে বাণিজ্য, শিল্প ও বেসামরিক রাজকর্মে নানা অসুবিধা দেখা দিত। এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা সংস্কারের মধ্য দিয়া ভারতে কোম্পানীর যুগে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা একটি সুনির্দিষ্ট রূপলাভ করে।

পেনাল কোড

পুলিস ব্যবস্থা। ভারতে ইংরেজ শাসনরূপ ইমারত যে কয়টি স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া ছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল পুলিস। পুলিস ব্যবস্থার প্রবর্তক ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি ফৌজদার নামে অভিহিত দেশীয় পুলিস অফিসারদের প্রতিটি জেলায় নিযুক্ত করেন। প্রতিটি ফৌজদারী থানার সহিত একটি করিয়া জেলখানাও স্থাপিত হইল। ফৌজদারের অধীনে ৩৪ জন কর্মচারী থাকিত; তাহাদের

মধ্যে ২০ জন ছিল সেপাই। অল্পসংখ্যক লোক লইয়া সমগ্র জেলায় শান্তি রক্ষা করা ফৌজদারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ফৌজদারদের পদ তুলিয়া দেওয়া হয় এবং কোম্পানীর দেওয়ানী আদালতের জজেরা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা লাভ করেন ও ফলে পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব পান। এই জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ ছিল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করিয়া ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ করা। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের অধীনে নাজির, একজন জেল অফিসার, কয়েকজন কেরাণি এবং ২৫ হইতে ১৫০ জন বরকন্দাজ থাকিত। লাঠি তাহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল এবং কদাচিৎ গাদা বন্দুক দেখা যাইত।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে পুলিস ব্যবস্থা

কর্নওয়ালিস পুলিস ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন লইয়া আসেন। শান্তিরক্ষার জন্য তিনি প্রতিটি জেলা কয়েকটি থানায় বিভক্ত করেন। প্রতিটি থানার একজন ভারতীয় দারোগা নিযুক্ত করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থানার কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন। এতদিন পর্যন্ত জমিদারগণ পাইক-বরকন্দাজ রাখিয়া নিজেদের এলাকায় শান্তিরক্ষা করিতেন কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার ফলে সে দায়িত্ব হইতে তাঁহারা মুক্তি পাইলেন। কলিকাতায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অধীনে পুলিস বাহিনী গঠন করা হইল। পরে প্রতিটি জেলায় শান্তিরক্ষার জন্য পুলিস প্রধান বা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিস নামে উচ্চপদস্থ পুলিস কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। তবে পুলিস বিভাগের উচ্চ পদগুলিতে ইংরেজদেরই নিয়োগ করা হইত। ভারতীয়রা অবশ্য দারোগার পদ পাইত। গ্রামের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ছিল চৌকিদারের উপর। ইহাদের বেতন গ্রামবাসীদেরই দিতে হইত। পুলিস বিভাগ ধীরে ধীরে ডাকাতির মত গুরুতর অপরাধ কিছুটা দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তবে ব্রিটিশ আমলে পুলিস কর্মচারীরা অধিকাংশই ছিল দুর্নীতিপরায়ণ সাধারণ লোক ইহাদের ডাকাতের চেয়েও বেশি ভয় করিত।

কর্নওয়ালিসের শাসনকালে পুলিশ ব্যবস্থা

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। ইংরেজদের ভারত বিজয়ের ফলে কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তনই নয়, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও বিরাট পরিবর্তন ঘটে। বাংলা বিজয়ের সময় হইতেই ভারতের সম্পদ ইংল্যাণ্ডে চলিয়া যাইতে থাকে। এই অবাধ অর্থনৈতিক শোষণ ভারতকে নিঃস্ব করিয়া দেয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ শোষণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। কৃষকদের নিকট হইতে সংগৃহীত ভূমি-রাজস্ব ছিল ভারত ইংরেজ সরকারের রাজস্বের প্রধান উৎস। কিন্তু ইংরেজ সরকার কৃষি উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ইহার জন্য কোম্পানীকে বহু যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই যুদ্ধের জন্য প্রচুর ব্যয় হইত। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই যুদ্ধের জন্য এক কপর্দকও খরচ করিতে রাজী ছিল না। তাহারা মনে করিত যে ভারতে যুদ্ধ বা

শান্তির সময়ে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহার সবটাই ভারত হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর একটা বিরাট অংকের অর্থ ইংল্যাণ্ডে পাঠাইতে হইত কোম্পানীর অংশীদারদের লভ্যাংশ দিবার জন্য। তখনকার দিনে সরকারের আয়ের উৎস খুবই সীমিত ছিল। ভূমি-রাজস্বই ছিল সরকারের প্রধান আয়। স্বভাবতই কৃষকদের উপর গুরুভার খাজনা ধার্য করা হইল। কোম্পানী ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।

ভূমি-রাজস্বই সরকারের প্রধান আয়

হেস্টিংসের ভূমি-রাজস্ব নীতি ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের প্রাপ্ত রাজস্বের প্রচুর ক্ষতি হইতে থাকে। ডিরেক্টরগণ কর্নওয়ালিসকে ভূমি-রাজস্বের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি জেলার কালেক্টর, দেওয়ান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে জমির মালিকানা, রাজস্বের পরিমাণ, সংগ্রহ ব্যবস্থা, কৃষকদের অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। গভর্নর জেনারেলের পরিষদে এগুলি লইয়া খুঁটিনাটিভাবে বিচার-বিবেচনা করা হয়। ইহার উপর নির্ভর করিয়া ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে কর্নওয়ালিস জমিদারদের সঙ্গে দশশালা অর্থাৎ দশ বৎসরের জন্য জমির বন্দোবস্ত করেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বলিয়া ঘোষিত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন

ওয়ারেন হেস্টিংসের স্বল্পমেয়াদী বন্দোবস্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইজারাদারগণ প্রতিশ্রুত অর্থ সম্পূর্ণ আদায় করিতে না পারিয়া যাহা আদায় করিত তাহা লইয়াই পলাইয়া যাইত। ইহাতে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হইত। এই অবস্থার অবসানকল্পে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। তাহা ছাড়া একটি অনুগত জমিদার সম্প্রদায় গঠন করিবার উদ্দেশ্যে, কৃষির, উন্নয়নের জন্য এবং সরকারের রাজস্ব খাতে আয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করিবার প্রয়োজনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়।

উদ্দেশ্য

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলকথা হইল এই যে একটি নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে কোম্পানীকে (ইংরেজ সরকারকে) নির্দিষ্ট খাজনা দিয়া জমিদারগণ বংশানুক্রমে জমির মালিক হইতে পারিবেন। জমিদারগণ আর পূর্বেকার মত কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রাহক রহিবেন না। কোম্পানীকে দেয় খাজনা চিরকালের জন্য নির্ধারিত হইল। একমাত্র নির্দিষ্ট দিনের সূর্যাস্তের পূর্বে রাজস্ব না দিতে পারিলেই জমিদারি হারানোর ভয় ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব দিতে না পারিলে সূর্যাস্ত আইনের বিধান অনুয়ায়ী জমিদারি প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রয় করা হইবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান সুফলগুলি নিম্নরূপ ছিলঃ এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ স্থায়ীভাবে জমির মালিক হওয়ায় জমির তথা কৃষির উন্নতি সাধনে তৎপর হয়। রাজস্ব ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন বন্ধ হওয়ায় কৃষকদের সুবিধা হয়। সরকার রাজস্ব খাতে নির্দিষ্ট বার্ষিক আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ায় তাহার পক্ষে বাজেট তৈয়ারি করা সহজ হয়। চিরস্থায়ী

এই ব্যবস্থার ভালো দিক

সম্প্রদায়ের ফলে সরকারের অনুগত একটি প্রভাবশালী জমিদার শ্রেণী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যাঁহারা বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সূর্যাস্ত আইনের অত্যন্ত কঠোর নিয়মের নিন্দা করিয়াছেন। প্রথমত, সূর্যাস্ত আইনে কয়েকটি প্রাচীন জমিদার পরিবার সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থার দ্বারা কেবল জমিদারদের স্বার্থই রক্ষা হয়, প্রজাদের স্বার্থ দেখা হয় নাই। জমিদারগণ নিজেদের খেয়ালখুশিমত প্রজাদের উপর অত্যাচার চালানো এবং তাহাদের জমি হইতে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা লাভ করেন।

খারাপ দিক

যে জমি চাষ করে তাহাকে সেই জমির মালিক বলিয়া আইনে স্বীকার করা হয় এবং সরকার তাহার নিকট হইতে সরাসরি ভূমি-রাজস্ব আদায় করে। এই ব্যবস্থাকে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা বলা হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে (বর্তমান তামিলনাড়ু) এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। পরে মহীশূর, বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ইহা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থায় জমিদারদের বদলে মিরাসদার ও তাহাদের মত সব কৃষকদের জমির মালিক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এই ব্যবস্থায় রাজস্বের হার উৎপন্ন শস্যের ৪৫ হইতে ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত ধার্য করা হইয়াছিল। ভূমি-রাজস্বের এই উচ্চ হারের ফলে কৃষককুল সর্বস্বান্ত হয়।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থা

উত্তর ভারতে বারাণসী পর্যন্ত ভূমি-রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হইয়াছিল। অযোধ্যা, বুন্দেলখণ্ড, এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় নাই। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তখন যত বেশি পারা যায় রাজস্ব আদায়ের নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। ফলে এইসব অঞ্চলে মহলওয়ারী রাজস্ব প্রথা প্রচলিত হইল। আমরা যে-কোন ভূসম্পত্তির এলাকাকে 'মহল' বলি, সেজন্য যে বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইল তাহা মহলওয়ারী বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। যে সব অঞ্চলে গ্রাম-সমাজ বর্তমান ছিল সেই অঞ্চলের গ্রামগুলির জরিপ করা হইল। অধিকার-সংক্রান্ত নথি প্রস্তুত করা হইল এবং গ্রাম-সমাজগুলির প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য গ্রাম-সমাজের মোড়লদের বা সরকারকে ভূমি-রাজস্ব দিবার জন্য যে দায়ী থাকিবে সেইরূপ ব্যক্তিদের তালিকা তৈয়ারী করিতে হইল।

মহলওয়ারী ব্যবস্থা

জমিদারী, রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারী বন্দোবস্তের লক্ষ্য একই ছিল—কৃষক সম্প্রদায়কে মাধ্যম করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করা। ফলে এই তিনটি বন্দোবস্তই শোষণমূলক ছিল বলিয়া কোম্পানীর আমলে চাষের উন্নতি হয় নাই। কারণ কোম্পানী সমগ্র ব্রিটিশ ভারতকে তাহাদের মহল বা জমিদারী বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল এবং জমিকে সকল প্রকার রাজস্বের মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক উৎস বলিয়া মনে করিয়াছিল। ফলে কৃষকগণ নিছক মজুরের অবস্থায় পরিণত হয়। তাহাদের চিরদিন সম্পদহীন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থাই এই তিনটি বন্দোবস্তের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

তিনটি ব্যবস্থার মূল্যায়ন

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের যুগে ভারতীয় শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসা চরম দুর্যোগের সম্মুখীন হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধ কেবলমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ভারতের এক যুগসন্ধিক্ষণ। পলাশীর যুদ্ধের পর অরাজকতা ছাড়াও কতকগুলি প্রত্যক্ষ কারণ দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের পতনের জন্য দায়ী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারত সমৃদ্ধিশালী দেশ ছিল। কারণ তখনও তাহার শিল্প ও কৃষি যথেষ্ট ফলপ্রসূ ছিল। কিন্তু ইহার পরই ভারত দরিদ্রতম দেশে পরিণত হয়। ইহার কারণ হইল দুইটি—(ক) এদেশের সমৃদ্ধিশালী এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চাপে দুর্বল ও নষ্ট হইয়া গেল। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতি ব্রিটেনের অর্থনীতির প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল করিয়া দেওয়া হইল। (খ) বহুলোক জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইল।

ভারতের অর্থ নৈতিক দুর্দশা শুরু

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, মধ্যযুগে মুসলমান শাসকগণ তৎকালীন রাষ্ট্রীয় শক্তিকে ধ্বংস করিলেও এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করে নাই। ভারতীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বরঞ্চ বেশ কিছুটা উন্নতিই করিয়াছিল। সরকারী তত্ত্বাবধানে কয়েকটি শিল্প করখানাও গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ বিজেতারা ভারত শাসন ও শোষণের ক্ষেত্রে এক নূতন রীতি ও নীতি প্রবর্তন করে। তাহারা ভারতের চিরাচরিত অর্থনৈতিক ভিত্তি বিধ্বস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হয়।

মধ্যযুগে অর্থ নৈতিক কাঠামো

পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্বেই ইংরেজ বণিক কোম্পানী ভারতে আসিয়া ব্যবসা শুরু করে। প্রথমে ইহা সাধারণ বাণিজ্য কোম্পানীই ছিল। তাহারা ভারত হইতে বিভিন্ন দ্রব্য ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করিত। এই সময় ভারতে ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যের চাহিদা ছিল না। ফলে ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য তাহাদের স্বর্ণ বা রৌপ্য আমদানি করিতে হইত। ইহা যাহাতে বন্ধ করা সম্ভব হয় তাহার জন্য কোম্পানী দুইটি নীতি অনুসরণ করিয়াছিল—ভারতে অপর কোন ইংরেজ বা ইউরোপীয় কোম্পানীকে বাণিজ্য করিতে না দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য হইতে বিতাড়নের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করাই ছিল কোম্পানীর মূল লক্ষ্য। ইহার জন্য কোম্পানীকে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় কোম্পানীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় পরাজিত করা প্রথমদিকে সম্ভব না হইলেও দিল্লীর দুর্বল বাদশাহ ফাররুখশিয়রের নিকট হইতে সুরম্যান দৌত্যের ফলে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ ব্যবহার করিয়া কোম্পানী শক্তি সঞ্চয় করে। এই পরিবেশে ইংরেজরা উপলব্ধি করে যে যদি তাহারা বিভিন্ন আঞ্চলিক নবাবী দরবারে রাজনৈতিক

প্রাথমিক যুগে কোম্পানীর বাণিজ্যনীতি

মূল লক্ষ্য

প্রাধান্য অর্জন করিতে পারে, তাহা হইলে দেশীয় বণিকদের ব্যবসাক্ষেত্র হইতে উৎখাত করা কঠিন হইবে না। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর ইহা সম্ভব হইল। বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে বাংলার নবাবগণ ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হইলেন। এই সময় ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদেয় জন্য বাংলা তথা ভারতের ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা দেশের লোককে অল্পদামে জিনিস বিক্রয় করিতে ও বেশি দামে জিনিস ক্রয় করিতে বাধ্য করিত। এ দেশের লোককে বঞ্চিত করিয়া শিল্প ও ব্যবসায়ে ইংরেজরা যে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিত তাহার এক কপর্দকও এদেশে থাকিত না। ইংরেজ কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের আক্রমণ হইতে দেশীয় বণিক ও ব্যবসাদারদের রক্ষার জন্য মীরকাশিম চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন।

দেশীয় বণিকদের হঠাইবার ব্যবস্থা

বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার পর কোম্পানী এ দেশে যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিল তাহাতে ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প নষ্ট হইয়া যায়। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্দেশ দেন যে, বাংলার রেশমী বস্ত্র বুনিবার পথ বন্ধ করিয়া লোককে কেবল রেশম উৎপন্ন করিতে উৎসাহ দেওয়া হউক, আবার যাহারা রেশমী সূতা কাটে তাহাদের কোম্পানীর কুঠিতে কাজ করিতে বাধ্য করা হউক। তাহারা নিজ নিজ গৃহে যাহাতে কাজ করিতে না পারে আহার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটি স্বীকার করিয়াছিল—ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের শিল্প নষ্ট করাই ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কোম্পানীর নীতিতে শিল্পপ্রধান বাংলা তথা ভারতের সমগ্র চেহারাই বদলাইয়া গেল। ব্রিটেনের শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্ররূপে ভারতকে পরিণত করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছিল।

শিল্প ধ্বংস করিবার সুপরিকল্পিত নীতি

বাংলার যন্ত্রশিল্প ছিল ঈর্ষার বস্তু। সপ্তদশ শতকে কুটির শিল্প-কারখানাগুলি ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইউরোপীয় ও এদেশীয় বাজারগুলিতে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। উড়িষ্যা হইতে পূর্ব বাংলা পর্যন্ত যাইবার সময় মনে হইত যেন সমগ্র দেশটা বস্ত্র উৎপাদনের স্থান। ঢাকার মসলিন ইউরোপের সকল দেশেই অতিশয় সমাদর লাভ করিয়াছিল। পশম শিল্প, রেশম শিল্প, রঞ্জন শিল্পের বিশেষ উন্নতি ঘটিয়াছিল। কোম্পানী এইসব শিল্প ধ্বংস করিবার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথমেই কাপড়ের ব্যবসায়ে কোম্পানী একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করিল। ফলে দেশের প্রতিটি তাঁতী এবং উৎপাদককে ইহার সর্বনাশা ফল ভোগ করিতে হয়। প্রতি কারিগর কতটা পণ্য সরবরাহ করিবে এবং সেজন্য তাহারা কত মূল্য পাইবে তাহা খেয়ালখুশিমত স্থির করা হইত। তাঁহারা খোলাবাজারে তাহাদের কাপড় বিক্রয় করিতে পারিলে যাহা মূল্য পাইত, কোম্পানী তাহা অপেক্ষা শতকরা ৪০ ভাগ কম মূল্য দিত। কোম্পানীর লোকেরা বলপূর্বক তাঁতীদের এই অল্পমূল্যে কাপড় বিক্রয় করিতে বাধ্য করিত। কোম্পানী দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল বলিয়া তাহারা আপত্তি করিতে পারিত

বাংলার উন্নত বস্ত্রশিল্প

বস্ত্রশিল্প কিভাবে ধ্বংস করা হয়

না। ১৭৯০ দশকে কোম্পানীর লোকেদের হাতে তাঁত শিল্পীদের অত্যাচারিত হইবার বহু ঘটনা ঘটিয়াছিল। নির্ধারিত সাপ্তাহিক উৎপাদন পূরণ না করিলে কোম্পানীর কর্মচারীরা তাঁতীদের জেলে আটক রাখিত।

অন্যান্য শিল্প

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর আগে অবধি ভারত হইতে ব্রিটেনে বস্ত্র রপ্তানি হইত। উনিশ শতক শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার বদলে এখান হইতে ব্রিটিশ বস্ত্র কারখানার জন্য সুতা চালান যাইত। ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় বস্ত্র আমদানি বন্ধ করিবার জন্য তাহার উপর ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপাইয়া দেওয়া হইল। ফলে বস্ত্রশিল্প রপ্তানি বন্ধ হইল ও বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হইল।

ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয় করিবার নূতন নীতি

অষ্টাদশ শতকের শেষ দশকে ইংল্যাণ্ডের ম্যানচেষ্টারে বাষ্পচালিত কারখানায় প্রস্তুত তাঁতের কাপড়ের প্রথম চালান ভারতের বাজারে আসিল। ভারতে সে কাপড়ের চাহিদা তখন ছিল না। তাহার চাহিদা বৃদ্ধি করিবার জন্য কোম্পানী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করিল। কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলে অসংখ্য সরকারী চৌকি স্থাপন করা হইল। সে-সব চৌকিতে ইংল্যাণ্ডে তৈয়ারী পণ্যের জন্য শুল্ক দিতে হইত মাত্র শতকরা দুই টাকা আট আনা আর দেশী কাপড়ের জন্য সতের টাকা আট আনা। ফলে দেশীয় বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হইয়া গেল। কেবলমাত্র তাঁতশিল্পই নয়, কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারের ফলে ভারতের সবগুলি শিল্পই নষ্ট হইয়া গেল।

ব্রিটিশ পুঁজি নিয়োগ

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ব্রিটেনের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ভারতে অর্থ বিনিয়োগ করিতে শুরু করে। ফলে প্রাচীন শিল্পগুলি ধ্বংস হইল এবং ভারত ব্রিটেনের কল-কারখানাগুলির কাঁচামাল সরবরাহের যোগানদাররূপে গণ্য হইল। অপরদিকে তাহাকে পরিণত করা হইল ব্রিটেনের শিল্পোৎপন্ন পণ্যের নিশ্চিত ক্রেতারূপে।

ভারতে প্রতিক্রিয়া

ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ ছিল বস্ত্রশিল্প। এই শিল্পকেই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এক রিপোর্টে বলেন, "ভারতবর্ষের সমতল ভূমিগুলিতে ভারতীয় তাঁতিদের দেহের হাড় ছড়াইয়া পড়িয়া ক্ষয় পাইতেছে।" শিল্পের বিশেষ করিয়া চিনিশিল্পেরও অনুরূপ দশা হইল। ব্রিটেনের কলকারখানা প্রস্তুত নানা জিনিসপত্রাদিতে ভারতীয় রাজ্যগুলি পূর্ণ হইয়া উঠে এবং কুটির শিল্প ধ্বংস হয়। কারিগরগণ পিতৃপুরুষের জীবিকাচ্যুত হইয়া বেকার হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোক জীবিকার অন্য উপায় না পাইয়া কৃষিকার্যে যুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি শহরগুলি ধ্বংস হইতে থাকে এবং কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি নগরগুলি শোষণের কেন্দ্র হিসাবে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে থাকে। সংক্ষেপে, কোম্পানীর শাসনকালে ভারতীয় অর্থনীতি একান্তভাবে পরনির্ভর হইয়া পড়ে। ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে যে দেশ অগ্রণী

ছিল সেই দেশ ব্রিটিশ শাসনের ফলে শিল্পে অনগ্রসর হইয়া পড়িল। ইহা বিশ্বের ইতিহাসে এক মর্মন্তুদ কাহিনী।

ব্যবসা বাণিজ্যে বিপর্যয়। বাদশাহী সনদ বলে ইংরেজ কোম্পানী এ দেশে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য করিতে পারিত। সেই অধিকারের সুযোগ লইয়া নিজ নিজ নৌকায় কোম্পানীর পতাকা তুলিয়া কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরাও বিনাশুল্কে ব্যবসা শুরু করিয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে 'দস্তক' বা ছাড় কিনিয়া অনেক ভারতীয় বণিক শুল্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিত। তাহার প্রতিকার করিতে গিয়া মীরকাশিম সিংহাসনচ্যুত হন। এই সময় ইংরেজ ব্যবসায়ী ও তাহাদের অনুচরদের অত্যাচারের ভয়ে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দোকান-বাজার-হাট বন্ধ হইয়া যাইত ও অধিবাসীরা পলাইয়া যাইত। কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের জন্য বাংলায় ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এমন কি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়েও দেশীয় লোকদের ব্যবসা করিতে বাধা দেওয়া হইয়াছিল।

কর্মচারীদের বেআইনী ব্যবসায় ও তাহার ফল

ইহা কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের কুফলের চরম দৃষ্টান্ত। সংক্ষেপে, পলাশীর যুদ্ধের ১৫ বৎসরের মধ্যেই বাংলার যে বাণিজ্যে বিভিন্ন রকমে অর্থাগম হইত সেই বাণিজ্য কোম্পানীর হস্তগত হইল। ধান, পাট, সূতী কাপড়, সিল্ক, চিনি, সুপারি, লবণ ইত্যাদির পরম লাভজনক পণ্যের একচেটিয়া অধিকার ইংরেজ কোম্পানী পাইল। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অবস্থা সঙ্গীন হইল।

একচেটিয়া ব্যবসার প্রভাব

কোম্পানীর বাণিজ্যও তখন হইতে খুবই বৃদ্ধি পাইল। চীনদেশে ব্যবসার ক্ষেত্র বাড়াইবার জন্য এদেশের টাকা পাঠান হইল। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতের কৃষি অর্থনীতি ব্রিটেনের শিল্প অর্থনীতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে ভারতের বাজার এবং বাজারগুলি ব্রিটিশ উৎপাদকের নিকট উন্মুক্ত হইল। বিনাশুল্কে বা নামমাত্র শুল্কে ব্রিটিশ পণ্য ভারতে আসিতে থাকিল। ভারতে ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার জন্য কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটিল। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, গ্রামাঞ্চলেও ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্য যাহাতে সহজেই পাওয়া যায় তাহার জন্য রাস্তাঘাট তৈয়ারি করা শুর হইল। ইহাতে অবশ্য রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য ক্রয় করিবারও সুবিধা হইল। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ব্রিটিশ বণিকদের সুবিধার জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল।

ভারতে অবাধ বাণিজ্য-নীতির প্রতিক্রিয়া

একচেটিয়া ব্যবসার সময় কোম্পানী ও তাহার গোমস্তারা লবণ, সুপারি, ঘি, খড়, বাঁশ, মাছ, আদা, চিনি, তামাক, আফিম প্রভৃতি বেচাকেনা করিত। অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও তাহাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তাহারা এইসব জিনিস বাজারদরের এক-চতুর্থাংশ দিয়া জোর করিয়া কাড়িয়া লইত। আবার জোর-জবরদস্তি মারফত তাহারা তাহাদের ক্রেতাদের নিকট হইতে এক টাকা দামের জিনিস পাঁচ টাকা লইত। ইহার

ফলে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ভাঙিয়া পড়ে। ভারতীয়দের ব্যবসার মাধ্যমে রুজিরোজগারের পথ বন্ধ হইয়া গেল। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিলোপ ঘটে। ব্রিটেনের ব্যবসায়ীরা ভারতের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে ব্যবসা শুরু করিল। ব্রিটিশ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য তথা মুনাফা বৃদ্ধি পাইল। ভারতের সহিত ব্রিটেনের বাণিজ্যের পরিমাণেও তারতম্য লক্ষ্য করা গেল। কিন্তু ভারতের নিজস্ব বাণিজ্যের উন্নতি হইল না। ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থপরতার শিকার গরীব ভারতবাসীকে আরও দীন-দরিদ্র করিল।

বহির্বাণিজ্য

ব্রিটেন ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশেও ভারতের পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পাইল। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকায় ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছিল ১৩৬৩৩ গাঁইট, ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে তাহা ২৫৮ গাঁইটে আসিয়া দাঁড়ায়। ভারতে পণ্য তৈয়ারীর শিল্প যেহেতু নষ্ট হইয়া গেল সেহেতু তাহাকে ব্রিটিশ পণ্য আমদানি করিতে হইল। সেইসব জিনিসের সে মূল্য শোধ করিতে থাকিল কৃষিজ দ্রব্যে।

আর্থিক নিকাশ

ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংসের সঙ্গে সমানে চলিল তাহার রক্তমোক্ষণ। পলাশীর যুদ্ধের পর দেশীয় সম্পদ স্রোতের ন্যায় ইংল্যাণ্ডে যাইতে লাগিল। ১৭৬৬ হইতে ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই তিন বৎসরে কেবলমাত্র বাংলায় আমদানি ও রপ্তানির যে হিসাব প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতে আমদানি হইয়াছে ৬০ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য আর রপ্তানি হইয়াছে প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য। যাহা আমদানি হইয়াছে তাহার দশ গুণ বাহিরে পাঠাইয়াছে।

ভারতে চিরাচরিত অর্থনীতিতে ভাঙন

কোম্পানীর শাসন এদেশে শিল্পের বিকাশ পর্যুদস্ত করিয়া দিয়াছিল। ভারতের বিরুদ্ধে অসম বাণিজ্য হার-এর ফলে ভারতের কারিগরভিত্তিক শিল্প উৎপাদন ধ্বংস হইয়া গেল। অথচ ভারত এক বিরাট শিল্পোৎপাদনকারী দেশ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ ভারতে পুঁজি নিয়োগ করিতে শুরু করে। ইহাতে তাহারা কাঁচামাল যেমন সস্তায় পাইল, তেমনি অল্প মজুরিতে ভারতীয়দের শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করিতে থাকিল। সেই সঙ্গে তাহাদের শিল্পপণ্যও চড়া দামে ভারতে বিক্রয় সম্ভব হইল।

অর্থনীতির রূপান্তর

কয়লাখনির সন্ধান মিলিবার পর কয়লার ব্যবসা বড় হইয়া উঠিল। তুলাশিল্প, পাটশিল্প, চা বাগান প্রভৃতি সবই ব্রিটিশ পুঁজি-পতিদের হাতে রহিল। তবে মনে করিলে ভুল হইবে যে কোম্পানীর শাসনকালে ইংরেজদের চেষ্টায় ভারতে শিল্প বিপ্লব দেখা দিয়াছিল। আসলে এই সময় যে পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা বাণিজ্যিক প্রসার মাত্র।

3.9.84

অষ্টম অধ্যায়

কোম্পানীর যুগে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি

দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করে তখনো এদেশে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল, যাহাকে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যায়। এই দেশীয় শিক্ষার উৎস ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি।

প্রচলিত শিক্ষার স্বরূপ

প্রাক্ কোম্পানী যুগে প্রধানতঃ তিন রকমের বিদ্যালয় ছিল—পরিষদ, টোল ও পাঠশালা। ইহার সঙ্গে ছিল মুসলমানদের জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা। পরিষদগুলি ছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের সভা। একমাত্র ব্রাহ্মণরাই ইহার সদস্য হইতে পারিতেন। পরিষদগুলির কাজ ছিল শাসকদের আইন-কানুন এবং রীতিনীতি গুলির ব্যাপারে সাহায্য করা। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র ছিল টোলগুলি। দেশের ধনী সম্প্রদায় এইগুলির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিত। প্রত্যেক ছাত্রকে টোলের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার জন্য ৮ হইতে ১২ বৎসর অধ্যয়ন করিতে হইত। পাঠশালাগুলি ছিল প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র। কিছুটা লিখিতে, পড়িতে এবং হিসাব রাখিতে শেখানোই ছিল এইগুলির লক্ষ্য। এই শিক্ষা অবৈতনিক ছিল না। গুরুমহাশয় ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লইতেন। এখানে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত না। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেরাই এখানে পড়িত।

শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা বলিয়া কিছু ছিল না। জমিদার ও আঞ্চলিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরাই নিজ নিজ অঞ্চলের কর্তা ছিলেন। শিক্ষা ব্যাপারে তাঁহারা মাথা ঘামাইতেন না। এ কারণে প্রাক্-কোম্পানী যুগকে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে সার্বিক অজ্ঞতা দেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তন। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন দেশের শাসন ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িল তখন কোম্পানীর শিক্ষানীতি কি হইবে এ সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ ভারতীয়গণ ইংরেজি ভাষা না শিখিলে প্রশাসনিক ব্যাপারে বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু কোম্পানী প্রায় পঞ্চাশ বৎসর (১৭৬৫-১৮১৩ খ্রীঃ) ধরিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তন করিলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিবে এবং কোম্পানী-অধিকৃত অঞ্চলের শান্তি বিঘ্নিত হইবে। এদিকে কিছুসংখ্যক ভারতীয়ের

ব্যক্তিগত প্রয়াস

মনে ইংরেজি ভাষা শিখিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এখানে আরবী ও ফারসী ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত তাঞ্জোর, রামনাদ প্রভৃতি স্থানে ভারতীয়দের জন্য ইংরেজি ভাষা শিক্ষার

জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কোম্পানী ও জনগণের মধ্যে বোঝাপড়া ঘনিষ্ঠ হইবে এবং আদান-প্রদান সহজসাধ্য হইবে, ইহাই ছিল এই বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। কলিকাতাতেও এই একই উদ্দেশ্যে ড্রামণ্ড, শেরবোর্ন প্রভৃতি কয়েকজন ইউরোপীয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

যে সমস্ত ইংরেজ ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনে প্রথম দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তাঁহাদের মধ্যে উইলিয়ম উইলবারফোর্স ও চার্লস গ্রাণ্টের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা ভারতে শিক্ষাপ্রসারে কোম্পানীকে দায়িত্ব লইবার জন্য দাবি জানান। কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ইংরেজি শিক্ষা প্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই কোম্পানীর শিক্ষা-নীতির পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৮০৭ হইতে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত লর্ড মিণ্টো ছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে সরকার যদি অর্থসাহায্য প্রদান না করেন তবে এদেশে শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সম্পূর্ণ লোপ পাইবে। কী প্রকার শিক্ষা ভারতীয়দের প্রয়োজন এবং এই ব্যাপারে কোম্পানীর কী দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত এ বিষয়ে তিনি ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে একটি প্রস্তাব রাখেন। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নবীকরণের সময় পার্লামেণ্টে শিক্ষা প্রসারের প্রশ্ন ওঠে এবং ও বিষয়ে একটি গঠনমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহাতে বলা হয়, "এদেশে প্রাচ্যবিদ্যার পরিপোষকতা এবং ইউরোপীয় শিক্ষার প্রচারের জন্য কোম্পানী বৎসরে এক লক্ষ টাকা খরচ করিবে।" এই প্রস্তাবের দ্বারা ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে কোম্পানীর দায়িত্ব পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের বিরোধিতা

মিণ্টোর নীতি

শিক্ষাখাতে সরকারী অর্থবরাদ্দ

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত খ্রীস্টান মিশনারীদের ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাধা-নিষেধ ছিল। এই কারণে উইলিয়াম কেরী ও তাঁহার সহকর্মিগণ ওলন্দাজ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে একটি মিশন স্থাপন করেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়-সমূহে ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষা ও খ্রীষ্টধর্মের মূলনীতি সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হইত। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদে ভারতে মিশনারীদের অবাধ কাজকর্মের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে বিভিন্ন মিশনারী প্রতিষ্ঠান ভারতে আসিয়া বিভিন্ন স্থানে স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এইগুলির মধ্যে লণ্ডন মিশন, স্কটিশ মিশন, চার্চ মিশন, ওয়েশলিয়ান মিশন, ব্যাপটিস্ট মিশনের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। ১৮১৩ হইতে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই চল্লিশ বৎসরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসারে মিশনারীগণ বিশিষ্ট অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরী, জন মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড এই তিনজন বা ত্রয়ীর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে কেরী ও তাঁহার সহযোগীরা শ্রীরামপুরে কলেজ স্থাপন করেন।

মিশনারীদের প্রচেষ্টা

প্রথমদিকে প্রধানতঃ বেসরকারী প্রচেষ্টায় ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে কয়েকজন জনহিতৈষী বাঙালী শিক্ষিত ব্যক্তি, কয়েকজন উদারস্বভাব ইংরেজ ও কোন কোন খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক অগ্রণী হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রসারের একজন পথিকৃৎ ছিলেন। ইতিমধ্যে ডেভিড হেয়ার এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারক স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের অমূল্য সহযোগিতা এবং রাধাকান্ত দেব প্রমুখ হিন্দু নেতাদের সৎপ্রচেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু কলেজ (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন রায়ও একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইউনিয়ন স্কুল, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী স্থাপন প্রভৃতিও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এমনকি সুদূর মফঃস্বল অঞ্চলেও ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। হিন্দু কলেজ স্থাপনের অব্যবহিত পরে মূলত ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে 'স্কুল বুক সোসাইটি' এবং পর বৎসর 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' স্থাপিত হয়। কলিকাতা শহরে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন ও প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ এই সংস্থা দুইটির উদ্দেশ্য ছিল।

হিন্দু কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি

ইতিমধ্যে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সচেষ্ট হইয়া ওঠে। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষা ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ ও পরামর্শ দানের জন্য সপার্ষদ্ গভর্নর জেনারেল 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' নামে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৩ জন সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির সকলেই ছিলেন ইংরেজ। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন। তিনি প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের জন্য সরকারী অর্থব্যয়ের পক্ষে ছিলেন। প্রাচ্য, না পাশ্চাত্ত্য, কোন্ ধরনের শিক্ষা সরকারী সাহায্য পাইবে সে সম্পর্কে বিতর্কের ঝড় ওঠে। মোট ১০ জন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন প্রাচ্যশিক্ষার উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন, আর পাঁচজন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করা উচিত বলিয়া মনে করেন। রামমোহন রায় প্রমুখ ভারতীয় মনীষীরা মনে করেন যে, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ভিন্ন ভারতের অজ্ঞানতা ও জড়তা দূর করা যাইবে না। এই পরিস্থিতিতে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে (১৮৩৫ খ্রীঃ) গভর্নর জেনারেলের আইন-সচিব হিসাবে টমাস ব্যাবিংটন মেকলে ভারতে আসেন। তাঁহার উপর সরকারী শিক্ষানীতি নির্ধারণ করিবার ভার ন্যস্ত হইল। তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ মন্তব্যে ভারতীয়দের ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। মেকলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের দ্বারা ভারতে এমন একটি শ্রেণী গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা শুধু নামে ও রঙেই থাকিবে ভারতবাসী, কিন্তু মনেপ্রাণে, ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাহারা হইবে পুরাপুরি ইংরেজ।

শিক্ষার মাধ্যম লইয়া মতবিরোধ

তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল বেণ্টিঙ্ক মেকলের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি মানিয়া লন। ফলে ভারতে ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতি নির্দিষ্ট হইয়া যায়। স্থির হইল যে, শিক্ষার জন্য যে সরকারী অর্থ মঞ্জুর করা হইবে তাহা ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য ব্যয় করা হইবে। ইহার ফলে ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা

প্রচলনের পথ সুগম হইল। প্রায় প্রতি জেলায় সরকারী জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহে মাতৃভাষা শিক্ষার কথা লোকে ভুলিতে বসিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দেই সরকার কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৩৫ হইতে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সরকার পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জন্য যাবতীয় টাকা ব্যয় করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' পুনর্গঠিত হইয়া 'কাউন্সিল অফ এড্যুকেশন' নামে পরিচিত হইল।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী সনদ নূতন করিয়া দিবার সময় পার্লামেণ্টে ভারতে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ফলে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের পক্ষে চার্লস উড উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে এক ডেসপ্যাচ বা পরিকল্পনা পাঠান। ইহার ফলে ভারত সরকার শিক্ষানীতির কিছু পরিবর্তন করেন। পরবর্তী কালে ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে যাহা কিছু পরিবর্তন ঘটে, তাহার মূলে এই উড সাহেবের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় এই দেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং পৃথক্‌ভাবে শিক্ষা বিভাগ গঠন করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে বহু কলেজ ও স্কুল গড়িয়া ওঠে, ফলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা দেশব্যাপী ছড়াইয়া পড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

মাতৃভাষায় শিক্ষার অবনতি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইংরেজী শিখিবার প্রবণতার ফলে দেশী শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা সঙ্গীন হইয়া পড়ে। সরকার এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অনুরাগীদের দেশজ শিক্ষার প্রতি কোন মমতাই ছিল না। এডাম সাহেব তাঁহার রিপোর্টে দেশীয় শিক্ষা তথা পাঠশালাগুলিকেই জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ হিসাবে গণ্য করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সুপারিশ কেহ গ্রাহ্য করিল না। ফলে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা সঙ্গীন হইল। উডের ডেসপ্যাচে অবশ্য দেশজ পাঠশালাগুলিকে অর্থসাহায্য করা হইবে বলা হয়। কিন্তু ইহা কার্যে সামান্যই রূপায়িত হইয়াছিল। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য বছরে ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছিল সমগ্র ভারতের মাত্র হাজার টাকা। সমগ্র বাংলাদেশে সরকারী অনুমোদিত এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩টি।

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সহিত পরিচিতির ফসল ঃ নূতন চিন্তার বিকাশ। অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হইলে ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অন্ধকার যুগে দেখা দেয়। রাজনৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিবার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতি ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। ধর্ম ও নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়। এই সময়ে চিরাচরিত প্রথা, ঐতিহ্য ও কুসংস্কার ভারতবাসীর জীবনকে পরিচালিত করিত। ভারতবাসীর ধ্যান ধারণায় যুক্তিবাদের কোন স্থান ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয়

শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়। তাহারা শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ সকল ক্ষেত্রেই এক অভাবনীয় অভ্যুদয়ের সূচনা হয় যাহা সাধারণভাবে 'নবজাগরণ' নামে অভিহিত। তাহাদের জীবন অনেক পরিমাণে নির্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের মনের অনেকখানি কুসংস্কার ও গোঁড়ামি জুড়িয়া ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইংরেজ ও পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে বাঙালী তথা ভারতবাসীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ক্রমে পাশ্চাত্ত্য জগতের শিক্ষা-দীক্ষা ধ্যান-ধারণা এদেশের মানুষের মনেও প্রভাব বিস্তার করে। তাহারা যুক্তিবাদ, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তার স্বাধীনতা, সমালোচনা প্রভৃতিতে অভ্যস্ত হয়। ইহার ফলে তাহাদের জীবনধারা আধুনিক হইয়া ওঠে। এই পরিবর্তনকেই রেনেসাঁস বলা হয়। রেনেসাঁসের প্রভাবে ভারতে নূতন সমাজ, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, নূতন চেতনা গড়িয়া ওঠে। এই প্রসঙ্গে স্বনামধন্য ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয়ের একটি উক্তি উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন, "এই অভ্যুদয় সাহিত্যে, সমাজের পুনর্গঠনে, রাজনৈতিক আন্দোলনে, ধর্মসংস্কারে, এমন কি জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহারে প্রতিফলিত হইয়াছিল এবং ইহার প্রভাব বাংলার গণ্ডি পার হইয়া ঘূর্ণিজাত ছোট ছোট ঢেউ-এর ন্যায় সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।"

নবজাগরণ

ইউরোপের রেনেসাঁসের মত কিন্তু বাংলা বা ভারতের রেনেসাঁস সর্বব্যাপী ও গভীর ছিল না। ভারতে রেনেসাঁসের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণী ও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে নাই। এজন্য অনেকে উহাকে রেনেসাঁস বলিতে চাহেন না। পরাধীন দেশে পূর্ণ রেনেসাঁস হওয়া প্রায় অসম্ভব।

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার একদিকে যেমন সংঘাত সৃষ্টি হয়, অপরদিকে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ফলে দুইটি সভ্যতাই লাভবান হয়। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান প্রভাব হইল বিচারবোধের দ্বারা প্রাচীন অথচ গতানুগতিক ধারণা ও চিন্তা হইতে মনকে মুক্ত করা। এই স্বাধীন বিচারশক্তিই সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চেতনার প্রথম সোপান রচনা করে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মাধ্যমেই ভারতীয়গণ বিমুক্ত মনের অধিকারী হয়।

সামাজিক সংস্কার আন্দোলন। নূতন চেতনা সৃষ্টি ভিন্ন কোন সংস্কার আন্দোলনই শুরু হইতে পার না। ভারতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিস্তারের ফলে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে এক নূতন চেতনার উন্মেষ ঘটে। এই চেতনার মূল বৈশিষ্ট্য হইল যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। এই চেতনা ঊনবিংশ শতকে ভারতে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের পথ তৈয়ারী করে। ভারতের চিন্তাশীল মনীষীগণ তাঁহাদের সমাজের দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে বুঝিতে পারিলেন এবং সেগুলিকে যে সমূলে উৎপাটিত করা প্রয়োজন যে সম্বন্ধেও তাঁহারা একমত হন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতের ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সমাজ চেতনা

হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যাঁহারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখ মনীষিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাজিক যে কুসংস্কারগুলি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল সেগুলি হইল যথাক্রমে সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, কন্যা সন্তানদের হত্যা প্রভৃতি। তাঁহারা এই কুসংস্কারগুলির দ্রুত উচ্ছেদ সাধন করিতে কৃতসংকল্প হন। তাহা ছাড়া তাঁহারা বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ ও পর্দা প্রথার অবসান চাহিয়া ছিলেন। নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহারা আগ্রহী ছিলেন। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রতিবাদ জানান।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে দিকপালগণ

সতীদাহ প্রথার ন্যায় নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ বন্ধে রামমোহন আন্দোলন করেন। তিনি বাংলা ও ইংরেজীতে পুস্তিকা ও 'সংবাদ কৌমুদী' পত্রিকায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখিয়া প্রমাণ করেন যে শাস্ত্রানুসারে সহমরণ হিন্দু বিধবার অবশ্যকর্তব্য নয়। সরকারী বিবরণ অনুসারে ১৮১৫ হইতে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ৮০০০টি সতীদাহ ঘটিয়াছিল একমাত্র বাংলাদেশেই। প্রতি বৎসর ৭০০ মহিলা স্বামীর চিতায় পুড়িয়া মরিতেন। রাজস্থান ও পাঞ্জাবে এই কুপ্রথা আরও ব্যাপক ছিল। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক আদেশ জারি করিয়া সতীদাহ প্রথাকে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হইবার পর ভারতের কোন স্থানেই বিক্ষোভ দেখা দেয় নাই। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এক নিষ্ঠুর প্রথার সপক্ষে কোন জনসমর্থন ছিল না। সতীদাহ ব্যতীত আরও দুইটি কুপ্রথা আইন দ্বারা বন্ধ করা হয়। খন্দ জাতির মধ্যে নরবলি দিবার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। তাহাদের বিশ্বাস ছিল নর-শোণিতে ধরিত্রীমাতাকে তৃপ্ত করিতে পারিলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে এই নৃশংস প্রথা তুলিয়া দেওয়া হয়। রাজপুত, জাঠ ও মেওয়াট জাতিদের মধ্যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে উহাকে হত্যা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহাদের কন্যার বিবাহ ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল, অর্থাভাবে মানমর্যাদা-সম্পন্ন পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারা যাইত না, আবার উহা করিতে না পারিলে সামাজিক মর্যাদাহানি ঘটিত। সেই কারণে কন্যা সন্তান জন্মাইলে তাহাকে হত্যা করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। এই প্রথার পিছনে ধর্মীয় ভিত্তি ছিল না বলিয়া ইহা দূর করিবার জন্য জনমত গঠনের প্রয়োজন হইয়াছিল। কেবল আইন করিয়া ইহা বন্ধ করা যায় নাই।

সতীদাহ প্রথা-বিরোধী আন্দোলন ও তাহার ফলাফল

অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথার অবসান

ইতিমধ্যে সতীদাহ প্রথা রহিত হইবার ফলে বিধবা বিবাহ ও নারীমুক্তি আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে। কলিকাতার তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি বিধবা বিবাহ প্রশ্নটি সম্বন্ধে আলোচনা অবতারণা করে। বোম্বাই শহরেও এই একই সময়ে নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে বোম্বাই সরকার এ সম্বন্ধে

হিন্দু বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন

হিন্দু পণ্ডিত ও সরকারী কর্মচারীদের মতামত জানিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় বিধবা বিবাহ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি, ধর্মসভা ও তত্ত্ববোধিনী সভার নিকট বিধবা বিবাহের জন্য মতামত চাওয়া হয়। তত্ত্ববোধিনী সভা ছিল দল, মত ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল সংস্কারকামী বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মিলনক্ষেত্রে। সমাজ সংস্কার ও নারীমুক্তি আন্দোলনে এই সভার অপরিসীম অবদান ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময় বিধবা বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ইহা প্রমাণ করিয়া একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ব্রাহ্মগণ এবং নব্যবঙ্গীয়রা তাঁহাকে সমর্থন জানাইলেন। অপরদিকে হিন্দুধর্মসভার মুখপাত্ররা ইহার তীব্র বিরোধিতা করিলেন। বিদ্যাসাগর বুঝিতে পারিলেন সরকারী সাহায্য ছাড়া বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে না, কারণ জনমতকে শক্তিশালী করিবার জন্য আইনের প্রয়োজন আছে। অবশেষে তাঁহার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং এ বিষয়ে একটি আইনও বিধিবদ্ধ হইল। ইহার ফলে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে যে সামাজিক শাসন ছিল তাহা দূরীভূত হয়।

বিদ্যাসাগরের অবদান

কোম্পানীর যুগে দাসপ্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা দাসদের উপর অত্যাচার চালাইত। শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহার প্রতিবাদ করেন এবং সংবাদপত্রে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ হইতে থাকে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এক আইন দ্বারা দাসপ্রথা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

দাস প্রথান অবদান

বাংলায় নূতন চিন্তাধারার বিকাশ। পাশ্চাত্ত্য জগতের শিক্ষা-দীক্ষা এদেশের মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে। তাহারা নিজেদের সংস্কৃতি, ধর্ম, শিক্ষা সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। এইভাবে শিক্ষিত ভারতীয়দের চিন্তাজগতে এক বিরাট আলোড়ন দেখা দেয়।

রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম ভারতীয়দের নূতন চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করেন। জাতীয় জীবনের বহু ক্ষেত্রে—শিক্ষায়, সমাজে, ধর্মে, রাজনীতিতে, সাহিত্যে—তিনি স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে অন্ধবিশ্বাস ও গোড়ামির বদলে যুক্তিনিষ্ঠ মন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। শিক্ষিত বাঙালি যাহাতে বেদ ও উপনিষদের ধর্ম বুঝিতে পারে সেজন্য তিনি বাংলা ভাষায় ঐগুলির অনুবাদ প্রকাশ করেন। নিজে প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইয়াও পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন।

রামমোহন রায়ের অবদান

রামমোহন রায়কে প্রথম আধুনিক ভারতীয় বলা হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'ভারত পথিক' আখ্যা দিয়াছেন। রামমোহন যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন বাঙলা তথা ভারতের সমাজজীবন ছিল অতীব বেদনাদায়ক। জীবনের গতি ছিল নিশ্চল, পঙ্গু,

স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা সকলেই ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন, স্ত্রীজাতির অবস্থা ছিল অতিশয় শোচনীয়। সমাজের দেহ ছিল জাতিভেদ ও কৌলিন্য প্রথায় আচ্ছন্ন। আর ধর্মাচরণ ছিল অন্তঃসারহীন বাহ্যিক আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। সমাজদেহের এই সকল আবর্জনা দূর করিয়া রামমোহন সুস্থ প্রগতিশীল সমাজ গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, উদার মানবিকতা, সূক্ষ্ম বিচারবোধ এবং সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই তাঁহাকে ভারতের প্রথম 'আধুনিক মানব' (modern man) বলা হয়। পরবর্তী কালের ভারতের মনীষিগণ তাঁহার পদচিহ্নই অনুসরণ করিয়াছিলেন। রামমোহনের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রয়াস ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করে। তাঁহার আদর্শকে ভিত্তি করিয়া সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল।

আধুনিক ভারতের স্রষ্টা



রামমোহন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সব মনীষী চিন্তা ও কর্মের দ্বারা বাঙালী তথা ভারতীয়দের মনে নবজাগরণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৮-১৮৩১ খ্রীঃ) অন্যতম। ডিরোজিও হিন্দু কলেজের কেবলমাত্র একজন প্রতিভাবান অধ্যাপকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন উদীয়মান বাঙলার এক উদ্দীপ্ত অগ্নিশিখা। তাঁহার প্রভাব ছাত্রদের মনে এক নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তিনি তাঁহার ছাত্রদের সামাজিক, নৈতিক এবং ধর্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনায় স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিতে উৎসাহ দিতেন। তাঁহাদের মন হইতে কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি যাহাতে দূর হয় তাহার জন্য তিনি নিরলস চেষ্টা করেন। ইহার ফলে তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠ মনোভাব গড়িয়া ওঠে। তাঁহার প্রিয় ছাত্রেরা 'ইয়ং বেঙ্গল' (Young Bengal) বা 'নব্যবঙ্গ' নামে পরিচিত হয়।

ডিরোজিও-এর প্রভাব



ডিরোজিও

ইয়ং বেঙ্গল নানাভাবে স্বদেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হয়। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকরূপে পরবর্তী জীবনে খ্যাতিলাভ করেন।

ডিরোজিও-র ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রমেগোপাল ঘোষ ও রাধানাথ শিকদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা পরবর্তীকালে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মসমাজ ও ইহার কার্যাবলী। ধর্মীয় ক্ষেত্রে রামমোহন যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাই পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় এক দেশব্যাপী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে প্রকৃত ধর্মীয় সমাজে পরিণত করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ইহাকে একটি নূতন ধর্মে রূপান্তরিত করেন। তিনি তাঁহার নূতন ধর্মের নাম দিলেন 'ব্রাহ্মধর্ম'। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা। ইহার পূর্বে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন। এই সভার প্রধান কাজ ছিল তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করা এবং প্রাচীন উপনিষদের শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট হওয়া।

দেবেন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টধর্মের প্রসার ও প্রচার রোধ করা। খ্রীস্টান পাদ্রীগণ যখন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিতে থাকে ব্রাহ্মধর্মই তাহার সঠিক জবাব প্রচার ও লিখনের মাধ্যমে দিয়াছিল। তাহা ছাড়া হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইহার ফলে পাদ্রীদের স্কুলে হিন্দু ছাত্রদের পড়িবার চাহিদা কিছুটা কমিয়া যায়। তরুণ কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ফলে এই ধর্ম আন্দোলনে নূতন প্রাণসঞ্চার হয় এবং ব্রাহ্মধর্ম ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইতে থাকে।

ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের অবদান কম নয়। ব্রাহ্মসমাজ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সমাজ-সংস্কার প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। পর্দাপ্রথার বিলুপ্তি, বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধকরণ, বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ এবং নারীশিক্ষার প্রচলন প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ব্রাহ্ম আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের মাধ্যমে খ্রীস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার রোধ করা। এইভাবে ব্রাহ্মসমাজ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়।

ব্রাহ্মসমাজের অবদান

আধুনিক ভারতের অন্যতম স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। তিনি অধ্যক্ষ থাকাকালীন সংস্কৃত কলেজে সকল শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রদের পড়িবার অধিকার দেন। পাঠক্রম রচনায় তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দেন। বাঙলার মাধ্যমে সংস্কৃত শিখিবার সহজ পদ্ধতি তিনিই বাহির করেন এবং ইহার জন্য বাঙলা ভাষায় 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষা আবশ্যিক করেন, কারণ তিনি মনে করিতেন যে ভারতকে গঠন করিতে হইলে ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জনশিক্ষার প্রসারের জন্য বাঙলা ভাষার উন্নতি ও ব্যাপ্তির যে প্রয়োজন তাহা তিনি উপলব্ধি করেন। ইহার জন্য বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, কথামালা, চরিতাবলী প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিয়া তিনি বাঙলা শিক্ষার পথ সুগম করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর নারীমুক্তি আন্দোলন ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনকে জীবনের শ্রেষ্ঠতম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচেষ্টা কেবলমাত্র বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বহুবিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও জনমত গঠন করেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও তাঁহার বিশেষ অবদান ছিল। তিনি নারীশিক্ষা বিস্তারেও ব্রতী হন। তাঁহার উৎসাহে ও উদ্যমে বাঙলার কয়েকটি জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং এজন্য নিজে প্রভূত অর্থব্যয় করেন। তিনি নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হইয়াছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের আইন সচিব বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় তিনি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ইহাই পরবর্তী কালে বেথুন স্কুল ও কলেজরূপে খ্যাতিলাভ করে। বিদ্যাসাগর কেবলমাত্র সামাজিক অবিচার হইতে নারীদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন নাই, শিক্ষা দীক্ষায় তাহাদের পূর্ণ মানুষ তৈয়ারির জন্য সংগ্রামে ব্রতী হইয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে তাঁহার দান অবিস্মরণীয়।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার

প্রার্থনা সমাজ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বাংলাদেশের নাম পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমাজের সভ্যগণ কিন্তু হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া যান নাই। তাঁহারা তুকারাম, নামদেব, রামদাস প্রভৃতি মারাঠা ধর্মগুরুদের প্রচারিত আদর্শেই বেশী আস্থাবান ছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মাধব গোবিন্দ রানাডে ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণপুরুষ। তাঁহার নেতৃত্বে প্রার্থনা সমাজের সভ্যগণ

সমাজ সংস্কারের দিকে অধিক নজর দেন। তাঁহারা জাতিভেদ মানিতেন না। অসবর্ণের মধ্যে বিবাহ এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহে উৎসাহ দিতেন। সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত ডেকান এডুকেশন সোসাইটি প্র্যর্থনা সমাজের! চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।



মহাদেব গোবিন্দ রানাডে

মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংস্থা

ইহা ছাড়া মহারোষ্ট্র ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন শিক্ষিত যুবক **Students' Literary and Scientific Society** নামে একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার সমিতি স্থাপন করেন। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'জ্ঞানপ্রকাশমণ্ডলী। জনসাধারণকে সামাজিক সমস্যা ও যুক্তিবাদী চিন্তাধারা সম্বন্ধে অবহিত করাই ছিল এই সমিতির লক্ষ্য। নারী শিক্ষা প্রসারের জন্যও এই সমিতির সচেষ্ট হইয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিল।

বিভিন্ন মুনীষীদের অবদান

মহারাষ্ট্রে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কয়েকজন মনীষীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা হইলেন কৃষ্ণদাস গোবিন্দদাস ফুলে, গোপালহরি দেশমুখ, কৃষ্ণদাস মুলজী এবং দাদাভাই নৌরজী। ফুলে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হরিজনদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষাকে আবশ্যিক করার দাবী জানান। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভাডদাজা ও শঙ্কর শেঠ এ ব্যাপারে তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। ফুলে মহারাষ্ট্রে বিধবাদের বিবাহ ব্যাপারে আন্দোলন করেন।

গোপালহরি দেশমুখ ছিলেন মহারাষ্ট্রের নবজাগরণের ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ। তিনি প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কালজয়ী অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁহাকে 'লোকহিতবাদী' পদবীতে ভূষিত করিয়াছিলেন। দাদাভাই নৌরজী কেবলমাত্র দেশবরেণ্য নেতাই ছিলেন না, তিনি সমাজ সংস্করক, শিক্ষাবিদ্ ও অর্থনীতিবিদ্ ছিলেন। তিনি পারসী ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং এই ধর্মে যে সব কুসংস্কার ছিল সেগুলি দূর করার চেষ্টা করেন। কৃষ্ণদান মূলজীও একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি বিধবা বিবাহকে সমাজসম্মত করিবার জন্য 'সত্যপ্রকাশ' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশ করিতে থাকেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে পরমহংসমণ্ডলী নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দেলন শুরু করে।

নবম অধ্যায় | ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : কৃষক শ্রেণীর অসন্তোষ ও অভ্যুত্থান

ভারতে ব্রিটিশ শাসন খুব সহজে স্থাপিত হয় নাই। পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইবার পরও সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ইংরেজদের প্রায় একশত বৎসর সময় লাগিয়াছিল। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের (১৮৪৯ খ্রীঃ) অবসানে ইংরেজরা ভারতে সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজরা এক-একটি রাজ্য দখল করিয়া সেখানে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। কিন্তু তাহাদের এই প্রভুত্ব স্থানীয় অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় মানিয়া লয় নাই। তাহারা ইংরেজদের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য বিভিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যায়।

দেশীয় নৃপতিদের রাজ্যচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ইংরেজরা ধীরে ধীরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিতে শুরু করে। ইহার ফলে ইংরেজ শাসন আরম্ভ হইবার প্রথমদিক হইতে দেশের নানা অংশে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব দেখা দেয়। ইহা ছাড়া ইংরেজ শাসন ভারতের অর্থনীতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে। ইংরেজরা তাহাদের স্বার্থটাই বড় করিয়া দেখিল। তাহারা শাসনের মাধ্যমে ভারতকে পরিপূর্ণভাবে শোষণ করিতে শুরু করে। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার-উৎপীড়নের ফলে বাংলা ও গুজরাটের বস্ত্রশিল্পীরা এক শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া পৌঁছায়। গ্রামীণ শিল্পের অবনতির ফলে জনসাধরণ অত্যধিক পরিমাণ কৃষিনির্ভর হইয়া ওঠে। ইহার ফলে দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে জমিদারের হাতে জমির মালিকানা চলিয়া যায়। এই ব্যবস্থায় কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ায় কৃষকদের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পায়।

ইংরেদের অর্থনৈতিক শোষণ

পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় একশত বৎসর জনসাধারণ ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় নাই মনে করিলে ভুল হইবে। রাজরাজড়াদের বিরোধিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকশ্রেণী বারংবার ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। রংপুর, বিষ্ণুপুর, তিনভেলি, বেরেলী, আলীগড়, খান্দেশ, উড়িষ্যা, হরিয়ানা, বুন্দেলখণ্ড ও আসামে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সকল বিদ্রোহ পরবর্তী মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। ইহা ছাড়া হিন্দু সন্ন্যাসিগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর বাঙলায় বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ জনসাধারণের মনে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই বিদ্রোহকে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' বলা হয়।

জনসাধারণের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়া

ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভিক যুগে মুসলমানগণই আর্থিক দিক হইতে হিন্দুদের অপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়াই

ইংরেজরা ভারতে আধিপত্য স্থাপন করে। অর্থাৎ মুসলমানদের রাজত্বের বদলে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হয়। ইংরেজ রাজত্ব শুরু হইবার ফলে বহু মুসলমানের জীবিকার পথ বন্ধ হইয়া যায়। বিচারকার্যে তাহাদের যে প্রাধান্য ছিল তাহা লোপ পায়। ফারসী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি প্রবর্তনে স্বভাবতই তাহারা ক্ষুব্ধ হয়। বিচারব্যবস্থায় তাহারা যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিত তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। তাহাদের নিকট হইতে বহু জমি কাড়িয়া লওয়া হয়। তাহা ছাড়া ইংরেজদের আধিপত্য সর্বদাই তাহাদের মুসলমান আধিপত্যের কথা স্মরণ করিয়া দিত। এসব কারণে মুসলমানরা প্রথমদিকে ইংরেজ শাসনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ না করায় হিন্দুদের অপেক্ষা পিছাইয়া পড়ে। তাহারা বাংলা তথা ভারতের নবঅভ্যুদয়ের শরিক হয় নাই।

মুসলমান সম্প্রদায়ের হীন অবস্থা

ওয়াহাবী আন্দোলন। ইংরেজ-প্রবর্তিত নূতন ব্যবস্থার প্রতি চোখ বন্ধ রাখিয়া শিক্ষিত মুসলমানগণ নিজেদের পুরোপুরি শরিয়ত বা ইসলামী ধর্মশাস্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হইতে সচেষ্ট হয়। কারণ মধ্যযুগেই হিন্দুদের অনেক সামাজিক প্রথা মুসলমান সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। সাধারণ মুসলমানগণ তাহাদের পূর্বতন সংস্কার মানিয়া চলিত। এগুলি কিন্তু ইসলাম-ধর্মশাস্ত্র বিরোধী ছিল। স্বভাবতই সাধারণ মুসলমানদের এই ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ মৌলবী ও মৌলনাদের ভাল লাগে নাই। এই সময় আরব দেশে কয়েকজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। যাঁহারা ধর্ম-সংস্কার দ্বারা মুসলমানদের পূর্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবদুল ওয়াহাব নামক এক ধর্মপ্রাণ আরববাসী যে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু করেন তাহাকে ওয়াহাবী আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনের দ্বারা ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা চলিয়াছিল।

ধর্মের দ্বারা পরিচালিত হইবার ব্যবস্থা

আবদুল ওয়াহাব-এর মতবাদের মূল তত্ত্ব হইল (ক) ইসলামকে কোরানের যথাযথ নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শিয়া, সুন্নী কেহই শরিয়ত-মানা মুসলমান নন। (খ) মৃতের দরগা মানা বন্ধ করিতে হইবে, সেখানে ধূপদীপ দেওয়া শাস্ত্রবিরোধী কাজ। (গ) ধূমপান, অলঙ্কার পরা এবং রেশমী কাপড় পরিধান করা ইসলাম-বিরোধী কাজ। মহম্মদ ওয়াহাব একহাতে তরবারি অন্য হাতে তাঁহার মতবাদের খসড়া লইয়া সদলে মধ্য আরবের কয়েকটি অঞ্চল দখল করেন এবং সেই সময় তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার অনুচরেরা মক্কাও সাময়িকভাবে দখল করে কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে সেখান হইতে তাহারা বিতাড়িত হইয়া পারস্য উপসাগরে দস্যুতা বৃত্তি গ্রহণ করে।

ওহায়াবী ধর্মমত

ভারতবর্ষে ওয়াহাবী ধর্মমত প্রচার করেন রায়বেরিলীর সৈয়দ আহম্মদ। তিনি ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ ভারতে এই মতবাদের প্রসার ঘটান। ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলন ধর্মীয় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিলেও ইহা মূলতঃ ইংরেজ, হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। বাংলাদেশে কৃষকগণও ইহাতে যোগ দিয়াছিল। ওয়াহাবী আন্দোলন প্রথমে ইংরেজ

ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলন

শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। ইংরেজদের বিতাড়িত করিয়া ভারতে মুসলমান রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওয়াহাবিগণ হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে অত্যাচার শুরু করে। সৈয়দ আহম্মদ শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন এবং কিছুদিনের জন্য পেশোয়ারও দখল করিতে সমর্থ হন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি যুদ্ধে নিহত হন।

বাংলাদেশে ওয়াহাবী নেতা ছিলেস তিতু মিঞা বা তিতুমীর। তাঁহার বাড়ি ছিল গোবরডাঙ্গার নিকট। তিনি মক্কায় গিয়া সৈয়দ আহম্মদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাংলায় ফিরিয়া তিতুমীর ওয়াহাবী ধর্মমত যেমন প্রচার করিতে থাকেন, তেমনি জমিদারদের অত্যাচার হইতে কৃষকগণ ও তাঁতিদের বাঁচাইবায় জন্য এক শক্তিশালী সংগঠন গড়িয়া তোলেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত নারিকেল-বেড়িয়াতে তিনি একটি বাঁশের কেল্লা তৈয়ারী করিয়া তাঁহার অনুচরদের লইয়া জমিদার কৃষ্ণ রায়ের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। ঐ অঞ্চলের সমস্ত মুসলমানদের তাঁহার আন্দোলনে যোগদান করিতে নির্দেশ দেন এবং যাহারা যোগদানে অনিচ্ছুক হইয়াছিল তাহাদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন। এই সময় তিনি ঘোষণা করেন যে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হইয়াছে এবং মুসলমান রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তিতুমীরের কার্যকলাপ



তিতুমীর

প্রথমদিকে তিতুমীরের অনুচরবৃন্দ বিশেষ বাধা পায় নাই। ফলে ২৪ পরগণা ও ফরিদপুর অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার একদল সৈন্য পাঠায়। বাঁশের কেল্লার সম্মুখে তিতুমীর তাঁহার অনুচরদের লইয়া বীর-বিক্রমে লড়াই করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তিতুমীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলন স্তিমিত হইয়া পড়ে। তিতুমীর-পরিচালিত ওয়াহাবী আন্দোলন কিছুটা গণভিত্তিক হইতে পারিয়াছিল। জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার সময় তাহারা হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ মানিত না বলিয়া হান্টার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ওয়াহাবী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এখানে নেতা ছিলেন এনায়েত আলী। সিট্রানা নামক স্থানে তিনি একটি শক্ত ঘাঁটি গড়িয়া তোলেন। ইংরেজরা এই ঘাঁটি দখল করিবার জন্য বারবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছিল। অবশেষে সিডনি কটন ৫ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া সিট্রানা অক্রেমণ করিয়া অধিকার করেন। কিন্তু ইহাতে কিছু ফল হয় নাই। ওয়াহাবীগণ ইংরেজ

ওয়াহাবী আন্দোলনের অবসান

সৈন্যের আক্রমণের সংবাদ পাইবার পূর্বেই অন্যত্র চলিয়া যায়। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল গরভোক পশ্চিমাঞ্চলের ওয়াহাবীদের পরাজিত করেন। পাটনা অঞ্চলের ওয়াহাবীরা ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

ফরাজী আন্দোলন। ওয়াহাবী আন্দোলনের ন্যায় ফরাসী আন্দোলনও কিছুটা ধর্ম-ভিত্তিক ছিল। 'ফরাজী' কথাটির অর্থ হইল 'ইসলামের পবিত্র আদর্শে বিশ্বাস'। তবে ফরাজী আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক। এই আন্দোলনে ভূমি-সংক্রান্ত সমস্যাগুলি বেশি প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দ হইতেই বাংলায় ফরাজী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের জনক হইলেন শরিয়তুল্লা। তিনি তাঁহার অনুগামীদের লইয়া যে সম্প্রদায় গড়িয়া তোলেন তাহার নাম দেন ফরাজী। জমিদার কর্তৃক উৎখাত প্রজা এবং বেকার কারিগরগণ তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিল। জমিদারদের বিরুদ্ধে ফরাজীরা তাঁহার নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মহম্মদ মুমিন (দুধু মিঞা) এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলেন। তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি পূর্ববঙ্গের প্রকৃত শাসক বা খলিফা। বাহাদুরপুর ছিল তাঁহার কেন্দ্রীয় কার্যালয়। তিনি পূর্ববঙ্গকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া প্রতি বিভাগে একজন করিয়া সহকারী খলিফা নিযুক্ত করেন। তিনি উৎপীড়িত কৃষকদের সংঘবদ্ধ করিয়া জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কৃষকদের মধ্যে কলহ-বিবাদ তিনি ও তাঁহার নিযুক্ত ব্যক্তিরাই মিটাইয়া দিতেন। কোন কৃষক যদি ইংরেজদের আদালতের শরণাপন্ন হইত তাহা হইলে সেই কৃষকের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইত না। জমিদারকে খাজনা দেওয়া কৃষকদের পক্ষে অপরাধ বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন। ফলে কৃষকরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে জমিদার শ্রেণী শঙ্কিত হইয়া ইংরেজ সরকারের সাহায্য চায়। ইংরেজ সরকার ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। তিন বৎসর বন্দীজীবন যাপনের পর তাঁহার দেহান্তর ঘটে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ফরাজী আন্দোলন প্রশমিত হয়।

আন্দোলনের সূচনা ও বিস্তার

ফরাজী আন্দোলন ছিল মুখ্যত স্থানীয় অভ্যুত্থান। ইহা গতানুগতিক প্রাচীন ইসলামী ভাবধারার পরিবর্তে নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইলেও এই আন্দোলন গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ছিল না। আবার ইহা অনস্বীকার্য যে, ফরাজীরা কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সুদীর্ঘ সংগ্রাম করে। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ সরকার পরবর্তীকালে কৃষক ও প্রজাদের স্বার্থরক্ষামূলক আইন প্রণয়ন করিতে অগ্রসর হয়। ফরাজী আন্দোলনের গুরুত্ব এই কারণেই সমধিক।

ফরাজী আন্দোলনের গুরুত্ব

ওয়াহাবী ও ফরাজী আন্দোলন হইতে তখনকার মানুষের ইংরাজ-বিরোধী মনোভাবের গভীরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে ইহা সত্য যে এইসব আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল মধ্যযুগীয় অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়া। তাঁহারা চাহিয়াছিল সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষ। তাঁহারা ভারতবর্ষকে অনগ্রসর দেশ হিসাবে মনে করিতেন না। সাধারণ হিন্দুগণ যাহারা প্রচলিত ঐতিহ্য ও রীতিনীতির বিরোধী ছিল না তাঁহারা ওয়াহাবী সমর্থক ছিলেন।

উপজাতি আন্দোলন

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়িয়া ভারতের নানা স্থানে কৃষক উপজাতি ও আদিবাসীদের কার্যকলাপের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপজাতি বিদ্রোহ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলার কৃষিব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী জনগণের নিত্যসহচর হিসাবে দেখা দিয়াছিল। ভারতীয় উপজাতিদের প্রতি কোম্পানীর শাসননীতি অসন্তোষের ইন্ধন যোগায়। ইহাদের অধিকাংশই পূর্বে সামরিক দায়িত্ব বা পথে পাহারা দিবার শর্তে নিষ্কর জমি ভোগ করিত উপজাতিদের এইসব দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। ইংরেজ সরকার তাহাদের জায়গা-জমির উপর খাজনা বসায়। ফলে সমগ্র ভারতে উপজাতি বিদ্রোহ দেখা দেয়।



বিদ্রোহী সাঁওতাল নেতা সিধু

চুয়াড় বিদ্রোহ

বিহারের অন্তর্গত ঘাটশিলা ও বীরভূম মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী চুয়াড় নামে এক উপজাতি বিদ্রোহ করে। ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ধল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে এই বিদ্রোহে চুয়াড়রা যোগ দেয়। তাহারা স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে একজোট হইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে। তাহাদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মর্গ্যান এক সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হন কিন্তু পরাজিত হন। ইহার পর অবশ্য ইংরেজরা এই বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন করেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে চুয়াড়গণ পুনরায় বিদ্রোহ করে। মেদিনীপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিদ্রোহীদের কার্যকলাপ চরম আকার ধারণ করে। তাহারা বহু অঞ্চলে সরকারী সম্পত্তি নষ্ট করিতে থাকে। লর্ড ওয়েলেসলি বহু চেষ্টা করিয়া ইহা দমন করেন।

কোল বিদ্রোহ

১৮৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দে ছোটনাগপুরে কোল উপজাতি বিদ্রোহ করে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও বহু বিদ্রোহ ঘটে। এইগুলি হইল ভিল বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ (১৮২৪ খ্রীঃ)। কোল বিদ্রোহের

পুনরাবৃত্তি হয় দেশের বিভিন্ন স্থানে। ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দেই বিহারের রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ, পালামৌ এবং মানভূমের পশ্চিম অঞ্চলে কোলগণ বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ এমনই আকার ধারণ করে যে শেষ পর্যন্ত এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তাহা দমন করিতে হয়।

খন্দদের বিদ্রোহ

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার খন্দ নামক আদিবাসীগণ বিদ্রোহ করে। তিন বৎসর এই বিদ্রোহ চলিয়াছিল। খন্দদের বাড়িঘর পোড়াইয়া দেওয়া হয়। খন্দগণ জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া আন্দোলন চালাইতে থাকে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ কঠোরহস্তে দমন করা হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

আদিবাসীদের বিদ্রোহের মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। জাতি হিসাবে সাঁওতালরা খুবই কষ্টসহিষ্ণু ও কর্মঠ। বাংলা, বিহার ও উড়িষায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তনের পর ইহাদের উপর জমিদারদের অত্যাচার শুরু হয়। তাহাদের অত্যাচারের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল মহাজনদের চড়া সুদের ঋণের চাপ। এই ঋণের চাপেও তাহাদের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে। ইংরেজ সরকার জমিদার ও মহাজনদের পক্ষে সমর্থন করিলে সাঁওতালগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিধু ও কানুহু নামে দুই নেতার নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল মিলিত হয় এবং রাজমহল অঞ্চল দখল করিয়া লয় এবং নিজেদের সরকার স্থাপন করে। ইহার পর তাহারা বিভিন্ন স্থানে লুঠতরাজ এবং আক্রমণ করিতে থাকে। তাহারা রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় এবং ডাক ব্যবস্থাও বিধ্বস্ত করে। বীরভূমের কিছু অংশ তাহারা দখল করিয়া লয়। মেজর বুরাক নামে জনৈক ইংরাজ সেনাপতি বিদ্রোহী সাঁওতালদের হাতে পরাজিত হন। অবস্থার অবনতি ঘটিলে এবং এই বিরাট অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা ভাঙিয়া পড়িলে ইংরেজ সরকার সামরিক বাহিনীকে বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। শেষ পর্যন্ত সাঁওতালদের পরাজয় ঘটে এবং তাহদের নির্মমভাবে দমন করা হয়।

দশম অধ্যায়

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের বহুবিধ কারণ ছিল—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক। এই বিদ্রোহ অবশ্য হঠাৎ ঘটে নাই। ইহার পিছনে ছিল বহু ঘটনা এবং এইগুলির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

রাজনৈতিক কারণ। প্রথম হইতেই ইংরেজ শক্তি ছলে-বলে-কৌশলে ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলি গ্রাস করিতে থাকে। তথাপি ইংজেরা যতদিন সমস্ত রাজ্যগুলির স্বার্থে ও স্থায়িত্বে কোনরূপ আঘাত হানে নাই, ততদিন পর্যন্ত প্রকাশ্য বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে ঘটে নাই। ডালহৌসীর রাজ্যবিস্তার নীতি দেশীয় রাজ্যের রাজাদের মনে আতঙ্কের

সৃষ্টি করে। তাঁহাদের ধারণা জন্মে যে, ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত এই দেশে দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব রাখিবে না। অযোধ্যা গ্রাস করিবার ফলে অযোধ্যা রাজ্যের সকল শ্রেণীর জমিদার, মুসলমান অভিজাত, সামরিক ব্যবসায়ী ও কৃষকগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিক্রিয়া ভারতের সকল দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে তীব্রভাবে দেখা দেয়। ইহা ছাড়া পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র **নানাসাহেবকে** বৃত্তিদান বন্ধ করিয়া দেওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। কুশাসনের অভিযোগে যখন ডালহৌসী অযোধ্যা গ্রাস করিলেন এবং দিল্লীর মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে যখন তাঁহার পূর্বপুরুষদের প্রাসাদ হইতে বিতাডিত করিবার ব্যবস্থা হইল তখন মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। দেশীয় রাজন্যবর্গের ভূমি বাজেয়াপ্ত করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সম্প্রসারণের নীতিও এই বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। গ্রাস করা অঞ্চলগুলির জনসাধারণ বহু কষ্টভোগ করে। ফলে উচ্চ-নীচ, ধনা-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যে এক বিচিত্র শঙ্কা এবং বিদ্বেষভাব দেখা দিয়াছিল।

ডালহৌসীর নীতির প্রতিক্রিয়া



ন্যানাসাহেব

অর্থনৈতি কারণ। রাজনৈতিক বিক্ষোভের সহিত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। মহাবিদ্রোহের পূর্বেই ভারতবর্ষ ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র এবং কাঁচামাল ও খাদ্যশস্যের যোগানদার হিসাবে গণ্য হয়। ফলে এদেশের শিল্পগুলি ক্রমে নষ্ট হইয়া যায় এবং ভারতীয় কারিগর ও মহাজনদের সর্বনাশ হয়। ইংরেজ কোম্পানীর হাতে শাসনভার পড়ায় দেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। কোম্পানীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল এই দেশের অর্থসম্পদ শোষণ করা। তাহারা প্রজাদের উপর জুলুম করিয়া নানা উপায়ে অর্থ আদায় করিত। প্রজাদের প্রতি তাহাদের কোন দরদ ছিল না। কালক্রমে এই দেশের শিল্প ও বাণিজ্য ইংরেজদের হাতে চলিয়া যায়। ফলে এই দেশের বহু লোক বেকার ও দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং কৃষিকার্যই তাহাদের একমাত্র জীবিকা হইয়া দাঁড়ায়। অতি গুরুভার কর আদায়, জবরদস্তি ও নিষ্ঠুর নির্যাতন ভারতীয় চাষীদের সহ্য করিতে হইত। কিন্তু সংগৃহীত করের কোন অংশই কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইত না। ইহা ছাড়া ইংরেজ সরকার-কর্তৃক কতকগুলি দেশীয় রাজ্য অধিকৃত হইলে তাহাদের অনুচর ও আশ্রিতবর্গের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। প্রজাদের ভাগ্য তখন বহু পরিমাণে নির্ভর করিত

ব্রিটিশ সরকারের অর্থ নৈতিক শোষণ

রাজবংশের আর্থিক অবস্থার উপর। বহু উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান অযোধ্যা প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলিতে শাসন ও সৈন্যবিভাগের বড় বড় পদে নিযুক্ত ছিল এবং সাধারণ লোক অনেকেই সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। এই সকল রাজ্যগুলি ইংরেজ কোম্পানী গ্রাস করায় তাহারা বেকার হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া দেশীয় নৃপতিবর্গ বহু লোককেও ভরণ-পোষণ করিতেন, তাঁহাদের অধীনে নানা শ্রেণীর রাজকর্মচারী, সৈন্য-সামন্ত, পাইক-পেয়াদা ছিল। তাঁহারা গুণী ব্যক্তিদের বৃত্তি দান করিয়া সমাদর করিতেন। এই সকল রাজ্য ইংরেজরা গ্রাস করায় তাহারা বেকার ও দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণের সহিত জড়িত ছিল সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ। ব্রিটিশ সরকার রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কারমূলক আইন প্রবর্তন করে। ইহার ফলে প্রাচীনপন্থী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর আশঙ্কা দেখা দেয়। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার ভার ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং মৌলবীদের হাত হইতে ক্রমে পাশ্চাত্ত্য ধারায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের অধিকারে চলিয়া যাইতে থাকে। রক্ষণশীল ব্যক্তিরা প্রচার করিতেছিল যে ইহাতে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ লোপ পাইবে। উচ্চবর্ণের লোকেরা পূর্বে যে সকল সামাজিক সুখ-সুবিধা ও মর্যাদা ভোগ করিতেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা দেয়। সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠানের বিলোপসাধন, ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকার, স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা বহু সিপাহী ও সাধারণ লোকের নিকট ছিল হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের উচ্ছেদসাধন করিয়া ভারতবর্ষকে একটি খ্রীস্টান দেশে পরিণত করার পরোক্ষ প্রচেষ্টা। রেলপথের বিস্তার ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তনও ঐ একই উদ্দেশ্য লইয়া করা হইয়াছে বলিয়া কিছু সংখ্যক ভারতবাসীর মনে হইয়াছিল। এই সময় খ্রীষ্টান পাদ্রীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। কাজেই ধর্মনাশের আশঙ্কা আরও ঘনীভূত হয়।

সরকারী প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সংস্কার

সামরিক কারণ। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজ প্রায় একশত বৎসর কার্যতঃ কোন বিরাট দুর্যোগ ছাড়াই ভারত শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ইংরেজদের প্রভুত্বের পরিস্থিতিতে বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। ততদিনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমগ্র ভারত জয় করিয়া একমাত্র শাসকরূপে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় জনগণকে পদানত করিয়া রাখিবার জন্য দেশীয় সৈন্যবাহিনীর উপরই ইংরেজ সরকার নির্ভর করিত। এই বাহিনীর প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় সামরিক কার্যের বদলে পুলিসী কার্য, অর্থাৎ দেশের জনগণকে দমিত করা। এই সময় ভারতের জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি, আর তাহাদের শাসনে রাখিবার জন্য সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র দুই লক্ষ। এই সৈন্যবাহিনীতে ৪০ হাজার ইংরেজ ফৌজ ছিল, অফিসারেরা সকলেই ছিল ইংরেজ। ইহা ছাড়া ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বহু অভিযোগ বর্তমান ছিল। ক্যানিং-এর সময় General Services Enlistment Act নামে একটি আইন প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং

ইহার দ্বারা সিপাহীদের যে কোন স্থানে যুদ্ধ করিতে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। তাহাদের মধ্যে হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রাকে অশাস্ত্রীয় কাজ বলিয়া মনে করিত। তাহাদের অল্প বেতনও অসন্তোষের অন্যতম কারণ ছিল। সিপাহীদের বেতন বৃদ্ধির দাবি বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। সামরিক বাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতাও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইতেছিল। সর্বশেষে, ইংরেজ সামরিক অফিসারদের ভারতীয় সিপাহীদের প্রতি দুর্ব্যবহার তাদের মনে এক তীব্র ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় একটি বিশেষ গুজব দেশের সর্বত্রই বিস্তৃত হইল যে, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের একশত বৎসর পরে ভারতের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিবে। এই বিশ্বাস সিপাহীদের মধ্যে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের বিভিন্ন কারণ

যখন সকল দিক্‌ দিয়াই বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত, তখন এক বিশেষ ধরনের বন্দুক ও কার্তুজের প্রবর্তনে বিস্ফোরণ ঘটিল। এনফিল্ড বন্দুকের কার্তুজে এক ধরনের চর্বি মাখানো কাগজের আবরণ থাকিত। ব্যবহারের পূর্বে আবরণের প্রান্তটি দাঁত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্তুজের আবরণে গরু কিংবা শূকরের চর্বি ব্যবহার করা হইত। এই ধরনের কার্তুজ প্রচলন করিবার ফলে হিন্দু অথবা মুসলমান সিপাহীদের ধর্মীয় সংস্কারে তীব্র আঘাত লাগিল। ইংরেজ সরকার ইহা দূর করিরার চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মহাবিদ্রোহের ক্ষেত্র পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। চর্বির ব্যাপার ইহাতে ইন্ধন যোগাইল। সমগ্র দেশে ঝটিকা গতিতে বিদ্রোহ বিস্তৃত হইল।

প্রত্যক্ষ কারণ কার্তুজ সংক্রান্ত ঘটনা

বিদ্রোহের সূচনা ও প্রসার। এই বিদ্রোহের সূচনা হয় ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি এই তারিখে কলিকাতার সন্নিকটে দমদমের সামরিক ছাউনিতে সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। ইহার একমাস পরে বহরমপুরে অবস্থিত দেশীয় রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করে, কার্তুজ লইতে সৈন্যরা আপত্তি জানায়। ফলে এই রেজিমেণ্ট ভাঙিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ২৯শে মার্চ কলিকাতার নিকট ব্যারাকপুরে ৩৪ নং সিপাহী দলের ১৪৪১ নং তরুণ সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহী হন। পরে বিচারে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ফাঁসিকাঠে জীবন দেন (৮ই এপ্রিল, ১৮৫৭ খ্রীঃ)। তাঁহার ফাঁসির পর বিদ্রোহের আগুন উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।



মঙ্গল পাণ্ডে

১লা মে লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহের শিখা দেখা দিল। তাহার পর মীরাটে ও আম্বালায় বিদ্রোহ প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে (৫ই মে ১৮৫৭ খ্রীঃ)। মীরাটে বহু ইংরেজকে হত্যা করিয়া সিপাহীরা দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে (১১ই মে, ১৮৫৭ খ্রীঃ) এবং দিল্লী

অধিকরে করিয়া তাহারা বৃদ্ধ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে ভারত সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে। দিল্লী বিদ্রোহীদের প্রধান কেন্দ্র হয়। ক্রমশঃ বিদ্রোহের আগুন কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসি, মোরাদাবাদ, এলাহাবাদ, ফতেপুর, ফৈজাবাদ প্রভৃতি বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। পশ্চিম বিহার হইতে পাঞ্জাবের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত বিদ্রোহের বহ্নি বিস্তৃত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে বিদ্রোহের চরম সময়ে বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে এক লক্ষ্য বর্গমাইল এলাকা ছিল, এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার কোটি। উত্তর প্রদেশ ও বিহারের কিছু অংশে বিদ্রোহ প্রকৃত জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই দুই অঞ্চলে কৃষক ও পূর্বতন জমিদারেরা সংঘবদ্ধভাবে সরকারী আদালত, থানা ও রাজস্ব সংক্রান্ত দলিল-পত্র নির্বিচারে আক্রমণ করিয়া সেগুলি ধ্বংস করিয়া দেয়। মহাবিদ্রোহে ইহা যেভাবে দমন করা হইয়াছিল তাহা হইতে জনসাধারণের বিদ্রোহে অংশগ্রহণের মাত্রা সম্বন্ধে জানা যায়। যদি ইহা কেবলমাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহই হইত তাহা হইলে ইংরেজরা বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। দিল্লী, অযোধ্যা, আগ্রা, পশ্চিম বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর জ্বালাইয়া, পোড়াইয়া ছারখার করিয়াছিল এবং এই সব অঞ্চলের অধিবাসীদের নির্মমভাবে হত্যা করিয়াছিল। বাংলা, দক্ষিণ ভারত, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে কিন্তু এরূপ করা হয় নাই। বাংলায় সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ প্রথমে দেখা দিয়াছিল সত্য কিন্তু এই বিদ্রোহ জনসমর্থন পায় নাই। কয়েকজন সিপাহীকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া ইংরেজ সরকার আর কোন দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইলে তাহাদের দমন করিবার ব্যবস্থা লওয়া হয়।

বিদ্রোহের ব্যাপকতা: জনসাধারণের যোগদান



দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

বিদ্রোহের নেতৃত্ব। বিদ্রোহী সিপাহীরা শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করিয়াছিল। তাঁহাকে এই মহাবিদ্রোহের নায়কও বলা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নামেই নেতা ছিলেন। নেতৃত্ব দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। মহাবিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল। তিনি মনেপ্রাণে বিদ্রোহ চাহেন নাই এবং সাধারণ সিপাহীদের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র দরদ ছিল না। সিপাহীরাও

তাঁহাকে বিশ্বাস করিত না। তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং গোপনে ইংরেজদের খবর পাঠাইতেন। বিদ্রোহের প্রধান নেতার ব্যক্তিত্ব এরূপ দুর্বল হওয়ায় মহাবিদ্রোহ জনসাধারণের মনে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারে নাই।



তাঁতিয়া তোপী

কানপুরে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন শেষ পেশোয়া বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেব। তিনি নিজেকে পেশোয়া হিসাবে ঘোষণা করেন এবং বাহাদুর শাহকে ভারত সম্রাট হিসাবেও গ্রহণ করেন। তিনি অবশ্য বিদ্রোহ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন তাঁতিয়া তোপীর উপর। তাঁতিয়া তোপীর নেতৃত্ব দিবার মত ক্ষমতা ছিল। অযোধ্যার বেগম লক্ষ্ণৌর বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অযোধ্যার জমিদার ও কৃষকদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাইয়াছিলেন।

ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন মধ্যভারতে বিদ্রোহীদের নেত্রী। তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না, সে কারণে স্বত্বাবলোপ নীতি অনুযায়ী লর্ড ডালহৌসী ঝাঁসি অধিকার করেন। স্বভাবতই তিনি ইংরেজদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি প্রথমে অবশ্য বিদ্রোহে যোগ দেন নাই ইংরেজ সরকার তাঁহাকে কিন্তু প্রথম হইতেই সন্দেহ করিতে থাকে এবং তিনি যে বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাহা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হয়। রানী যখন দেখিলেন যে ইংরেজরা তাঁহাকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছে তখনই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।



রানী লক্ষ্মীবাঈ

ইংরেজ বাহিনী হিউরোজের নেতৃত্বে ঝাঁসি পুনর্দখলের জন্য অগ্রসর হইলে রানীর নিকট হইতে প্রচণ্ড বাধা পায়। অবশেষে

ইংরেজ বাহিনী ঝাঁসি দখল করিলে রানী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পিছু হটিয়া ৫০ মাইল দূরে কল্পী দুর্গে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ঐ দুর্গেরও পতন হইল। রানী কালক্ষেপ না করিয়া দুর্গ ছাড়িয়া তাঁহার সৈন্যদের লইয়া চম্বল নদী পার হইয়া সিন্ধিয়ার রাজ্য গোয়ালিয়র দখল করিয়া লন। গোয়ালিয়রের সৈন্যবাহিনী রানীর দিকে যোগ দিল। ইংরেজ বাহিনী গোয়ালিয়র আক্রমণ করিলে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেন। রানীর বিরুদ্ধে প্রেরিত ইংরেজ সেনাপতি রানীর রণচাতুর্য ও সাহসিকতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি রানীকে বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে সর্বোত্তমা ও সর্বাপেক্ষা সাহসিনীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

কুনওয়ার সিং

বিহারের কুনওয়ার সিং-এর বয়স তখন আশী বৎসর, কিন্তু এই বয়সেও তিনি বিদ্রোহ পরিচালনার অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। বিদ্রোহের নায়কদের মধ্যে ইহা ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য। কুশলী সংগঠক হিসাবে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি বিহারে বিদ্রোহ শুরু করিলেও অযোধ্যা ও মধ্য-ভারতেও বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। গৃহাভিমুখে ফিরিবার পথে পাবার নিকট এক যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের পরাজিত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন এবং মারা যান।

আহম্মদুল্লা

ফৈজাবাদের আহম্মদুল্লা ছিলেন বিদ্রোহের আর একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি সংগঠক হিসাবে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান জানান। তাঁহার এই রাজদ্রোহ বন্ধ করিবার জন্য ইংরেজ সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠায়। তিনি কেবলমাত্র ইংরেজ-বিরোধী প্রচারকার্যই চালান নাই, সম্মুখ যুদ্ধেও শত্রুর মোকাবিলা করিয়াছিলেন। লক্ষ্ণৌ ও রোহিলখণ্ডে তিনি বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। এক দেশীয় নরপতি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাঁহাকে হত্যা করে। আহম্মদুল্লার দেশপ্রেম, রণনৈপুণ্য ও শৌর্যের প্রশংসা ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও করিয়াছেন। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসাবে তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাহাদুর খাঁ, মৌলবী লিয়াকত আলী ও পীর আলী যথাক্রমে বেরিলীর, এলাহাবাদের ও পাটনার বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। তাঁহারা যে সব অঞ্চল দখল করিয়াছিলেন সে সব অঞ্চলে জনসাধারণের সমর্থন পাইয়াছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মত

বিদ্রোহের প্রকৃতি। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে নানাভাবে বিচার করা হইয়াছে। সমসাময়িক ইংরেজদের মধ্যেও এই বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। জন লরেন্স ইহাকে দেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, ইহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কার্তুজ সংক্রান্ত বিষয়। অপরদিকে জেমস আউট্রাম ইহাকে একটি সুপরিকল্পিত ইংরেজ-বিরোধী ষড়যন্ত্র বলিয়া মনে করিতেন এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত হইতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো। তাঁহার নিকট ইহা ছিল হিন্দুদের সহযোগিতায় মুসলমানদের ষড়যন্ত্র। অধ্যাপক পার্সিভ্যাল

স্পীয়ার ইহাকে ব্রিটিশ শাসনের নবসৃষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে পুরাতন রক্ষণশীল ভারতের বাধাদানের প্রচেষ্টারূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মতে ইহা সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও আসলে ইহা ভারতের জনসাধারণের প্রথম জাতীয় সংগ্রাম। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে ইহা যদিও প্রথমে সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইয়াছিল কিন্তু সর্বত্র সিপাহীদের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল না। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, এই বিদ্রোহের কোন একটি বিশেষ রূপ ছিল না। কোথাও ইহা কেবলমাত্র সিপাহীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল, আবার কোথাও ইহা জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহীরা প্রথম শুরু করিলেও পরে সাধারণ মানুষ ইহাতে যোগ দিয়াছিল। একটি হিসাব হইতে জানা যায় যে, অযোধ্যায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১,৫০,০০০ লোক প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ১,০০,০০০ জনই বেসামরিক। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর অপরাপর বিদ্রোহগুলির তুলনায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এই বিদ্রোহ অনেক বেশী ব্যাপক ও তীব্র ছিল এবং সেই কারণে ইহাকে মহাবিদ্রোহ বলিয়া চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত। তাহা ছাড়া আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, কারণ ইংরেজ বিতাড়ন সম্পর্কে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোন দ্বিমত ছিল না। ইহার জাতীয় চরিত্রকে এই বলিয়া অস্বীকার করা যাইবে না যে ইহাতে সকল শ্রেণীর ভারতীয় যোগ দেয় নাই। পৃথিবীর কোন স্থানেই কোন বিপ্লবেই সকলেই অংশগ্রহণ করে না। ফরাসী ও রুশ বিপ্লব সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। এই দুইটি বিপ্লব সফল হইয়াছিল আর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়াছিল বলিয়া ইহার দোষত্রুটি বড় করিয়া দেখিয়া ইহার জাতীয় চরিত্রকে অস্বীকার করা উচিত হইবে না। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও ইহার আদর্শ ব্যর্থ হয় নাই। দেশের পরাধীনতার গ্লানি হইতে উদ্ধার করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিতে হইবে—মহাবিদ্রোহ হইতে ভারতবাসী এই শিক্ষাই লাভ করে। পরবর্তীকালে বহু দেশপ্রেমিক এই বিদ্রোহ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে এই মহাবিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে চির-ভাস্বর।

প্রথম জাতীয় সংগ্রাম

বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সাফল্য অপেক্ষা ব্যর্থতা যে অনিবার্য তাহা প্রথম হইতে বোঝা গিয়াছিল। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে, বিদ্রোহের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা করা হয় নাই। বিদ্রোহের শুরু সম্বন্ধে কোন স্থিরতা ছিল না। বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহীদের খবরাখবর আদান-প্রদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না, প্রকৃত সংহতি ছাড়াই কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের এই বিদ্রোহ দেখা দেয়। ফলে একযোগে এবং একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিলে ব্রিটিশ শক্তির যে সমূহ বিপদ ঘটিত তাহা হয় নাই। অভ্যুত্থানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে

বিদ্রোহীদের পরিচালনার অভাব

যোগাযোগের অভাব দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্যকে অনুসরণ করিয়া চলেন। তাহার ফলে পরিকল্পনাহীন বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ বিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, পাটনায় ওয়াহাবীদের যে অভ্যুত্থান আরম্ভ হয় তাহার সহিত গয়া এবং শাহাবাদের কুমার সিংহের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান ঘটে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ইহা সম্ভব হইলে ইংরেজদের পক্ষে কলিকাতা হইতে উত্তর ভারতে সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাঠাইতে অসুবিধা হইত। তাহা ছাড়া বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেবের মধ্যে স্বার্থবিরোধ দেখা দেয়। ফলে যে ধরনের সহযোগিতা সাফল্যকে সুনিশ্চিত করিতে পারিত তাহা সম্ভব হন নাই। বহুধা বিভক্ত বিদ্রোহ কখনো সফল হইতে পারে না। স্বভাবতই ইংরেজদের পক্ষে এই বিদ্রোহ দমন করা সহজ হইয়াছিল।

জনসমর্থন হইতে বঞ্চিত

দ্বিতীয়ত, দেশের সমগ্র জনসাধারণ বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং দেশীয় রাজারা এই বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। বরঞ্চ শিখ, গোর্খা ও রাজপুত এই তিন যোদ্ধা জাতি এবং নিজাম, কাশ্মীরের মহারাজা, সিন্ধিয়া প্রভৃতি বড় বড় দেশীয় রাজা এবং অসংখ্য ছোট বড় জমিদার এই বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার জন্য অবশ্য ব্রিটিশ কূটনীতির গভীর চাতুর্য কিছুটা কাজ করিয়াছিল। যেমন, কয়েক বৎসর পূর্বে ছলে বলে কৌশলে পাঞ্জাব দখল করা সত্ত্বেও ইংরেজরা শিখদের সমর্থন লাভ করে।

ইংরেজদের সামরিক সংগঠনের শ্রেষ্ঠত্ব

তৃতীয়ত, সামরিক শক্তি ও সংগঠনের দিক হইতে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য, অর্থবল, সামরিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা এবং সেনাপতিদের সংহত পরিচালনা এবং রেল ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রচলনের কল্যাণে কোম্পানীর সাফল্য প্রায় সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। অপরদিকে বিদ্রোহীদের পক্ষে সাহস ও উদ্দীপনার অভাব না থাকিলেও কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বে অভাবে লক্ষ্যহীন হইয়া পড়ে।

বিদ্রোহীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব

বিদ্রোহী শিবিরে অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ ও বিভেদের জন্য বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়াছিল। বাহাদুর শাহ মুঘল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চাহিয়াছিলেন। নানাসাহেব চাহিতেছিলেন মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবন। ঝাঁসির রানী নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধারেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। ইহার ফলে বিদ্রোহীদের পরিকল্পনা ও কার্যাবলী প্রথম হইতেই দ্বিধাগ্রস্ত ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অপরদিকে ইংরেজ সেনাপতি লরেন্স ভ্রাতৃদ্বয়, নিকলসন, আউট্রাম, হ্যাভলক, এডওয়ার্ড প্রভৃতি নিপুণ দক্ষতা, অবিচল চেষ্টা এবং অসমসাহসিকতা ব্রিটিশ শাসকদের সাফল্যকে সুনিশ্চিত করিয়াছিল।

বিদ্রোহের তাৎপর্য। মহাবিদ্রোহ ইহার পূর্বেকার বিদ্রোহগুলির তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক ও তীব্র ছিল। তাহা ছাড়া আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এই

বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কারণ ইংরেজ বিতাড়ন সম্পর্কে বিদ্রোহীদের কোন দ্বিমত ছিল না। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলেও ইহার আদর্শ ব্যর্থ হয় নাই। দেশকে পরাধীনতার গ্লানি হইতে উদ্ধার করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিতে হইবে—মহাবিদ্রোহ হইতে ভারতবাসী এই শিক্ষালাভ করে। পরবর্তীকালে বহু দেশপ্রেমিক বিশেষ চরমপন্থীরা এই বিদ্রোহ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে এই মহাবিদ্রোহ আধুনিক ভারতের ইতিহাসে চিরভাস্বর।

পরিশিষ্ট

বংশ তালিকা

হর্যঙ্ক বংশ (৫৪৫—৪১৩ খ্রীঃ পূঃ)

বিন্দুসার
|
অজাতশত্রু
|
উদয়ন
|
অনিরুদ্ধ ও মুণ্ড
|
নাগদাসক

শিশুনাগ বংশ

শিশুনাগ
|
কাকবর্ণ
|
নন্দীবর্মণ

নন্দ বংশ

মহাপদ্মনন্দ
উগ্রসেন
ধননন্দ

মৌর্য বংশ

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (৩২৫—৩০০ খ্রীঃ পূঃ)
|
বিন্দুসার অমিত্রঘাত (৩০০—২৭২ খ্রীঃ পূঃ)
|
প্রিয়দর্শী অশোক (২৭২—২৩২ খ্রীঃ পূঃ)
|
কুণাল
|
দশরথ, সম্প্রতি
|
শালিশূক
|
বৃহদ্রথ (—১৮৭ খ্রীঃ পূঃ)

গুপ্ত বংশ

- শ্রীগুপ্ত
- ঘটোৎকচগুপ্ত
- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
- সমুদ্রগুপ্ত (পরাক্রমাঙ্ক)
- দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য'
- প্রথম কুমারগুপ্ত
  - স্কন্দগুপ্ত
  - পুরুগুপ্ত
    - নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য
      - দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত
        - বিষ্ণুগুপ্ত
    - বুধগুপ্ত
      - তথাগতগুপ্ত
        - বালাদিত্য
  - ঘটোৎকচগুপ্ত

পাল বংশ

- গোপাল
- ধর্মপাল
- দেবপাল
- প্রথম বিগ্রহপাল [প্রথম শূরপাল)
- নারায়ণপাল
- রাজ্যপাল
- দ্বিতীয় গোপাল
- দ্বিতীয় বিগ্রহপাল
- প্রথম মহীপাল
- নয়পাল
- তৃতীয় বিগ্রহপাল
  - দ্বিতীয় মহীপাল
    - গোবিন্দপাল
  - দ্বিতীয়শূরপাল
  - রামপাল

দাস বংশ

(১) কুতব-উদ্দিন আইবক (১২০৬-১২১০)

(২) আরাম শাহ্ (১২১০-১২১১) কন্যা (৩) ইলতুৎমিস্ (১২১১-১২৩৬)

নাসিরউদ্দিন মহম্মদ
(৪) রুকনউদ্দিন ফিরোজ (১২৩৬)
(৫) রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০)
(৬) মুঈজউদ্দিন বাহরাম (১২৪০-১২৪২)
(৮) নাসিরউদ্দিন (১২৪৬-১২৬৫)

(৭) আলাউদ্দিন মসূদ (১২৪২-১২৪৬)
(৯) উলুঘ্ খাঁ বলবন বা গিয়াস-উদ্দিন বলবন (নাসিরউদ্দিনের শ্বশুর) (১২৬৬-১২৮৭)

বুঘরা খাঁ
মহম্মদ

(১০) কৈকোবাদ (১২৮৭-১২৯০)

খলজী বংশ

কায়িম খাঁ

(১) জালালউদ্দিন ফিরোজ শাহ্ (১২৯০-১২৯৬)
মামুদ

(২) রুকনউদ্দিন ইব্রাহিম (১২৯৬)

(৩) আলাউদ্দিন খল্জী (১২৯৬-১৩১৬)

খিজির খাঁ
(৫) শিহাবউদ্দিন ওমর (১৩১৬)
(৫) কুতবউদ্দিন মুবারক (১৩১৬-১৩২০)

(৬) নাসিরউদ্দিন খসুর (১৩২০)

তুঘলক বংশ

(১) গাজী মালিক ঃ গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫)
রজব

(২) জুনা খাঁ ঃ মহম্মদ-বিন-তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১)
(৩) ফিরোজ শাহ্ (১৩৫১-১৩৮৮)

ফতে খাঁ
জাফর খাঁ
(৬) মহম্মদ শাহ্ (১৩৯০-১৩৯৪)

(৪) গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩৮৮)
(৮) নসরৎ শাহ্ (১৩৯৪-১৩৯৯)
(৫) আবুবক্র শাহ্ (১৩৮৮-১৩৯০)

(৭) আলাউদ্দিন সিকন্দর (১৩৯৪)
(৯) মহমুদ তুঘ্লক (দ্বিতীয়) (১৩৯৯-১৪১৩)

মুঘল বংশ

- (১) বাবর (১৫২৬-৩০)
  - (২) হুমায়ুন (১৫৩০-৪০, ১৫৫৫-৫৬)
    - (৩) আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)
      - (৪) জাহাঙ্গীর (যুবরাজ সেলিম) (১৬০৫-২৭)
        - খস্রু
        - পর্ভেজ
        - (৫) শাহ্জাহান (খুর্রম) (১৬২৭-৫৮)
          - দারা শিকোহ্
          - সুজা
          - (৬) ঔরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭)
            - মহম্মদ
            - (৭) মোয়াজ্জেম বা প্রথম বাহাদুর শাহ্ বা প্রথম শাহ্ আলম (১৭০৭-১২)
              - (৮) জাহান্দার শাহ্ (১৭১২-১৩)
                - (১৪) দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯)
                  - (১৫) দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬)
                    - (১৬) দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-৩৭)
                      - (১৭) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (১৮৩৭-৫৮)
              - আজিম-উস্-সান
                - (৯) ফার্রুকসিয়ার (১৭১৩-১৯)
              - রফি-উস্-সান
                - (১১) রফি-উদ্-দারাজাত (১৭১৯)
                - (১০) রফি-উদ্-দৌলা দ্বিতীয় শাহ্জাহান (১৭১৯)
                - মহম্মদ ইব্রাহিম
              - জাহান শাহ্
                - (১২) মহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-৪৮)
                  - (১৩) আহ্মদ শাহ্ (১৭৪৮-৫৪)
            - আজম্
            - আকবর
              - নেকুশিয়ার (১৭১৯)
            - কামবক্স
          - মুরাদ
        - শাহ্রিয়ার
      - মুরাদ
      - দানিয়াল
    - মির্জা হাকিম
  - কামরান
  - হিন্দাল
  - আস্করী

শিবাজীর মারাঠা বংশ

- শাহ্‌জী
  - শিবাজী (১৬৭৪-৮০)
    - প্রথম শম্ভুজী (১৬৮০-৮৯)
      - শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) (১৭০৮-৪৯)
        - রাজারাম (দত্তক) (১৭৪৯-৭৭) ← রাজারাম
          - দ্বিতীয় শাহু (দত্তক) (১৭৭৭-১৮০৮)
            - প্রতাপসিংহ (১৮০৮-৩৯)
            - শাহজী আপ্পাসাহেব
    - রাজারাম (১৬৯০-১৭০৮)
      - তৃতীয় শিবাজী
        - রাজারাম

পেশোয়া বংশ

- (১) বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০)
  - (২) প্রথম বাজীরাও (১৭২০-৪০)
    - (৩) বালাজী বাজীরাও (১৭৪০-৬১)
      - বিশ্বাস রাও
      - (৪) মাধব রাও (১৭৬১-৭২)
        - (৭) মাধব রাও নারায়ণ (১৭৭৪-৯৬)
      - (৫) নারায়ণ রাও (১৭৭২-৭৩)
    - (৬) রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) (১৭৭৩-৭৪)
      - অমৃত রাও (দত্তক)
      - (৯) দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৯৬-১৮১৮)
        - ধন্দুপন্থ নানাসাহেব (দত্তক)
      - (৮) চিমন্‌জী আপ্পা (১৭৯৬)
  - চিমন্‌জী আপ্পা
    - সদাশিব রাও ভাও

বাংলার নবাব বংশ

মুর্শিদকুলী খাঁ
(১৭১৮-২৭)
|
কন্যা = সুজাউদ্দিন খাঁ
(১৭২৭-৩৯)
|
সরফরাজ খাঁ
(১৭৩৯-৪০)

*　*　*

আলিবর্দী খাঁ
(১৭৪০-৫৬)

- কন্যা মেহেরউন্নিসা (ঘসেটি বেগম)
- কন্যা
  - শওকৎ জঙ্গ [পূর্ণিয়ার নবাব]
- কন্যা আমিনা বেগম
  - সিরাজউদ্দৌলা (১৬৫৬-৫৭)

*　*　*

মিরজাফর
(১৭৫৭-৬০, ১৭৬৩-৬৫)

- কন্যা ফতেমা বেগম = মীরকাশেম (১৭৬০-৬৩)
- নজম্‌উদ্‌দৌলা (১৭৬৫-৫৬)
- সৈয়ফউদ্‌দৌলা (১৭৬৬-৭০)

শিখ গুরুগণ

	গুরু নানক (১৪৩৯-১৫২৮)
দ্বিতীয়	গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২)
তৃতীয়	গুরু অমরদাস (১৫৫২-৭৪)
চতুর্থ	গুরু রামদাস (১৫৭৪-৮১)
পঞ্চম	গুরু অর্জন সিং ১৫৮১-১৬০৬)
ষষ্ঠ	গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৯-৪৫)
সপ্তম	গুরু হররাই (১৬৪৫-৬১।
অষ্টম	গুরু হরকিষণ (১৬৬১-৬৪)
নবম	গুরু তেগবাহাদুর (১৬৬৪-৭৫)
দশম	গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৭৫-১৭০৮)

কোম্পানী শাসনে গভর্নর ও গভর্নর-জেনারেলগণ

(১) বাঙলার (ফোর্ট উইলিয়ম) গভর্নরগণ

রবার্ট ক্লাইভ	১৭৫৭-৬০
হেনরী ভান্সিটার্ট	১৭৬০-৬৪
(লর্ড) রবার্ট ক্লাইভ (দ্বিতীয়বার)	১৭৬৪-৬৭
হ্যারি ভেরেল্স্ট	১৭৬৭-৬৯
জন কার্টিয়ার	১৭৬৯-৭২
ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭২-৭৪

(২) বাঙলার গভর্নর-জেনারেলগণ

[১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং আইন অনুসারে নিযুক্ত]

ওয়ারেন হেস্টিংস	১৭৭৪-৮৫
স্যার্ জন ম্যাক্ফারসন	১৭৮৫-৮৬
লর্ড কর্নওয়ালিস	১৭৮৬-৯৩
স্যার জন শোর	১৭৯৩-৯৮
লর্ড ওয়েলেস্লী	১৭৯৮-১৮০৫
লর্ড কর্নওয়ালিস (দ্বিতীয়বার)	১৮০৫
স্যার জর্জ বার্লো	১৮০৫-০৭
আর্ল অব্ মিন্টো	১৮০৭-১৩
মারকুইস অব্ হেস্টিংস	১৮১৩-২৩
লর্ড আমহার্স্ট	১৮২৩-২৮
লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক	১৮২৮-৩৩

(৩) ভারতের গভর্নর-জেনারেলগণ

[১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানীর সনদ আইন অনুসারে নিযুক্ত]

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক	১৮৩৩-৩৫
স্যার্ চার্লস্ (লর্ড) মেট্কাফ	১৮৩৫-৩৬
লর্ড অকল্যাণ্ড	১৮৩৬-৪২
লর্ড এলেনবরা	১৮৪২-৪৪
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪-৪৮
লর্ড ডালহৌসী	১৮৪৮-৫৬
লর্ড ক্যানিং	১৮৫৬-৫৮

অনুশীলনী

প্রাচীন যুগ

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মূখী প্রশ্ন ঃ

(ক) ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে ভারতবর্ষ কয়টি প্রধান ভাগে বিভক্ত? (খ) কোন্ পর্বতমালা ভারতবর্ষকে এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে? (গ) কোন্ পর্বতমালা উত্তর ভারতকে দক্ষিণ ভারত হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে? (ঘ) ভারতের জনগণকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়? (ঙ) ভারতের ইতিহাস সাধারণতঃ কয়ভাগে বিভক্ত? (চ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং ইহারা কি কি? (ছ) 'রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা কে? (জ) 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থের রচয়িতা কে? (ঝ) 'হাতিগুম্ফা লিপি'র রচয়িতা কে? (ঞ) 'এলাহাবাদ লিপি'র রচয়িতা কে? (ট) কোন্ গ্রীক দূতের বিবরণ হইতে মৌর্যযুগের ইতিহাস জানা যায়? (ঠ) প্রাচীন ভারতে দুইজন চৈনিক পর্যটকের নাম লিখ। (ড) প্লিনি রচিত ইতিহাস গ্রন্থটির নাম কি?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিমালয়ের প্রভাব কিরূপ? (খ) ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিন্ধ্য পর্বতের প্রভাব কিরূপ? (গ) সমুদ্র ও সমভূমি অঞ্চল ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কিভাবে প্রভাবিত করিয়াছে? (ঘ) ভারতবর্ষকে জাতিসমূহের যাদুঘর ethnological museum) বলা হয় কেন? (ঙ) ভারতবর্ষের ইতিহাসে কী কী বৈচিত্র্য দেখা যায়? (চ) ভারতের ইতিহাসে ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐক্য বলিতে কি বুঝ? (ছ) ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় সাহিত্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানিতে কিভাবে সাহায্য করে? (জ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় লিপির গুরুত্ব কি? (ঝ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় মুদ্রার গুরুত্ব আলোচনা কর। (ঞ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে ভারতের ইতিহাস কিভাবে জানা যায়? (ট) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ভারতের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক বিভাগগুলি বর্ণনা কর। (খ) ভারতের ইতিহাসের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর। (গ) ভারতের অধিবাসীদের জাতিগত গঠন সম্পর্কে আলোচনা কর। (ঘ) 'ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বর্তমান'—আলোচনা কর। (ঙ) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রধান উপাদানগুলি আলোচনা কর। (চ) ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির

গুরুত্ব আলোচনা কর। (ছ) ধর্মগ্রন্থ, প্রাচীন সাহিত্য ও লিপি হইতে ভারতের ইতিহাস কিভাবে জানা যায়?

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী কোন্ যুগের লোক? (খ) আগুনের ব্যবহার সর্বপ্রথম কোন্ যুগের মানুষ জানিত? (গ) মহেঞ্জোদারো সভ্যতা কে আবিষ্কার করেন? (ঘ) ভারতের প্রাক্-আর্য সভ্যতা কি নামে অভিহিত হয়? (ঙ) সিন্ধু সভ্যতা কত বৎসর আগে গড়িয়া ওঠে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ভারতের পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল? (খ) ভারতে নব্য-প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি কি? (গ) সিন্ধু সভ্যতা কতদূর বিস্তৃত ছিল? (ঘ) হরপ্পা নগরের বর্ণনা দাও। (ঙ) মহেঞ্জোদারো নগরের বর্ণনা দাও। (চ) সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের খাদ্য, পরিধেয় ও অস্ত্রশস্ত্র কিরূপ ছিল? (ছ) সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা কি জানি? (জ) সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের ধর্মীয় জীবন কিরূপ ছিল?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগরভিত্তিক সভ্যতার বিবরণ দাও। (খ) সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর। (গ) সিন্ধু সভ্যতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। (ঘ) সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ কি?

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) 'আর্য' কাহাদের বলা হয়? (খ) আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য কি? (গ) বেদ কয়ভাগে বিভক্ত ও ইহারা কি কি? (ঘ) প্রাচীনতম বেদ কোন্‌টি? (ঙ) প্রতিটি বেদ কয়ভাগে বিভক্ত? ইহাদের নাম কি? (চ) বেদের অপর নাম কি? ইহাকে এইরূপ বলা হয় কেন? (জ) বেদাঙ্গ কয়টি এবং কি কি? (ঝ) কল্পসূত্র কয়টি এবং কি কি? (ঞ) 'আরণ্যক' ও 'উপনিষদ' কি? (ট) চারজন বৈদিক দেবতার নাম লিখ। (ঠ) 'চতুরাশ্রম' কি?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল? (খ) বেদের পরিচয় সংক্ষেপে লিখ। (গ) আদি বৈদিক যুগের সামাজিক জীবন কিরূপ ছিল? (ঘ) আদি বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ঙ) আদি-বৈদিক যুগের ধর্মীয় জীবন কিরূপ ছিল? (চ) বৈদিক যুগের জাতিভেদ প্রথা কিভাবে দেখা দেয়? (ছ) ভারতের লৌহযুগে কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

৩। রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ। (খ) আর্যদের সাহিত্য

সম্বন্ধে আলোচনা কর। (গ) আদি বৈদিক (বা ঋগ্বেদ) যুগের জনজীবন কিরূপ ছিল? (ঘ) আদি বৈদিক যুগের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের বিবরণ দাও। (ঙ) আদি বৈদিক যুগের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনের বিবরণ দাও। (চ) পরবর্তী বৈদিক যুগের জনজীবন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ। (ছ) ভারতে বৈদিক সভ্যতার কিভাবে বিস্তার ঘটে?

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) বুদ্ধ ও মহাবীরের পূর্বে দুইজন প্রতিবাদী ধর্মীয় নেতার নাম লিখ। (খ) শেষ দুইজন জৈন তীর্থঙ্করের নাম কি? (গ) জৈন ধর্মমতে কয়জন তীর্থঙ্কর জৈনধর্মের প্রবর্তন করেন? (ঘ) মহাবীর কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন? (ঙ) 'জিন্' শব্দের অর্থ কি? (চ) জৈন সম্প্রদায় প্রধানতঃ কয়ভাগে বিভক্ত? (ছ) বুদ্ধদেবের কোথায় জন্ম হয়? (জ) বুদ্ধদেব কোথায় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন? (ঝ) বুদ্ধদেব কোথায় ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন? (ঞ) বুদ্ধদেবের দুইজন শিষ্যের নাম লিখ। (ট) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের নাম কি? (ঠ) বুদ্ধদেব কোথায় দেহত্যাগ করেন? (ড) চারিটি আর্যসত্যের কথা কে বলেন? (ঢ) অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা কে বলেন? ণ) 'নির্বাণ' কথার অর্থ কি?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) বুদ্ধ ও মহাবীরের আগে বেদ-বিরোধী ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি টীকা লিখ। খ মহাবীর কিভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন? (গ) জৈনধর্মের শিক্ষা কি? (ঘ) জৈনধর্মমতে মুক্তিলাভের উপায় কি? (ঙ) জৈনধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে কি জান? (চ) গৌতম বুদ্ধ কিভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন? (ছ) বৌদ্ধ ধর্মমতে চারিটি আর্যসত্য কি? (জ) 'নির্বাণ' কাহাকে বলে? নির্বাণ লাভের উপায় কি? (ঝ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলিতে কি বুঝ? (ঞ) বৌদ্ধ ধর্মমতে পঞ্চশীল কি? (ট) বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের উৎপত্তি কিভাবে ঘটে?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) প্রাচীন ভারতে প্রতিবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের কারণ বিশ্লেষণ কর। (খ) মহাবীরের জীবনী ও ধর্মমত সংক্ষেপে আলোচনা কর। (গ) ধর্মমত সহ বুদ্ধদেবের জীবনী সংক্ষেপে লিখ। (ঘ) বুদ্ধদেবের ধর্মমত সংক্ষেপে বুঝাইয়া দাও। (চ) ভারতে ও ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের দ্রুত প্রসারের কারণ কি? (চ) বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) ষোড়শ মহাজনপদের যুগে চারিটি প্রধান রাজ্যের নাম লিখ। (খ) হর্যঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (গ) রাজগৃহ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঘ) পাটলিপুত্র নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঘ) নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঙ) কোন নন্দরাজকে

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পরাজিত করেন ? (চ) চন্দ্রগুপ্ত কোন্ সালে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করেন ? (ছ) বিন্দুসার কি উপাধি গ্রহণ করেন? (জ) সম্রাট অশোক কোন্ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন ? (ঝ) সিংহাসন আরোহণের কয় বৎসর পরে অশোকের রাজ্যাভিষেক হয় ? (ঞ) রাজ্যাভিষেকের কয় বৎসর পরে অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করেন ? (চ) দারায়ুস কোন্ দেশের রাজা ছিলেন ? (ছ) আলেকজাণ্ডার কোন্ সালে ভারত আক্রমণ করেন ? (জ) কোন্ ভারতীয় রাজা আলেকজাণ্ডারের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন ? (ঝ) কোন্ ভারতীয় রাজা আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? (ণ) আলেক-জাণ্ডারের সহিত পুরুর যুদ্ধ কি নামে খ্যাত ? (ত) কোন্ বিদেশী রাজা 'ভারতীয়দের রাজা' উপাধি গ্রহণ করেন ? (থ) মিনান্দার কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন ? (দ) 'মিলিন্দ পাণ্ডহো' কি ? (ধ) 'গরুড়স্তম্ভ' কি ? (ন) কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (প) কণিষ্ক কোন্ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (ফ) 'বুদ্ধচরিত' গ্রন্থের লেখক কে? (ব) 'গান্ধার শিল্প' কোন্ যুগের শিল্প ? (ভ) সাতবাহন সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ? (ম) কোন্ সাতবাহন রাজা 'শক-যবন-পহ্লব-নিসূদন' উপাধি গ্রহণ করেন ? (য) কোন্ গুপ্ত সম্রাট 'পরক্রমাঙ্ক' উপাধি গ্রহণ করেন ? (র) সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের কয়জন রাজাকে পরাজিত করেন ? (ল) সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কোন্ শক রাজাকে পরাজিত করেন ? (ব) কোন্ গুপ্ত সম্রাট হুনদের পরাজিত করেন ? (শ) 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' গ্রন্থটির লেখক কে ? (ষ) গুপ্ত-যুগের দুইজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম লিখ।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ষোড়শ মহাজনপদ বলিতে কি বুঝ ? (খ) বিম্বিসার কিভাবে মগধের বিস্তার ঘটান ? (গ) মগধে নন্দ বংশের শাসন সম্বন্ধে কি জান ? (ঘ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশপরিচয় সম্পর্কে কি জান ? (ঙ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ (১) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, (২) মেগাস্থিনিসের বিবরণ। (চ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সহিত গ্রীক শাসক সেলুউকাসের সম্পর্ক কিরূপ ছিল ? (ছ) সম্রাট অশোকের ধর্মনীতি কি ছিল ? (জ) সম্রাট অশোক ধর্মপ্রচারের জন্য কোন্ কোন্ রাজ্যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ? (ঝ) অশোককে কেন একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয় ? (ঞ) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল ? (ট) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল কি হইয়াছিল ? (ঠ) ভারতে ব্যাক্ট্রিয়ান বা বাহ্লিক গ্রীক রাজত্বের বিবরণ দাও। (ড) ভারতে শক শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ঢ) মৌর্য শিল্পকলা সম্পর্কে একটি টীকা লিখ। (ণ) কুষাণরা কিভাবে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন ? (ত) গান্ধার শিল্প সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। (থ) সাতবাহন সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক সম্বন্ধে কি জান ? (দ) সাতবাহন সাম্রাজ্যের গুরুত্ব কি ? (ধ) সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারত কিভাবে জয় করেন ? (ন) সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ ভারত বিজয়নীতি কি ছিল ? (প) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শক বিজয়ের কাহিনী লিখ। (ফ) গুপ্ত স্যাম্রাজ্যের হুন আক্রমণের সম্বন্ধে কি জান ? (ব) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ— ফা হিয়েন। (ভ) গুপ্ত যুগে সাহিত্যের কিরূপ বিকাশ ঘটে ? (ম গুপ্তযুগে বিজ্ঞাসের কিরূপ উন্নতি ঘটে ?

৩। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) বিম্বিসার হইতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত মগধের সম্প্রসারণের বিবরণ দাও। (খ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (গ) মৌর্য শাসনব্যবস্থার একটি বিবরণ দাও। (ঘ) সম্রাট অশোকের জীবনী ও কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ঙ) অশোক তাঁহার সাম্রাজ্যে ও সাম্রাজ্যের বাহিরে ধর্মপ্রচারের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন? (চ) প্রজাহিতৈষী সম্রাট হিসাবে সম্রাট অশোকের কার্যাবলীর মূল্যায়ন কর। (ছ) সম্রাট অশোককে কেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়? (জ) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও। এই আক্রমণের ফলাফল কি হইয়াছিল? (ঝ) উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসনের বিবরণ দাও। (ঞ) ভারতে কুষাণ শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (ট) বিজেতা, শাসক ও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে কণিষ্কের মূল্যায়ন কর। (ঠ) দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের বিবরণ দাও। (ড) ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের যুগকে গৌরবময় যুগ বলা হয় কেন? (ঢ) সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বিবরণ দাও। (ণ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর। কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য বলা যায় কিনা তাহা আলোচনা কর। (ত) ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগকে সুবর্ণময় যুগ বলা হয় কেন? (থ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি?

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) যশোধর্মন কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন? (খ) শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল? (গ) হর্ষবর্ধন কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? (ঘ) শিলাদিত্য' উপাধি কে গ্রহণ করিয়াছিলেন? (ঙ) হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কোন্ চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন? (চ) 'মাৎস্যন্যায়' কাহাকে বলে? (ঝ) 'ত্রিশক্তি সংগ্রাম' কাহাকে বলা হয়? (জ) পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঝ) পাল বংশের রাজারা কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন? (ঞ) কৈবর্ত বিদ্রোহ কাহাকে বলে? (ট) 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের লেখক কে? (ড) দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের চারিটি রাজবংশের নাম লিখ। (ণ) দ্বিতীয় পুলকেশী কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? (ত) দন্তিদুর্গ ও তৃতীয় গোবিন্দ কোন্ বংশের রাজা ছিলেন? (দ) চোল বংশের দুইজন রাজার নাম লিখ।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) যশোধর্মন কিভাবে হুন আক্রমণ প্রতিরোধ করেন? (খ) হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের যুদ্ধ হইবার কারণ কি? (গ) হর্ষবর্ধন কিভাবে থানেশ্বর ও কনৌজের সংযুক্তি ঘটান? (ঘ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ হিউয়েন সাঙ। (ঙ) পাল বংশ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? (চ) ধর্মপাল সম্বন্ধে কি জান? (ছ) দক্ষিণ ভারতে চালুক্য-পল্লব

সংগ্রাম সংক্ষেপে লিখ। (জ) দ্বিতীয় পুলকেশী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। (ঝ) চোল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে? তাঁহার রাজত্বকালের বিবরণ দাও।

৩। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) রাজা শশাঙ্কের জীবনী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। (খ) হর্ষবর্ধনের শাসনকালের ঘটনাবলী ও শাসক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব সংক্ষেপে আলোচনা কর। (গ) হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ হইতে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য সম্পর্কে কি জানা যায়? (ঘ) গুর্জর প্রতিহার সাম্রাজ্য উত্থান ও পতনের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ। (ঙ) গুপ্তোত্তর ভারতে ত্রিশক্তির সংগ্রামের বিবরণ দাও। (চ) বাংলাদেশে পাল সাম্রাজ্যে উত্থান ও পতনের বিবরণ দাও। (ছ) বাংলাদেশে সেন বংশের রাজত্বের বিবরণ দাও। (জ) দাক্ষিণাত্যে চালুক্যদের শাসনের বিবরণ দাও। (ঝ) দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট রাজত্ব সম্পর্কে তুমি কি জান? (ঞ) দক্ষিণ ভারতে চোল সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের বিবরণ দও। চোল শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান?

।। সপ্তম অধ্যায় ।।

১। **বিষয়মূখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও শীলভদ্র কোন্ যুগের লোক? (খ) 'পবনদূত' গ্রন্থটি কাহার লেখা? (গ) 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থটি কে রচনা করেন? (ঘ) সন্ধ্যাকর নন্দী কোন্ যুগের লোক? (ঙ) পাল রাজাদের শাসনকালের দুইটি প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের নাম কর। (চ) পাহাড়পুর কোথায় অবস্থিত ও কোন্ যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন? (ছ) 'খাজুরাহো' কোন্ বংশের শাসনকালের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন? (জ) কোণারকের সূর্যমন্দির কোন্ বংশের শাসনকালে স্থাপিত হইয়াছিল? (ঝ) পল্লবদের একটি স্থাপত্য শিল্পের নাম লিখ। (ঞ) 'কিরাতার্জুনীয়ম্' গ্রন্থের লেখক কে? (ট) 'রাজরাজেশ্বরের মন্দির' কোথায় অবস্থিত? ইহা কোন যুগের শিল্প নিদর্শন? (ঠ) 'হাজার বুদ্ধের গুহা' কোথায় অবস্থিত? (ড) খোটান, কুচা ও তুরফান কোথায় অবস্থিত? (ঢ) অঙ্কোরভাট মন্দির কোথায় অবস্থিত? (ণ) শৈলেন্দ্র রাজবংশ রাজারা কোথায় রাজত্ব করিতেন? (ত) বরবুদর মন্দির কোথায় অবস্থিত?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভীত্তক প্রশ্ন ঃ**

(ক) পাল ও সেনযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন কিরূপ ছিল? (খ) পাল ও সেনযুগের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি কিরূপ হইয়াছিল? (গ) চন্দেল্লরা কোন রাজ্যের শাসক ছিলেন? তাহাদের শিল্পকীর্তির বিবরণ লিখ। (ঘ) উড়িষ্যার গঙ্গদের শাসন কালের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের বিবরণ দাও। (ঙ) দক্ষিণ ভারতের ধর্ম ও সমাজজীবন সম্বন্ধে কি জান? (চ) পল্লব স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। (ছ) মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির কি কি নিদর্শন পাওয়া যায়? (জ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ (১) অঙ্কোরভাটের মন্দির, (২) বরবুদরের মন্দির। (ঝ) শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য কোন্ কোন্ অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) পাল ও সেন যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিবরণ দাও। (খ) চন্দেল্লদের শাসনকাল সম্বন্ধে কি জান ? (গ) প্রাচীন দক্ষিণ ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনা কর। (ঘ) দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের কিরূপ উন্নতি ঘটিয়াছিল ? (ঙ) মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের বিবরণ দাও। (চ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের বিবরণ দাও। (ছ) সুবর্ণদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের রাজত্বের বিবরণ দাও।

মধ্যযুগ

[সুলতানী যুগে ভারত]

।। প্রথম অধ্যায় ।।

১। সুলতানী ও মুঘল শাসনকালকে মধ্যযুগ না মুসলমান যুগ, কোন্ নামে অভিহিত করিবে ? তোমার উত্তরের পক্ষে দেখাও

।। দ্বিতীয় অধ্যায় ।।

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) সুলতানী যুগের ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ? (খ) 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' ও 'তরীখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থ দুইটির লেখকের নাম লিখ। (গ) আমীর খসরু লিখিত ইতিহাস গ্রন্থের নাম কি ? (ঘ) ইবন বতুতা কোন্ সুলতানের শাসনকালে ভারতে আসিয়াছিলেন ? (ঙ) সুলতানী আমলে কোন্ ইটালীয় পর্যটক দক্ষিণ ভারতে আসেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও ধর্মীয় সাহিত্য সুলতানী যুগের ইতিহাস রচনায় কিভাবে সাহায্য করে ? (খ) বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে সুলতানী যুগের ইতিহাস কি জানা যায় ?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

সুলতানী যুগের ঐতিহাসিক উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

।। তৃতীয় অধ্যায় ।।

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) হজরত মহম্মদের কোন্ সালে জন্ম ও কোন্ সালে মৃত্যু হয় ? (খ) হজ্জাজ কোথাবার শাসক ছিলেন ? (গ) কোন্ আরব সেনাপতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ? (ঘ) দাহির কোন্ রাজ্যের রাজা ছিলেন ? (ঙ) আরবদের সিন্ধু বিজয়ের সময় কাহাদের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল ?

২। রচনাধর্মী প্রশ্ন :

আরবদের সিন্ধু বিজয় সম্বন্ধে কি জান ? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল ?

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক সুলতান মামুদ কোন্ রাজ্যের সুলতান ছিলেন ? (খ) সুলতান মামুদ কোন্ সালে প্রথম ভারত আক্রমণ করেন ? (গ) সুলতান মামুদের সঙ্গে কোন্ পণ্ডিত ভারতে আসিয়াছিলেন ? (ঘ) আলবিরুণী রচিত গ্রন্থটির নাম কি ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(প্র) সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল ? (খ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—অলবিরুণী। (গ) সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও। এই আক্রমণের ফলাফল কি হইয়াছিল ?

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) মহম্মদ ঘোরী কোন্ রাজ্যের শাসক ছিলেন ? (খ) তরাইনের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? গ) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে, কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল ? (ঘ দাস সুলতানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ঙ) ভারতে সুলতানী শাসন কবে শুরু হয় ? (চ) কোন্ মুসলিম নারী সুলতানী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ? (ছ) 'সুলতান-ই-আজম' উপাধিতে কে কাহাকে ভূষিত করেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ কুতুবউদ্দিন আইবক। (খ) ইলতুৎমিস মঙ্গোল আক্রমণ প্রতিরোধে কি কূটনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) মহম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বে ভারতে ইসলাম প্রভুত্ব স্হাপনের কাহিকী সংক্ষেপে লিখ। (খ) সুলতান ইলতুৎমিসের রাজত্বকালের বিবরণ দাও ও তাঁহার কৃতিত্ব আলোচনা কর। (গ) গিয়াসউদ্দিন বলবল সুলতানী শাসনব্যবস্হায় কিরূপ নীতি গ্রহণ করিয়া ছিলেন ? তাঁহার কৃতিত্ব আলোচনা কর।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক(খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? খ) কোন্ সালে খলজীর বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ? (গ) কোন্ সুলতান দাম ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধে আলাউদ্দিন খলজী কি ব্যবস্হা গ্রহণ করিয়াছিলেন? (খ) আলাউদ্দিন খলজী দাক্ষিণাত্য বিজয়নীতি? কি (গ) আলাউদ্দিন দাম ব্যবস্হা নিয়ন্ত্রণে কি ব্যবস্হা গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) আলাউদ্দিনের রাজ্যশাসন ও রাজ্যবিস্তারের বিবরণ দাও। তাঁহাকে দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয় কেন? (খ) দাম ব্যবস্থার বিশেষ আলোচনা সহ আলাউদ্দিনের শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) তুঘলক সুলতানীর প্রতিষ্ঠাতা কে? (খ) কোন্ সুলতান তাম্রমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন? (গ) কোন্ সুলতান রাজধানী স্থানান্তর করিয়াছিলেন? (ঘ) কোন্ সালে বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে? (ঙ) জিজিয়া কর কে প্রথম স্থাপন করেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের পক্ষে কি যুক্তি ছিল? ইহা কেন ব্যর্থ হয়? (খ) মহম্মদ বিন তুঘলক তাম্রমুদ্রার প্রচলন করেন কেন? ইহার ফল কি হইয়াছিল? (গ) মহম্মদ বিন তুঘলককে 'খেয়ালী সুলতান' বলা হয় কেন? (ঘ) ফিরোজ শাহ তুঘলকের জনহিতকর কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) মহম্মদ বিন তুঘলকের সংস্কারগুলির বিবরণ দাও। এইগুলি ব্যর্থ হইয়াছিল কেন? (খ) মহম্মদ বিন তুঘলকের কার্যাবলী আলোচনা করিয়া সুলতানী শাসক হিসাবে তাহার মূল্যায়ন কর। (গ) ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালের বিবরণ দাও।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) তৈমুরলঙ কোন্ সালে কোন্ সুলতানের শাসনকালে ভারত আক্রমণ করেন? (খ) সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (গ) শেষ সুলতানী বংশের নাম কি? (ঘ) কোন্ সালে সুলতানী শাসনের অবসান ঘটে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ঃ

সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—(১) তৈমুরলঙ্, (২) লোদী বংশ।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

দিল্লীর সুলতানীর ক্রমাবনতি ও পতনের বিবরণ দাও।

॥ নবম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) কোন্ সুলতান বঙ্গদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন? (খ) বঙ্গদেশে প্রথম স্বাধীন সুলতানী বংশের নাম লিখ। (গ) বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন সুলতান কে? (ঘ) হুসেন শাহী বংশের রাজত্বকালের একজন ধর্মপ্রচারকের নাম কর। (ঙ) হুসেন শাহী বংশের দুইটি স্থাপত্যকীর্তির নাম লিখ। (চ) বাহমনী রাজ্য কোন সালে কাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত

হয়? (ছ) মহম্মদ গাওয়ান কে ছিলেন? (জ) দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি সুলতানী রাজ্যের নাম লিখ, যেগুলি বাহমনী রাজ্য হইতে উদ্ভূত হয়। (ঝ) বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঞ) কৃষ্ণদেব রায় কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন? (ট) বিজয়নগর রাজ্যে আগত দুইজন বৈদেশিক পর্যটকদের নাম লিখ।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) বঙ্গদেশে কিভাবে স্বাধীন সুলতানী প্রতিষ্ঠিত হয়? (খ) সামসুদ্দিন ইলিয়াসের সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। (গ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—(১) হুসেন শাহ, (২) নসরৎ শাহ। (ঘ) বঙ্গদেশের ইতিহাসে হোসেন শাহী বংশ স্মরণীয় কেন? (ঙ) বাহমনী রাজ্যে কিভাবে পাঁচটি স্বাধীন সুলতানী রাজ্যে ভাগ হইয়া যায়? (চ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—কৃষ্ণদেব রায়।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) বাঙলাদেশে স্বাধীন সুলতানী রাজত্বের ইতিহাস লিখ। (খ) দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্যের উত্থান ও পতনের বিবরণ দাও। (গ) বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ কি? সংঘর্ষের বিবরণ দাও। (ঘ) বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান ও পতনের বিবরণ দাও। (ঙ) বিজয়নগর রাজ্যের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবরণ দাও।

॥ দশম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) সুলতানী যুগের একজন কবি ও সাহিত্যিকের নাম লিখ। (খ) সুলতানী যুগের দুইজন ঐতিহাসিকের নাম লিখ। (গ) সুলতানী যুগে দিল্লীর দুইটি স্থাপত্য-কীর্তির নাম লিখ। (ঘ) সুলতানী আমলের দুইজন ভক্তিবাদী সাধকের নাম লিখ। (ঙ) দুইজন সুফীবাদী ধর্মীয় সাধকের নাম লিখ।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) সুলতানী যুগে উর্দু ভাষার উৎপত্তি কিভাবে ঘটে? (খ) সুলতানী যুগে প্রাদেশিক ভাষার বিকাশ কিরূপ হয়? (গ) স্থাপত্য শিল্পে দিল্লী রীতি ও প্রাদেশিক রীতি বলিতে কি বুঝ? (ঘ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—(১) ভক্তিবাদ, (২) সুফীবাদ। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—(১) কবীর, (২) শ্রীচৈতন্য, (৩) গুরু নানক।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) সুলতানী যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিবরণ দাও। (খ) সুলতানী যুগে ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ কিরূপ ঘটে? (গ) সুলতানী যুগে ধর্মীয় আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ। (ঘ) ভক্তিবাদী আন্দোলন কাহাকে বলে? ভক্তিবাদী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া দুইজন ভক্তিবাদী সাধকের পরিচয় দাও। (ঙ) সুফীবাদের উপর একটি প্রবন্ধ লিখ।

মুঘল যুগে ভারত

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) 'আইন-ই আকবরী' ও 'আকবরনামা' গ্রন্থ দুইটির লেখক কে? (খ) 'বাবর-নামা' গ্রন্থটির লেখক কে? (গ) গুলবদন বেগমের লেখা গ্রন্থটির নাম লিখ। (ঘ) মুঘল আমলের দুইজন বৈদেশিক পর্যটকের নাম লিখ।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মুঘল যুগের লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে মুঘল যুগের ইতিহাস আমরা কিভাবে জানিতে পারি? (খ) বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণ হইতে মুঘল যুগের ইতিহাস আমরা কিভাবে জানিতে পারি?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কবে, কাহাদের মধ্যে ঘটে? (খ) খানুয়ার যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে কোন্ সালে সংঘটিত হয়? (গ) খানুয়ার যুদ্ধে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীর নেতা কে ছিলেন? (ঘ) বাবর কয় বৎসর রাজত্ব করেন? (ঙ) বাবরের লিখিত আত্মজীবনীর নাম কি?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) 'মুঘল' কথাটির উৎপত্তি কিভাবে ঘটে? (খ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সম্বন্ধে কি জান? এহ যুদ্ধের গুরুত্ব কি? (গ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ—খানুয়ার যুদ্ধ।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

বাবর কর্তৃক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) শের শাহের বাল্যনাম কি ছিল? (ক) শের শাহ হুমায়ুনকে কোন্ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন? (গ) শের শাহ কত বছর রাজত্ব করেন? (ঘ) হুমায়ুন কত বছর রাজত্ব করেন? (ঙ) 'কবুলিয়ত' ও 'পাট্টা' কে প্রবর্তন করেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মুঘল যুগে মুঘল-আফগান সংঘর্ষ সম্বন্ধে কি জান? (খ) শের শাহ রাজস্ব ব্যবস্থার কি সংস্কার সাধন করেন?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ভারতে মুঘল-আফগান যুদ্ধের বিবরণ দাও। (খ) শের শাহ কিভাবে

ভারতে আফগান শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন ? তাহার কৃতিত্ব আলোচনা কর। (গ) শের শাহের শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) আকবর কোন্ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন ? (খ) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে কোন্ সালে সংঘটিত হয়েছিল ? (গ) হলদিঘাটের যুদ্ধ কবে কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হয় ? (ঘ) আকবরের সময় মুঘল সাম্রাজ্যে কয়টি সুবা ছিল ? (ঙ) 'দীন-ই-ইলাহী' ধর্ম কে প্রবর্তন করেন ? (চ) আকবরের রাজসভার দুইজন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির নাম লিখ।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের বিবরণ দাও। (খ) আকবরে রাজপুত নীতি কিরূপ ছিল ? (গ) আকবর মেবার কিভাবে জয় করেন ? (ঘ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ রাণা প্রতাপসিংহ। (ঙ) মনসবদারী প্রথা কাহাকে বলে ? (চ) আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থায় কি সংস্কার প্রবর্তন করিন ? (ছ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—'দীন-ই-ইলাহী' ধর্ম। (জ) আকবরের রাজসভায় জ্ঞানিগুণীদের কিরূপ সমাবেশ হইয়াছিল ?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও। সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে আকবর কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন ? (খ) আকবরের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা কর। (গ) আকবরের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক জীবনের বিবরণ দাও।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) জাহাঙ্গীর কোন্ শিখ গুরুকে প্রাণদণ্ড দেন ? (খ) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কোন্ ইংরেজ রাজদূত ভারতে আসিয়াছিলেন ? (গ) জাহাঙ্গীর রচিত আত্মজীবনীর নাম কি ? (ঘ) শাহজাহানের দুইটি প্রধান স্থাপত্যকীর্তির নাম লিখ।

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইউরোপীয় বণিকদের কার্যকলাপের বিবরণ দাও। (খ) জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নূরজাহানের ভূমিকা কিরূপ ছিল ? (গ) শাহজাহানের শিল্প ও স্থাপত্যকীর্তির বিবরণ দাও।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) নূরজাহানের ভূমিকা উল্লেখ করিয়া জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রধান ঘটনাসমূহের বর্ণনা দাও। (খ) শাহজাহানের রাজত্বকালের বিবরণ দাও।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া গৃহবিবাদে শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে কে

জয়লাভ করেন ? (খ) ঔরংজেব কোন্ সালে শেষবারের মত দাক্ষিণাত্যে যান ? (গ) ঔরংজেবের রাজত্বকালে জাঠদের নেতা কে ছিলেন ? (ঘ) শিবাজীর মায়ের নাম কি ? (ঙ) কোন্ সালে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হয় ? (চ) শিবাজীর প্রধানমন্ত্রী কি নামে অভিহিত হন ? (ছ) শিবাজীর অষ্টপ্রধানের নাম কি কি ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ঔরংজেবের রাজপুত নীতি কিরূপ ছিল ? (খ) ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান। (গ) শিবাজীর বাল্যজীবন সম্পর্কে কি জান ? (ঘ) 'চৌথ' ও 'সরদেশমুখী' কি ছিল ? (ঙ) 'শিলাদার' ও 'বর্গীর' কাহাদের বলা হইত ? (চ) শিবাজীর সামরিক বাহিনীর সংগঠন কিরূপ ছিল ? (ছ) ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির সুদূর-প্রসারী প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল ? (জ) ঔরংজেবের ধর্মীয় নীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) সিংহাসনের উত্তরাধিকার যুদ্ধে ঔরংজেব কীভাবে জয়লাভ করেন ? (খ) ঔরংজেবের রাজ্যবিস্তারের বিবরণ দাও। (গ) ঔরংজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি ও রাজপুত নীতির আলোচনা কর। এই নীতির ফল কি হইয়াছিল ? (ঘ) আকবর ও ঔরংজেবের রাজপুত নীতির তুলনামূলক আলোচনা কর। (ঙ) শাসক হিসাবে ঔরংজেবের মূল্যায়ন কর।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) কোন্ ইউরোপীয় নাবিক জলপথে প্রথমে ভারতে আসেন ? (খ) ইংরেজ দূত কোন্ মুঘল সম্রাটের রাজত্বকালে ভারতে আসেন ? (গ) মাদ্রাজে স্থাপিত ইংরেজদের দুর্গটির নাম কি ? (ঘ) কলিকাতায় স্থাপিত ইংরেজদের দুর্গটির নাম কি ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ভারতে পর্তুগীজদের কার্যলাপের বিবরণ দাও। (খ) ভারতে ওলন্দাজ কোম্পানীর কার্যকলাপ সম্বন্ধে কি জান ?

৩। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে ইউরোপীয় বণিক কোম্পানীগুলির কার্যকলাপের বিবরণ দাও। (খ) ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের পূর্ব পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) মুঘল যুগের তিনরকমের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর নাম লিখ। (খ) মুঘল যুগের দুইজন চিত্রশিল্পীর নাম লিখ। (গ) তানসেন কোন্ মুঘল সম্রাটের রাজত্বে

গায়ক ছিলেন? (ঘ) মুঘল যুগের তিনজন মহিলা সাহিত্যিকের নাম লিখ। (ঙ) 'রামচরিতমানস' গ্রন্থের লেখক কে? ইহা কোন্ ভাষায় লেখ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) মুঘল যুগের জায়গিরদারী ব্যবস্থা কিরূপ ছিল? (ঘ) মুঘল যুগের স্থাপত্য শিল্পের কিরূর উন্নতি ঘটে? (গ) মুঘল যুগের চিত্রশিল্প সম্পর্কে কি জান? (ঘ) মুঘল যুগের সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি টীকা লিখ।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) মুঘল যুগের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর। (খ) মুঘল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও। (গ) মুঘল যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের বিবরণ দাও। (ঘ) মুবল যুগে স্থাপত্য শিল্প, চিত্রশিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের কিরূপ বিকাশ ঘটে?

আধুনিক যুগ

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) ঔরংজেবের পর মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাট কে হন? (খ) মুঘল দরবারে দুইটি অভিজাতদের পরস্পর-বিরোধী দুইটি গোষ্ঠীর নাম কি? (গ) চিন গোষ্ঠীর নেতা কে ছিলেন? (ঘ) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নামে কাহারা পরিচিত? (ঙ) নাদির শাহ কোন সালে ভারত আক্রমণ করেন?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) ঔরংজেবের ধর্মীয় নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতখানি দায়ী? (খ) মুঘল যুগে জায়গিরদারী প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোচনা কর। (গ) মনসবদারী প্রথার ত্রুটি কী ছিল? (ঘ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—(১) চিন গোষ্ঠী, (২) জুলফিকার গোষ্ঠী, (৩) সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়। (ঙ) নাদির শাহের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে কি জান?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর। (খ) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে ঔরংজেবের দায়িত্ব কতটুকু? (গ) মুঘল দরবারের অভিজাতদের ষড়যন্ত্র মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য কতটুকু দায়ী?

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

১। বিশয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) কোন্ সালে বাংলার নবাবীর পত্তন হয়? (খ) বাংলার নবাবীর পত্তন কে করেন? (গ) স্বাধীন হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঘ) স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঙ) শিখ ধর্মগ্রন্থ 'আদিগ্রন্থ' কে সংকলন করেন? (চ) কোন্ শিখ গুরুকে ঔরংজেব প্রাণদণ্ড দেন? (ছ) শিবাজীর উত্তরাধিকারী কে ছিলেন? (জ) পেশোয়া

বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (ঝ) 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' বলিতে কি বুঝ ? (ঞ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সময় মারাঠদের পেশোয়া কে ছিলেন ? (ট) কবে, কাহাদের মধ্যে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) বাংলাদেশে নবাবীর পত্তন কিভাবে ঘটে ? (খ) হায়দ্রাবাদে কিভাবে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় ? (গ) স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের উদ্ভব কিভাবে ঘটে ? (ঙ) গুরু গোবিন্দ সিং কিভাবে শিখদের সামরিক জাতিতে পরিণত করেন ? (ঙ) মারাঠার পেশোয়াদের বংশানুক্রমিক শাসন কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? (চ) টীকা লিখ ঃ—পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। (ছ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব কি ?

৩। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে কীভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে ? (খ) শিখ গুরুদের নেতৃত্বে শিখ শক্তির উত্থানের বিবরণ দাও। (গ) গুরু গোবিন্দ সিং কীভাবে শিখ শক্তির নেতৃত্ব দেন ? (ঘ) পেশোয়া বংশের প্রথম তিনজন পেশোয়ার অধীনে মারাঠা শক্তির বিস্তারের বিবরণ দাও। (ঙ) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের বিবরণ দাও। এই যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) ভারতে ইংরেজদের তিনটি বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম লিখ। (খ) ভারতে ফরাসীদের দুইটি বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম লিখ। (গ) ইউরোপে কবে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় ? (ঘ) কর্ণাটকে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে ফরাসী পক্ষের নেতা কে ছিলেন ? (ঙ) কোন সালে ভারতে প্রথম ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান ঘটে ? (চ) তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি কে ছিলেন ? (ছ) কোন্ যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট ফরাসীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে ? (জ) ইউরোপে সপ্তবার্ষিকী যুদ্ধের অবসান ঘটে ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের কারণ কি ? (খ) ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ কিভাবে শুরু হয় ? (গ) দ্বিতীয় ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ কীভাবে দেখা দেয় ? (খ) কীভাবে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় ?

৩। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের পটভূমি আলোচনা কর। (খ) ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরেজরা কীভাবে ফরাসীদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে তাহার বিবরণ দাও। (গ) ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষে ডুপ্লের ভূমিকা কি ছিল ? (ঘ) ভারতে ফরাসীদের পতনের কারণ কি ?

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) সিরাজউদ্দৌলার পূর্বে বাঙলার নবাব কে ছিলেন ? (খ) সিরাজউদ্দৌলা কোন্ সালে প্রথম কলিকাতা আক্রমণ করেন ? (গ) 'অন্ধকূপ হত্যা' কি ? (ঘ) আলিনগরের সন্ধি কবে, কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ঙ) পলাশীর যুদ্ধ ঠিক কোন্ সালের কত তারিখে হইয়াছিল ? (চ) বেদারার যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (ছ) বক্সারের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে কোন্ সালে হইয়াছিল ? (জ) বক্সারের যুদ্ধের সময় বাঙলার নবাব কে ছিলেন ? (ঝ) কোন্ সালে ইংরেজ কোম্পানী মুঘল বাদশাহের নিকট হইতে দেওয়ানী লাভ করেন ? (ঞ) 'দস্তক' কাহাকে বলে ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে আলিবর্দীর সম্পর্ক কিরূপ ছিল ? (খ) ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের বিরোধ বাধিবার কারণ কি ? (গ) পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে একটি টীকা লিখ। (ঘ) পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের ভূমিকা কিরূপ ছিল ? (ঙ) পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজদের কি সুবিধা হয় ? (চ) ভারতের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব কি ? (ছ) মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কারণ কি ? (জ) ভারতের ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব কি ? (ঝ) পলাশীর যুদ্ধ ও বক্সারের যুদ্ধের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন ?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপের বিবরণ দাও। (খ বাংলায় ১৭৫৭ হইতে ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ শক্তির উত্থান ও নবাবদের পতনের বিবরণ দাও। (গ) সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের বিরোধের কারণ উল্লেখসহ পলাশীর যুদ্ধের বিবরণ দাও। পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব আলোচনা কর। (ঘ) মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ দেখা দেয় কেন ? এই প্রসঙ্গে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল ও গুরুত্ব নির্ণয় কর।

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) রঘুনাথ রাও কিভাবে পেশোয়া হন ? (খ) সুরাটের সন্ধি (১৭৭৫ খ্রীঃ) কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (গ) কোন্ সন্ধি দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয় ? (ঘ) পুরন্দরের সন্ধি কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ঙ) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় বাংলার গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন ? (চ) বেসিনের সন্ধি (১৮০২ খ্রীঃ) কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ছ) কোন্ সালে কোন্ গভর্নর জেনারেলের শাসন-কালে মারাঠাদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে ? (জ) হায়দর আলির ইংরেজ-বিরোধী শক্তিজোটে কোন্ কোন্ শক্তি ছিল ? (ঝ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি কোন্ সালে কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ঞ) শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ট) কোন্ গভর্নর

জেনারেল মহীশূর শক্তিকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন ? (ঠ) অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি কে প্রবর্তন করেন ? (ড) ইয়ন্দাবুর সন্ধি কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (ঢ) বান্দা বাহাদুর কে ছিলেন ? (ণ) 'মিসল' শব্দের অর্থ কি ? (ত) অমৃতসরের সন্ধি কত খ্রীস্টাব্দে কাহাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ? (থ) 'পাঞ্জাব কেশরী' কাহাকে বলা হয় ? (দ) কোন্ যুদ্ধে শিখ শক্তির চূড়ান্তভাবে পরাজয় ঘটে ? (ধ) 'স্বত্ববিলোপ নীতি'র প্রবর্তক কে ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

(ক) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ কি ? (খ) কিভাবে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটে ? (গ) তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ কিভাবে দেখা দেয় ? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল ? (ঘ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪ খ্রীঃ) কি কারণে স্বাক্ষরিত হয় ? (ঙ) অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কি ? (চ) অমৃতসরের সন্ধির শর্ত কি ছিল ? (ছ) 'মিসল' কাহাকে বলে ? (জ) অমৃতসরের সন্ধির শর্ত কি ছিল ? (ঝ) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ডালহৌসী কি কি নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (ঙ) 'স্বত্ববিলোপ নীতি' বলিতে কি বুঝ ? (ট) 'স্বত্ববিলোপ নীতি' প্রয়োগের ফল কি হইয়াছিল ?

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইংগ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা শক্তির কিভাবে পতন ঘটে তাঁহার ধারাবাহিক বিবরণ দাও। (খ) হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের শাসনে মহীশূর শক্তির উত্থান ও পতনের বিবরণ দাও। (গ) ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতায় হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের কৃতিত্ব বিচার কর। (চ) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে লর্ড ওয়েলেসলির ভূমিকা আলোচনা কর। (ঙ) শিখ শক্তির অভ্যুত্থানে রণজিৎ সিং-এর কৃতিত্ব বিচার কর। (চ) রণজিৎ সিং-এর সহিত ইংরেজদের সম্পর্কের বিবরণ দাও। (ছ) লর্ড ডালহৌসী কিভাবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার করেন ?

।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

১। বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) কবে কাহার নিকট হইতে ইংরেজরা দেওয়ানী লাভ করে ? (খ) বাঙলাদেশে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন ? (গ) রেগুলেটিং অ্যাক্ট আইন কে কবে প্রবর্তন করেন ? (ঘ) পিটের ভারত আইন কবে কোথায় গৃহীত হয় ? (ঙ) 'কর্নওয়ালিস কোড' কাহাকে বলে ? (চ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কবে কাহার শাসনকালে প্রবর্তন করা হয় ? (ছ) রায়তওয়ারী ব্যবস্থা কাহাকে বলে ? (জ) মহালওয়ারী ব্যবস্থা কাহাকে বলে ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) দেওয়ানী কাহাকে বলে ? (খ) দ্বৈত শাসনব্যবস্থা কাহাকে বলে ? (গ)

রেগুলেটিং আইন দ্বারা ভারতে শাসনব্যবস্থায় কি পরিবর্তন আনা হয়? (ঘ) ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলায় কি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন করেন? (ঙ) 'কর্নওয়ালিস কোড' সম্বন্ধে কি জান? (চ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, (২) রায়তওয়ারী ব্যবস্থা, (৩) মহলওয়ারী ব্যবস্থা।

৩। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) কোম্পানীর শাসনের প্রথমদিকে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় উদ্ভব কিভাবে ঘটে? (খ) হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের শাসনকালে ভারতে শাসনতান্ত্রিক কি পরিবর্তন ঘটে? (গ) ভারতে কোম্পানীর শাসনকালে বিচারব্যবস্থার গঠন সম্বন্ধে একটি বিবরণ দাও। (ঘ) কোম্পানীর শাসনকালে ভারতে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন ঘটে? (ঙ) চিরস্থায়ী ব্যবস্থা কীভাবে গৃহীত হয়? এই ব্যবস্থায় সুফল ও কুফলগুলি কি?

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাথমিক যুগে বাণিজ্যনীতি কি ছিল? (খ) বাংলার বস্ত্রশিল্প কিভাবে ধ্বংস করা হয়? (গ) ভারতে অবাধ বাণিজ্যনীতির ফল কি হয়?

২। **রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ**

(ক) কোম্পানীর শাসনকালে ভারতে শিল্প ও বাণিজ্য কিভাবে ধ্বংস করা হয়? (খ) ভারত কিভাবে রপ্তানিকারী দেশ হইতে আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়? (গ) কোম্পানী শাসনকালে ভারতে দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে কিভাবে বিপর্যয় দেখা দেয় তাহা আলোচনা কর।

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ**

(ক) কোন্ সালের সনদে ভারতে শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়? (খ) খ্রীস্টান মিশনারীগণ কোন্ সালে ভারতে প্রবেশের অনুমতি লাভ করে? (গ) হিন্দু কলেজ কাহার উদ্যোগে কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? (ঘ) স্কুল বুক সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? (ঙ) শ্রীরামপুর কলেজ কে কবে প্রতিষ্ঠিত করেন? (চ) 'শ্রীরামপুর-ত্রয়ী' কাহাদের বলা হয়? (চ) কে কবে সরকারীভাবে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেন? (জ) কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? (ঝ) কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় কবে স্থাপিত হয়? (ঞ) সতীদাহ প্রথা কে কবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন? (ট) হিন্দু বিধবা বিবাহের জন্য কে আন্দোলন করেন? (ঠ) ইয়ং বেঙ্গল কাহাদের বলা হয়? (ড) ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঢ) ব্রাহ্মধর্ম কে প্রবর্তন করেন? (ণ) মহারাষ্ট্রে প্রার্থনা সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের পূর্বে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ কি ছিল?

(খ) বাঙলায় ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে মিশনারীদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর। (গ) ভারতে সরকারীভাবে ইংরেজি শিক্ষা কিভাবে গৃহীত হয় ? (ঘ) 'নবজাগরণ' কাহাকে বলে ? (ঙ) ভারতে সতীদাহ প্রথা কিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ? (চ) বিধবা বিবাহ আইন কিভাবে গৃহীত হয় ? (ছ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—(১) রাজা রামমোহন রায়, (২) ডিরোজিও, (৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, (৪) মাধব গোবিন্দ রানাডে। (জ) ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন সম্পর্কে কি জান ?

৩। **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

(ক) সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন কিভাবে ঘটে তাহার বিবরণ দাও। (খ) পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত পরিচিতির ফলে নূতন চিন্তার বিকাশ কীভাবে ঘটে ? (গ) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বিবরণ দাও। (ঘ) পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত পরিচিতির ফলে বাঙলায় যে নূতন চিন্তাধারার বিকাশ হয় তাহার বিবরণ দাও। (ঙ) প্রার্থনা সমাজ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

॥ নবম অধ্যায় ॥

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

(ক) ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক কে ? (খ) ভারতে ওয়াহাবী ধর্মমত কে প্রচার করেন ? (গ) বাঙলায় ওয়াহাবী আন্দোলনের নেতা কে ? (ঘ) 'বাঁশের কেল্লা' যুদ্ধ বলিতে কি বোঝ ? (ঙ) 'ফরাজী' কথাটির অর্থ কি ? (চ) বাঙলায় ফরাজী আন্দোলনের প্রবর্তক কে ? (ছ) দুধু মিঞা কোন্ আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন ? (জ) সিধু ও কানহু কোন্ আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন ?

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

(ক) ওয়াহাবী ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান ? (খ) ওয়াহাবী আন্দোলনে তিতুমীর-এর অবদান উল্লেখ কর। (গ) ফরাজী আন্দোলন কিভাবে গড়িয়া ওঠে ? (ঘ) ফরাজী আন্দোলনে দুধু মিঞার অবদান কি ? (ঙ) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—(১) কোল বিদ্রোহ, (২) সাঁওতাল বিদ্রোহ।

৩। **রচনাধর্মী প্রশ্ন :**

(ক) ওয়াহাবী আন্দোলনের উদ্ভব সম্বন্ধে কি জান ? ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক বিবরণ দাও। (খ) ফরাজী আন্দোলন কখন সংঘটিত হয় ? এই আন্দোলনের বিবরণ দাও। (গ) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে উপজাতি বিদ্রোহের একটি বিবরণ দাও।

॥ দশম অধ্যায় ॥

১। **বিষয়মুখী প্রশ্ন :**

(ক) মঙ্গল পাণ্ডে কোন্ বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ? (খ) সিপাহী বিদ্রোহের মারাঠা

নায়ক কে ? (গ) নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করা হয় কেন ? ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রথম কোথায় বিদ্রোহ দেখা দেয় ? (ঙ) কোন্ প্রত্যক্ষ কারণের ফলে সিপাহী বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় ? (চ) বিদ্রোহী সিপাহীরা কাহাকে 'সম্রাট' বলিয়া ঘোষণা করে ? (ছ) বিহারে বিদ্রোহীদের নেতা কে ছিলেন ? (জ) তাঁতিয়া তোপী কে ছিলেন ?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তরাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) সিপাহী বিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণ কি ? (খ) সিপাহী বিদ্রোহে ডালহৌসীর নীতি কতটুকু দায়ী ? (গ) সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কি ? (ঘ) সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ—(১) বাহাদুর শাহ, (২) ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, (৩) কুনওয়ার সিং ।

৩। রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(ক) ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর। (খ) সিপাহী বিদ্রোহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলি আলোচনা কর। (গ) সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা ও প্রসার কিভাবে ঘটে ? (ঘ) সিপাহী বিদ্রোহে কাহারা নেতৃত্ব দেন ? তাঁহাদের নেতৃত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। (চ) সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি আলোচনা কর। (ছ) ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ কি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলিয়া মনে কর ? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও ।